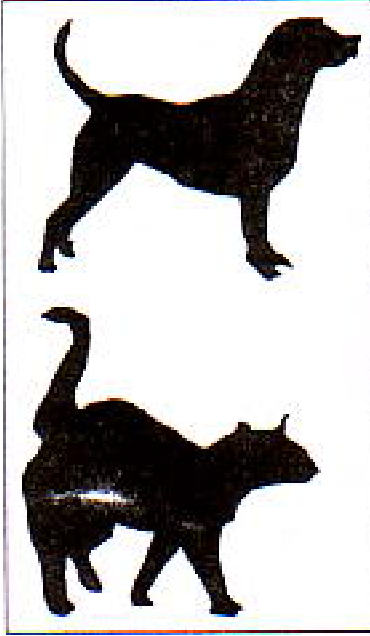
পর্ব ১ ঃ ভগবদ্‌গীতার বিষয়-প্রবেশ

মানব জীবন ও পশু জীবন

মানুষ পশুদের চেয়ে কিসে উন্নত, আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন?





চারটি কার্যকলাপ রয়েছে, যা মানুষ ও পশু উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান ঃ **আহার, নিদ্রা, ভয়** (আত্মরক্ষা) এবং **মৈথুন** (বংশবৃদ্ধি)। এই জগতে প্রত্যেকেই উপরের চারটি কর্ম আরও ভালোভাবে সম্পাদন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে এবং এইভাবে চেষ্টা করছে সুখী হবার। একজন মানুষ ও একটি পশুর মধ্যে তাহলে পার্থক্য কি? কেউ বলতে পারেন, **'বিচার-বোধ'** বা **'যুক্তিপূর্ণ চিন্তা-ক্ষমতা'**। বিচার-বুদ্ধি কুকুর-বিড়ালের মধ্যেও রয়েছে। মনে করুন একটি কুকুর আপনার দিকে আসছে। আপনি তাকে বললেন, "হট্।" সে তখনি বুঝতে পারবে যে আপনি তাকে চাইছেন না। সুতরাং তার কিছু বিবেচনা-শক্তি রয়েছে। তেমনি, একটি বেড়াল যদি আপনার রান্নাঘর থেকে দুধ চুরি করতে চায়, তাহলে সে খুবই সুন্দর যুক্তি-বুদ্ধির পরিচয় দেবে ঃ সে লক্ষ্য করতে থাকবে কখন মালিক বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, যাতে সে বেশ নিরাপদে চুরি করে খেতে পারে দুধ। সুতরাং পশু জীবনের চারটি প্রবণতা — আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন — নির্দেশ করে যে এমনকি পশুদের মধ্যেও যুক্তিশীলতা রয়েছে। তাহলে পশুদের থেকে মানুষের পার্থক্যসূচক বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি কি? সেটি হচ্ছে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করার বিশেষ যুক্তি-বোধ ঃ "কেন আমি দুঃখ ভোগ করছি?" পশুরাও দুর্দশা ভোগ করছে, কিন্তু তারা জানে না কিভাবে ঐ দুর্দশা লাঘব করা যায়, তার প্রতিকার কি।

সাধারণতঃ মানুষও ঠিক পশুদের মতো। কিভাবে খেতে হয়, কিভাবে সুখময় আশ্রয়ে নিদ্রা যেতে হয়, কিভাবে বংশবৃদ্ধি করতে হয় এবং কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় — কেবল এই দৈহিক চাহিদাগুলির বাইরে তারা আর কিছুই জানে না। একটি পশু রাস্তায় বা যত্রতত্র খেতে পারে, আমরা একটি পাঁচতারা হোটেলে যেতে পারি। একটি পশু রাস্তার কোণে শুয়ে থাকতে পারে, আমরা তুষার-ফেননিভ ডানলোপিলো বিছানায় শুতে পারি। পশুরা লজ্জা-শরমের তোয়াক্কা না করে রাস্তার মাঝখানে মৈথুন করতে পারে, আমরা একটি গগনচুম্বী অট্টালিকায় মৈথুন সুখ উপভোগ করতে পারি। একটি পশু তার দাঁত-নখ ব্যবহার করে আত্মরক্ষা করতে পারে, আমরা গোলাবারুদ, ক্ষেপণাস্ত্র কিংবা বোমার সাহায্যে প্রতিরক্ষা করতে পারি। যদি মানুষ তার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় প্রগতিকে কেবল ঐ চারটি কার্যকলাপকে অত্যন্ত জমকালোভাবে সম্পাদন করার পিছনে প্রয়োগ করে, তাহলে সেটা পাশবিক সভ্যতার থেকে আদৌ উন্নত কিছু নয়। **মহাভারতে** বলা হয়েছে ঃ

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতদ্ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মোঃ হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেন হীনা পশুভি-সমানা।।

"আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন মানুষ ও পশুর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মানুষ যখন পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে উদ্যোগী হয়, তখনই পশুদের সংগে তাদের পার্থক্য সূচিত হয়, অন্যথায় তারা পশুদেরই সমতুল।"

ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে যে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেবল কশ্চিৎ দু-একজন মানুষ এই প্রশ্ন করে, *"কেন আমাকে এত দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে?"* আমরা কেউই দুঃখক্লেশ ভোগ করতে চাই না, তবুও নানারকম দুঃখ-কষ্ট আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আমরা খুব বেশি শীত চাই না, তবু আমাদের শীত সহ্য করতে হয়; আমরা অতিরিক্ত গরম চাই না, তবুও আমরা অসহনীয় গরম সহ্য করতে বাধ্য হই। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা ব্যাধি, মৃত্যু — এগুলি আমরা কেউই চাই না।

জীবনের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে **জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি**। অথচ এইসব দুর্দশাভোগ থেকে এ-জগতের কারোরই নিষ্কৃতি নেই। এই ভয়ংকর ও অনিবার্য দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ জড়-অস্তিত্বে তাই প্রত্যেকেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। **এইসব দুঃখ-দুর্দশার কারণ ও জীবনের প্রকৃত গন্তব্য স্থান হচ্ছে অনুসন্ধানের প্রকৃত বিষয়।** ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে **ভগবদ্‌গীতা** উপদেশ দিয়েছিলেন এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য এবং অর্জুনকে তাঁর নিজের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত করে তাঁকে সকল দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্য। জ্ঞান আলোক স্বরূপ, অজ্ঞানতা হচ্ছে অন্ধকার। কিন্তু কিভাবে আমরা অর্জন করতে পারি প্রকৃত জ্ঞান?

আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, মানুষ হওয়ার জন্য, কেবল আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়; মানব জীবনের উদ্দেশ্য কেবল দৈহিক কার্যকলাপ থেকে উচ্চতর, উন্নততর — তা হচ্ছে পরম সত্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা। আর জ্ঞান লাভ করতে হলে তাকে নিম্নোক্ত তিনটি পন্থার যে কোন একটি অবলম্বন করতে হয় ঃ

জ্ঞানলাভের তিনটি পন্থা

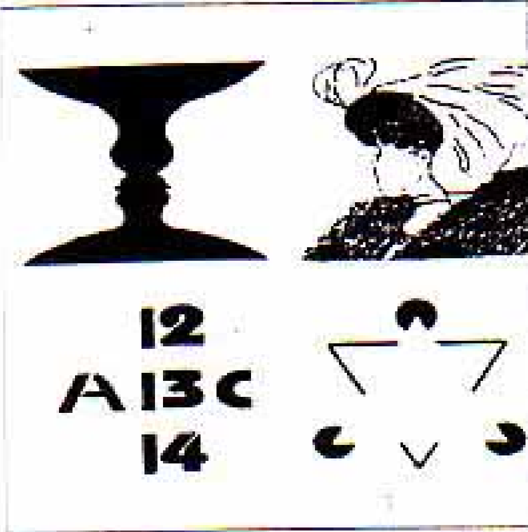
১) **প্রত্যক্ষ** (ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞান — **Empirical Sensual Perception**)
২) **অনুমান** (প্রত্যক্ষ নিদর্শনের ভিত্তিতে তৈরী সিদ্ধান্ত মদবাদ — **Theories Based on Evidence**)
৩) **শব্দ** (কোনো প্রামাণিক কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে শ্রবণ — **Hearing From a Bonafide Authority**)

প্রত্যক্ষ প্রমাণ (ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা-লব্ধ প্রত্যক্ষণ) ঃ

সরাসরি প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ হয়। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রমাণ এই পদ্ধতির ভিত্তিতে করা হয়। "যা দেখি তাই বিশ্বাস করি" (*Seeing is believing*)-এই ধারণাটি ভগবানের অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণকারী মানুষদের মধ্যে বেশ বিখ্যাত। কিন্তু এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে আরো অনেক যুক্তি উত্থাপন করা যায় ঃ নীচে পৃথিবী থেকে সূর্য একটা থালার মতো দেখায়, কিন্তু সূর্যের আকৃতি কি সত্যিই কেটা থালার মতো? মরুভূমিতে আমরা যে জল দেখতে পাই (মরীচিকা), সেই জল কি পান করা যায়? কোন একটি সোজা লাঠিকে জলে ডোবালে সেটিকে ভগ্ন মনে হয় (প্রতিসরণ)। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এমনকি সবচেয়ে সুন্দর মুখকেও অবতল আয়নায় বিকৃত দেখায়। বিশ্বাস করা যায় কি? সুতরাং সরাসরি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভের এই পদ্ধতি খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা ইন্দ্রিয়-যন্ত্রগুলির নিজেদেরই ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেজন্য সীমাবদ্ধ জড় ইন্দ্রিয়গুলি ও মনের সাহায্যে আমরা অসীম বা পরম তত্ত্ব জ্ঞানলাভ করতে পারি না, এভাবে আমরা যে-জ্ঞানই লাভ করব তা হবে কেবল আপেক্ষিক (RELATIVE)। বিজ্ঞানের তথ্য, সংখ্যা, মতবাদগুলো প্রতিদিনই পরিবর্তিত, পরিমার্জিত এবং পরিশোধিত হচ্ছে, এবং এটিই একটি প্রমাণ যে এইসব বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা উচ্চতর থেকে উচ্চতর আপেক্ষিক

সত্যে উপনীত হচ্ছি। কিন্তু পরম সত্য স্থির। এটি কখনো পরিবর্তিত হয় না। আমরা স্থূল জড় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরম সত্য অবগত হতে পারি না কেন, তার কারণ নিম্নোক্ত চারটি ত্রুটি ঃ

(১) ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়জাত সীমাবদ্ধতা (করণাপাটব), (২) মোহগ্রস্ত হবার প্রবণতা (প্রমাদ), (৩) ভুল করার প্রবণতা (ভ্রম), (৪) প্রতারণা করার প্রবণতা (বিপ্রলিপ্সা)



চিত্র-১ : দেখুন একটি পেয়ালা বা দুটি মুখ।
চিত্র-২ : খুঁজে নিন বৃদ্ধা বা তরুণীকে।
চিত্র-৩ : মাঝেরটি কি? 13 না B?
চিত্র-৪ : চোখ একটি সাদা ত্রিভূজ দেখছে, যদিও তা নেই।

(১) <u>করণাপাটব</u> (অপূর্ণ ইন্দ্রিয়, করণ-জাত ত্রুটি) ঃ আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির শারীরবিদ্যাগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, চোখ যখন কোনো বস্তুকে দেখে, তখন তার কিছু অংশকে নির্বাচন/বাতিল করে (চিত্র-১ ও ২); চোখ প্রসঙ্গানুসারে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে (চিত্র-৩), দেখার সময় চোখ অতিরিক্ত কিছু তথ্য দেয়, যা দৃশ্যমান বস্তুতে আপাত-প্রতীয়মান নয় (চিত্র-৪), ইত্যাদি। কান ২০ হার্জ থেকে ২০০০ হার্জ-এর চেয়ে কম/বেশি শব্দ্যাংকের শব্দ শ্রবণ করতে পারে না।

সুতরাং, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ত্রুটিপূর্ণ। কেউ হয়ত যুক্তি উত্থাপন করতে পারেন যে ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতাগুলি অতিক্রম করার জন্য আমাদের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। নোবেল-বিজয়ী পদার্থবিদ্ **ইউজিন উইংগার** বলেন, "*যদি আমরা ক্যামেরায় তারকারাজির চিত্রগ্রহণ করি, তাহলে কি দেখানো হচ্ছে তা বিচার করার জন্য অবশেষে ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারাই সেটিকে আমাদের 'গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্য ব্যতীত আমরা চিত্র গ্রহণকারী ক্যামেরাটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। সুতরাং স্পষ্টতঃই সমস্ত প্রত্যক্ষজ জ্ঞান পরিশেষে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমেই লাভ করে থাকি।*" অতএব, যন্ত্রের দ্বারা যথেষ্টরূপে পরিবর্ধিত বা পরিমার্জিত হলেও ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষলব্ধ যে কোন জ্ঞান আমাদের অপূর্ণ ইন্দ্রিয়গুলির থেকে মোটেই পূর্ণ নয়।

(২) <u>প্রমাদ</u> ঃ আমাদের সব কটি ইন্দ্রিয়েরই নানা প্রতারণামূলক সংবেদন দানের প্রমাণ রয়েছে। একই তাপমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও সাধারণ জলের থেকে কার্বোনেটেড জলকে বেশি ঠাণ্ডা মনে হয়। যদি আমরা চিনি খাওয়ার পর কমলালেবু খাই, তাহলে কমলা টক লাগবে। কিন্তু যদি আমরা পাতিলেবু খাওয়ার পর কমলা লেবু আস্বাদন করি, তাহলে তার স্বাদ মিষ্টি মনে হবে। শুধু জিভই যে এমন মোহাভিভূত হয়, তা নয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমরা আমাদের চোখের মাধ্যমে প্রতিভাত ভৌতিক বাস্তবতা (*Physical reality*)-কে ব্যাখ্যা করি আমরা যা দেখতে চাই, আর যা দেখতে চাই না — সেই অনুসারে (যেমন একজন কৃষকের দৃষ্টিতে পৃথিবী ও একজন শিল্পী কিংবা একজন নৃতত্ত্ববিদের ধারণায় পৃথিবী একরকম নয়)। কিভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি প্রতারিত বা মোহগ্রস্ত হয়, তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

(৩) <u>ভ্রম</u> ঃ বিজ্ঞাপনের নাটকীয় সব সাফল্য সত্ত্বেও তার শুরুর সময় থেকেই বিজ্ঞান ভীষণ রকম ভুল সব সিদ্ধান্ত বা বিবরণ উপস্থাপন করেছে। যেমন প্রথমে তারাদের মনে করা হত স্ফটিকের তৈরী বিশাল গ্লোবে পিনের খোঁচার মতো ছিদ্র-পথ-বিশেষ। আর আকাশের বিদ্যুৎ এবং তাপকে মনে করা হতো তরল পদার্থ, মস্তিষ্ককে ভাবা হতো রক্ত শীতল করার এক অঙ্গ-বিশেষ। এখন আমরা যা সত্য বলে জানি তার প্রেক্ষিতে এগুলি হাস্যকর বিচ্যুতি মাত্র।

(৪) **বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা করার প্রবণতা) ঃ** মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে (*To err is human*), প্রবাদে রয়েছে। অনিচ্ছাকৃত নিষ্পাপ ভুল তাই ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মানুষ কখনো কখনো সুচিন্তিতভাবে অসত্য প্রচারে উদ্যোগী হয় — এই প্রবণতা মানুষের রয়েছে। এমনকি বিজ্ঞানীরাও এই ত্রুটি থেকে মুক্ত নন। যেমন বহুবছর ধরেই বিবর্তনবাদ-এর উপর রচিত পাঠ্যবইতে "পিল্টডাউন ম্যান" নামের আদিম মানুষের করোটির দৃষ্টান্ত দেওয়া হত, যাতে প্রমাণ করা যায় যে আধুনিক মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে এপ-এর আকৃতিবিশিষ্ট পূর্বপুরুষ থেকে। ১৯১২ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পিল্টডাউনের একটি বালি-পাথরের গর্ত থেকে মানুষের মতো দেখতে মাথার খুলি এবং এপের মতো দেখতে একটি চোয়াল পেয়েছিলেন। ঐ হাড়ের অঙ্গগুলোকে একই জীবের বলে মনে করা হল এবং ঐ অঙ্গদুটি সন্নিবিষ্ট করে একটি পূর্ণ করোটিরূপে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা হল — আদিম মানুষ হতে আধুনিক মানুষে রূপান্তরের একটি স্তরের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত হিসাবে। ১৯৫০ সালে অবশ্য তদন্তকারীরা আবিষ্কার করলেন যে ঐ 'পিল্টডাউন ম্যান'-এর চোয়ালের হাড়টি আসলে একেবারেই সাম্প্রতিক কালের — ওটার উপর কেবল অনেক কারিকুরি করে তাকে জীবাশ্ম বা ফসিলের মতো তৈরী করা হয়েছে। অন্য কথায়, পিল্টডাউন ম্যান আসলে একটা ডাহা প্রতারণা, যা ছিল স্পষ্টতঃই মূল আবিষ্কারকদের একজনের অনন্য কীর্তি।

অনুমান প্রমাণ ঃ

প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়-অনুভব-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাকেই 'অনুমান প্রমাণ' বলা হয়। এই ধরণের অনুমান ("এটা এমন হতে পারে," অথবা "সম্ভবতঃ এটি এই রকম") প্রশ্নাতীত সত্য নয়, কেননা অনুমান-এর জন্য যে তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তা আসে ভ্রান্তি-পূর্ণ ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে।

■ *আমরা একটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করব ঃ*

আপনি সমস্ত দিক থেকে বন্ধ একটি ঘর থেকে কিছু জোরালো আওয়াজ শুনতে পেলেন। সেটি যেকোন কিছু থেকে সৃষ্টি হতে পারে। কিসের থেকে? আপনি তখুনি ধরা যাক তিনটি অনুমান করলেন ঃ মারপিট হচ্ছে এমন হতে পারে, হয়ত টি.ভি. চলছে, হয়ত রেডিও চলছে। যখন আপনি দরজা খুললেন, আপনি জানতে পারলেন যে একদল লোক নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছে!

এইভাবে যা অনুমান করা হয়, প্রকৃত বাস্তবতা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে। অতএব এই জ্ঞান, অনুমান প্রমাণ, পরম সত্যের উৎস হিসাবে নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। এমনকি যদি যথার্থ প্রামাণিক তথ্যের মাধ্যমেও গৃহীত হয়, তবুও অনুমান স্বতন্ত্রভাবে ত্রুটিহীন পূর্ণ জ্ঞান-এ আমাদের পৌঁছে দিতে পারে না, কেননা জড়া প্রকৃতির অতীত কোনো বস্তুকে পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা জানা যায় না। যান্ত্রিক বিজ্ঞান সব কিছুকেই অণু-পরমাণুর স্তরে নামিয়ে এনে বিশ্লেষণ করে থাকে এবং এই মানদণ্ডের অতীত যা তাকে নির্বিচারে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া যে অত্যন্ত সীমায়িত ও ত্রুটিপূর্ণ, তা সহজেই বোঝা যায়। যেমন, মাইক্রোবায়োলজি বা অণু-জীব-বিদ্যা বলে বিজ্ঞানে কোন শাখার অস্তিত্বই ছিল না; ষোড়শ শতাব্দীতে যখন অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহক এমন লেন্স আবিষ্কার করলেন যাতে জীবাণুদের পর্যবেক্ষণ করা যায়, তারপর এর সূচনা হল। তেমনি, বর্তমানের বিজ্ঞান অ্যান্টি-ম্যাটার বা অ-জড়, জড়াতীত বস্তু সম্বন্ধে কোনো তথ্য সংগ্রহের কোনো যন্ত্র দিতে পারে না।

শব্দ প্রমাণ (কোনো প্রামাণিক ব্যক্তির নিকট থেকে শ্রবণ) ঃ

বেদে বলা হয়েছে যে জড়া প্রকৃতির অতীত বস্তুসমূহকে ইন্দ্রিয়-নির্ভর পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা কখনই জানা যায় না। জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর এই বস্তুসমূহকে সেইজন্য বলা হয় **"অচিন্ত্য"**। আর, যা অচিন্ত্য, তাকে যুক্তি, বাদানুবাদ, জল্পনা-



বা অনুমানের দ্বারা জানা যেতে পারে না — একমাত্র **শব্দ**, অর্থাৎ বৈদিক শাস্ত্র থেকে শ্রবণের মাধ্যমেই তা জ্ঞাত হওয়া যায়। **শব্দের** মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে পূর্বোক্ত চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত। বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান প্রথমে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে এই জ্ঞান দান করেন। ব্রহ্মা এই জ্ঞান নারদকে দান করেন, নারদ ব্যাসদেবকে এবং এইভাবে এই জ্ঞান গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বহমান থাকে। এমনকি আজও সেই ধারা বহমান। **শব্দ**-মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিহীন, কেননা তার উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, যিনি চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং সেইজন্য তিনিই কেবল চারটি ত্রুটির দ্বারা আচ্ছন্ন বদ্ধজীবকে পরম সত্য (*Absolute Truth*) দান করতে সক্ষম। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায়, স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের কেবল প্রত্যক্ষ অনুমান-লব্ধ 'জ্ঞান' বা ধারণা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যা পরিবর্তনশীল আপেক্ষিক সত্য (*Relative Truth*) ছাড়া আর কিছুই নয়। এইভাবে লব্ধ জড় জ্ঞানের উদ্দেশ্য কেবল জড় দেহটির তত্ত্বাবধান — আর কিছুই নয়। এই ধরণের জড় জ্ঞান জীবনের চরম প্রশ্নগুলির কোন উত্তর দান করতে পারে না ঃ ***কেন আমি দুঃখ ভোগ করছি? আমার জীবনের পরম গন্তব্য কি? কিভাবে প্রকৃতই সুখী হওয়া সম্ভব?*** এটি স্পষ্ট যে কেবল **শব্দ প্রমাণ**, বৈদিক জ্ঞান অপরিবর্তনীয় পরম সত্য (*Absolute Truth*) পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে আমাদের ত্রুটিমুক্ত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করতে পারে, এবং জীবনের চরম সমস্যাগুলির চিরস্থায়ী সমাধান প্রদান করতে পারে।

অভ্রান্ত বৈদিক জ্ঞান

■ বৈদিক শাস্ত্র কি

বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে এক বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডার, যেখানে প্রায় ১০০ কোটি সংস্কৃত শ্লোক রয়েছে। ভবিষ্যপুরাণ অনুসারে, "ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, মহাভারত (যার মধ্যে ভগবদ্গীতা অন্তর্ভুক্ত), পঞ্চরাত্র মূল রামায়ণ এবং পুরাণ সমূহ — এগুলি সবই বৈদিক শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।" ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭/১/৪) পুরাণ সমূহ ও ইতিহাস সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলিকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। মুখ্য পুরাণের সংখ্যা আঠারোটি। সমস্ত পুরাণের মধ্যে ভাগবত পুরাণ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)-কে বেদান্ত সূত্রের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ভাষ্য বলে গণ্য করা হয়, কেননা উভয়ের রচয়িতা হচ্ছেন মহামুনি ব্যাসদেব।

■ কিভাবে বেদের উদ্ভব হয়েছিল?

বৈদিক জ্ঞান কোন জড়জাগতিক বদ্ধ মানুষের অনুমান-প্রসূত নয়, তা আসছে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান থেকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান ব্রহ্মাকে বেদ জ্ঞান দান করেন। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের উৎস শ্রীভগবান স্বয়ং। যেহেতু বেদসমূহ কোনো মানুষের রচিত নয়, সেজন্য বেদকে বলা হয় 'অপৌরুষেয়।' বেদ হচ্ছে পরম ও স্বতঃপ্রমাণ, বেদে কোন ভ্রান্তি থাকতে পারে না। বেদের প্রমাণ বেদই; ব্যাখ্যার জন্য অন্য কিছুর উপর তা অপেক্ষা করে না। ভগবদ্গীতায় একই কথা ঘোষিত হয়েছে (৩/১৫) ঃ "**বেদ অক্ষর বা পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রকাশিত হয়েছে।**" অথর্ববেদে বলা হয়েছে, *"যিনি ব্রহ্মাকে বেদজ্ঞান উপদেশ করেছিলেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করেন।"*

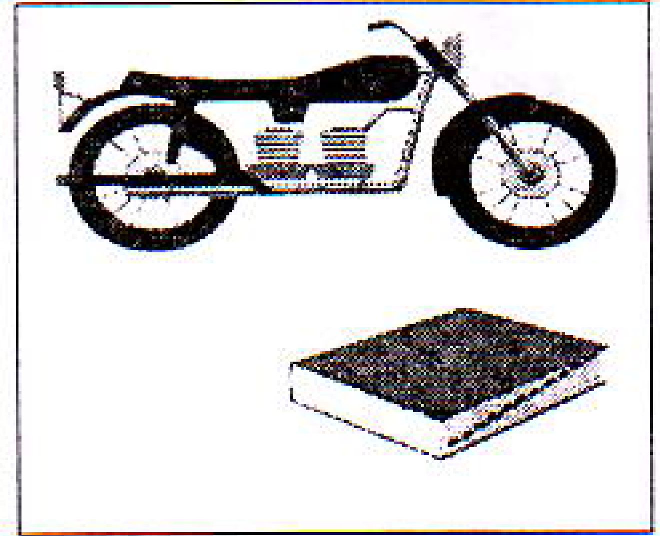
ব্রহ্মা বৈদিক জ্ঞান লাভ করার পর তাঁর মানস পুত্র দেবর্ষি নারদ, নারদ হতে ব্যাসদেব — এভাবে পরম্পরা ধারায় বেদ-জ্ঞান প্রবাহিত হয়ে আসছে। গুরু-পরম্পরা ধারায় প্রবাহিত এই জ্ঞান প্রামাণিক ও বিশুদ্ধ।

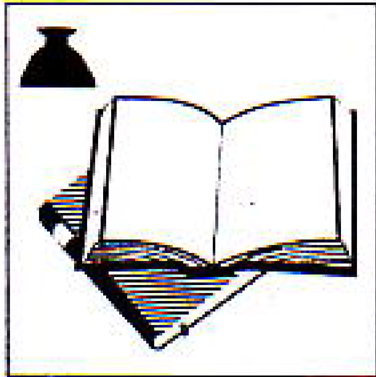
কলিযুগের পূর্ববর্তী যুগসমূহে মানুষের এতই মেধাসম্পন্ন ছিলেন যে গুরুদেবের নিকট থেকে শ্রবণের পর তাঁরা সব কিছু বুঝতে ও মনে রাখতে পারতেন। সেজন্য তাঁদের বলা হত শ্রুতিধর, আর বেদের অপর নাম ছিল **শ্রুতি**। শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিতা মহামুনি শ্রীব্যাসদেবের নিকট থেকে **শ্রীমদ্ভাগবত** (১৮ হাজার শ্লোক) একবার মাত্র শ্রবণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি অনায়াসে সেগুলি অবিকৃতভাবে স্মরণ করে মহারাজ পরীক্ষিত সহ উপস্থিত মুনি-ঋষিবর্গকে শ্রবণ করান।

কিন্তু আজকের লৌহযুগ হচ্ছে কলিযুগ, ৫০০০ বছর পূর্বে যার সূচনা হয়েছে। কলিযুগে মানুষ পারমার্থিক জীবনের প্রতি অনীহাযুক্ত, অলস এবং তাদের স্মৃতি শক্তি অত্যন্ত দুর্বল। সেজন্য মহামুনি ব্যাসদেব কলিযুগের মানুষের কথা মনে রেখে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সকল বেদ ও পুরাণ সংকলন করে লিপিবদ্ধ করেন।

বেদ ঃ অভ্রান্ততার প্রমাণ কোথায়?

আমরা কেন **শব্দ-প্রমাণ** (বেদসমূহ)-কে সত্য বলে স্বীকার করব? **বেদসমূহ হচ্ছে সরাসরি ভগবানের বাণী, যা সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়েছিল।** যখন আপনি একটি মোটর সাইকেল কেনেন, তখন তার সংগে একটি ইন্‌স্ট্রাক্‌শন ম্যানুয়াল বা ব্যবহার-বিধি নির্দেশিকা থাকে, যাতে ব্যাখ্যা করা থাকে কিভাবে ঐ মোটরসাইকেলটি ব্যবহার করা যেতে পারে। ঠিক তেমনি, সৃষ্টির সময়ে ভগবান আমাদেরকে বৈদিক শাস্ত্র প্রদান করেন, যাতে ব্যাখ্যা করা থাকে এই জগত কেন, কোথা থেকে উদ্ভূত, কিভাবে এই জগতে আচরণ করা উচিত।





বৈদিক শাস্ত্র ঃ মানুষের ব্যবহারের জন্য ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশিকা।

কয়েকটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে বৈদিক জ্ঞান অভ্রান্ত। স্মরণাতীত কাল পূর্বে রচিত হলেও এমন সব তথ্য বেদে বর্ণিত হয়েছে, বিজ্ঞান যার অতি সম্প্রতি আবিষ্কার করতে শুরু করেছে।

■ ডালটন পরমাণু আবিস্কার করেছেন দু'শো বছরও হয় নি। আজ থেকে ৫০০০ বছর পূর্বে রচিত **শ্রীমদ্ভাগবতের** মূল শ্লোকে পরমাণু অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম কণা — এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। **ব্রহ্মসংহিতাতেও** (৫/) বলা হয়েছে যে শৃঙ্খলাযুক্ত জড় পদার্থের বিন্যাসে বৃহত্তম ইউনিট বা একক হচ্ছে **ব্রহ্মাণ্ড**, ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে **পরমাণু** (*অণ্ডান্তরস্থং পরমাণু-চয়া-অন্তরস্থং*)। এইরকম সর্ববৃহৎ ইউনিট বা ব্রহ্মাণ্ড একটি নয়, কোটি কোটি (*একোহপাস্য রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং — ব্রহ্ম সংহিতা ৫/*)।

■ পাঁচশো বছর আগে ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলেই এই বিশ্বাস প্রচলিত যে পৃথিবী সমতল — গোল নয়। বেদে (যা সময়ের আদি থেকে বিদ্যমান এবং পাঁচ হাজার বছর আগে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে পৃথিবী গোল — 'ভূ-গোল'।

■ ক্রিস্টোফার কলম্বাস পাঁচশো বছর আগে জানতেন না যে পৃথিবীতে সাতটি মহাদেশ রয়েছে। রয়েছে সাতটি

মহাসাগর। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে স্মরণাতীত কাল থেকে এই সব তথ্য রয়েছে।

■ আইনস্টাইন স্থান ও কালের আপেক্ষিক সম্পর্ক বা আপেক্ষিকতাবাদ আলোচনা করেছেন মাত্র কিছু বছর আগে। কিন্তু ভাগবতপুরাণে ৫০০০ বছর পূর্বেই কুকুদ্মি মুনির আপেক্ষিকতা বিষয়ক অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে।

■ জড় বিজ্ঞান এখনো এখনো মন কি তা জানাতে পারছে না; আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে স্থূল-শরীর কঠিন (ভূমি), তরল (জল), গ্যাসীয় (বায়ু), তাপ (অগ্নি) — ইত্যাদি পাঁচটি স্থূল উপাদানে তৈরী, এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার — এই তিনটি সূক্ষ্ম উপাদানে তৈরী সূক্ষ্ম শরীর। অর্থাৎ মন একটি জড় উপাদান (ভ.গী. — ৭/৪)।

■ বলা হয় যে শতকের গুণনীয়কের হিসাব ২/৩ হাজার বছর পূর্বে উদ্ভাবিত হয়েছে। অথচ বেদে অজস্র স্থানে শতকের গুণনীয়ক সংখ্যায় সহস্র-লক্ষ-কোটি-অর্বুদ-পরার্দ্ধের পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে। যেমন ৮৪ লক্ষ জীব প্রজাতির হিসাব (*চতুর্লক্ষশ্চ মানবাঃ*), আত্মার আয়তন (কেশাগ্রের ১০০০০ ভাগের এক ভাগ), কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের হিসাব (*একোহপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ড কোটিং/কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নম্ — ব্রহ্মসংহিতা ৫/*) ইত্যাদি।

গত শতাব্দীর ৯০-এর দশকে যখন বিশ্বের গণিতবিদ্ বিজ্ঞানীরা একটি অংকের কোনোভাবেই সমাধান করতে পারছিলেন না, দক্ষিণ ভারতের ক্ষণজন্মা গণিতবিদ্ (৩২ বছরে মারা যান) রামানুজম্ বৈদিক গণিতের সাহায্য নিয়ে দুইভাবে সেই জটিল অংকের সমাধান বের করে গণিতবিদ্‌দের বিস্মিত করেন।



★ এমন কি চিকিৎসাবিদ্যার সংগে সম্পর্ক-রহিত, সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত মহাগ্রন্থ **শ্রীমদ্‌ভাগবতম**-এও আমরা মানব ভ্রূণবিদ্যা বা গাইনিকোলজির এক উজ্জ্বল বিবরণ দেখতে পাই, যেখানে মাতগর্ভে প্রথম মাস থেকে দশম মাস পর্যন্ত মাসানুযায়ী ভ্রূণদেহের বিকাশের পর্যায়ক্রমিক বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। আজ অত্যাধুনিক জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে যা জানা যাচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রে তা হাজার হাজার বছর পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

★ বেদে বলা হয়েছে যে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ — সকল জীবের দেহের মধ্যে রয়েছে প্রাণ, জীবনী শক্তি বা আত্মা। অথচ বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল ধরে এই বিশ্বাস প্রচার করতেন যে উদ্ভিদের প্রাণ নেই — যতদিন না জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখালেন যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে।

★ বেদ দাবী করেন যে এমনকি আগুনের মধ্যেও জীব রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা ভাবতেন যে এমনকি ফোটানো জলেও বাঁচতে পারে না ব্যাকটেরিয়া (সে জন্যই তাঁরা ফোটানোর মাধ্যমে নির্জীবকরণ করতেন)। কিন্তু সাম্প্রতিক চিকিৎসা গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে এক ধরণের জীবাণু রয়েছে যারা আগুনের মধ্যেও বাঁচতে সক্ষম, তাঁরা এর নাম দিয়েছেন 'আগুন ব্যাকটেরিয়া' (*Fire Bacteria*)। এছাড়া বহু প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্রবণে এবং এমনকি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখেও তাঁরা ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পেয়েছেন।

★ বেদে বিভিন্ন অবতার সমূহ বা মহাপুরুষগণের বিশদ বিবরণ-সহ ভবিষ্যতে তাঁদের আবির্ভাবের নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী প্রদত্ত হয়েছে। **শ্রীমদ্ভাগবতমে** এরকম সাত জন্য ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে : (১) বুদ্ধদেব — **শ্রীমদ্ভাগবত : ১-৩-২৪; (২) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — শ্রীমদ্ভাগবত : ১১-৫-৩২, মহাভারত-**

১২৭/৯২/৭৫; (৩) চাণক্য — শ্রীমদ্ভাগবত ঃ ১২/১/১১; চন্দ্রগুপ্ত এবং সম্রাট অশোক — শ্রীমদ্ভাগবত ঃ ১২/১/১২, যীশু — ভবিষ্যপুরাণ, মহম্মদ — ভবিষ্য পুরাণ, অথর্ব বেদ, কাণ্ড-২০, সুক্ত ১২৭, মন্ত্র ১-৩।

বেদ ভগবানের বাণী। বেদ হচ্ছে শব্দ-বিধৃত জ্ঞান যা সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে অব্যাহত ধারায় বহমান, এবং জড় বিজ্ঞানের মতো কালের প্রবাহে এই জ্ঞানের কোনো পরিবর্তন হয় না। বেদ মানুষের মনঃকল্পিত ধারণার সংকলন নয় — যদিও কিছু মানুষ এরকমই অনুমান করতে চেষ্টা করেন। বেদে পরম জ্ঞান (*Absolute Knowledge*) বিধৃত রয়েছে। যিনি জীবনের রহস্য এবং জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্তর জানার জন্য প্রকৃতই আগ্রহী, তাকে অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্রের, বিশেষতঃ ভগবদ্গীতার জ্ঞানভাণ্ডার-এর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। যারা মেধাহীন, তাদেরকে লক্ষ লক্ষ জন্ম প্রতীক্ষা করতে হবে — জড় বিজ্ঞান কতদিনে ভগবান এবং আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করবে, তার জন্য। অন্যদিকে একজন মেধাবী সত্যসন্ধানী যথার্থ বৈদিক জ্ঞানের প্রতিনিধির নিকট থেকে শ্রবণের মাধ্যমে সত্য অবগত হয়ে অচিরেই জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করবেন।

জ্ঞান লাভের দুটি পদ্ধতি

বৈদিক জ্ঞান যেহেতু বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক, সেজন্য আমরা তা গ্রহণ করি। এতে অযথা সময়ের অপচয় বন্ধ হয়। আমরা যদি জ্ঞানের যথার্থ উৎস, প্রামাণিক উৎস খুঁজে পাই, তাহলে সময় বাঁচে যথেষ্ট। জড়জগতে জ্ঞান লাভের দুটি পদ্ধতি আছে ঃ *আরোহ* এবং *অবরোহ*।

<u>আরোহ পন্থা</u> (Inductive/Ascending Method) ঃ আরোহ পন্থার অর্থ হচ্ছে কোন প্রামাণিক কর্তৃত্বের অস্তিত্ব স্বীকার না করে নিজের প্রচেষ্টায় বা অনুমানের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা।

উদাহরণস্বরূপ ঃ

★ আপনি যদি এই পন্থায় আপনার পিতাকে তা জানতে চান, তাহলে আপনাকে পৃথিবীর প্রতিটি পুরুষকে — প্রায় ৫০ কোটি পূর্ণবয়স্ককে পরীক্ষা করে দেখতে হতে পারে। এভাবে, আপনার পিতৃপরিচয় জানার জন্য আপনার জীবনকালও পর্যাপ্ত না হতে পারে। সেজন্য পিতা, ভাই, বোনের পরিচয় জানার জন্য কেবল মায়ের দেওয়া তথ্যকে গ্রহণ করাই সমীচীন। পরীক্ষা নিরীক্ষার কোনো প্রশ্নই নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারাও আপনি হয়ত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন হবে অসীম প্রয়াস এবং অপর্যাপ্ত সময়।

★ মানুষ মরণশীল — প্রত্যেকেই বলে থাকে। কিন্তু আপনাকে যদি গবেষণা করে এই বক্তব্যকে প্রমাণ-সিদ্ধ করতে হয়, তাহলে আপনাকে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকেই পরীক্ষা করে দেখতে হবে যা কার্যতঃ অসম্ভব, এবং তা করলেও আপনার মনে হতে পারে যে এখনো এমন মানুষ হয়ত রয়েছে যার মৃত্যু হবে না, কিন্তু আপনি এখনো তাকে খুঁজে পাননি। *এই হচ্ছে আরোহ পন্থা*।

<u>অবরোহ পন্থা</u> (Deductive/Descending Method) ঃ বেদকে শ্রুতিও বলা হয়। শ্রুতি হচ্ছে সেই জ্ঞান, যা শ্রবণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এটি পরীক্ষামূলক জ্ঞান নয়। বেদ বা শ্রুতিকে মাতা হিসাবে গণ্য করা হয়। আমরা মাতার নিকট থেকে বহুরকম জ্ঞান লাভ করে থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ

● যদি আপনি আপনার পিতৃপরিচয় জানতে চান, তাহলে আপনাকে সেই পরিচয় পেতে হবে আপনার মাতার কাছ থেকে। তেমনি, **যদি আপনাকে এমন কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হয় যা অভিজ্ঞতার অতীত, যা আপনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিসীমার অতীত বা ইন্দ্রিয়সমূহের কার্যকলাপের বাহিরে, তাহলে বেদকে গ্রহণ করতেই হবে।**

কিভাবে আমরা সত্যকে জানতে পারি?

জ্ঞান অর্জনের দুটি পন্থা

আরোহ পন্থা (*Inductive/ Ascending method*)	অবরোহ পন্থা (*Deductive/ Descending Method*)
কোন প্রামাণিক কর্তৃত্বকে স্বীকার না করে নিজের চেষ্টায় অনুসন্ধান করে বা অনুমান করে সত্যকে জানা	ভগবান হতে পরম্পরা-ক্রমে আগত বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করা (শব্দ প্রমাণ)

দৃষ্টান্ত-১ ঃ পিতা কে?

- *"আমি পরীক্ষা করে নিজে এর সমাধান করব"* — আরোহ।
- *"আমি আমার মাকে জিজ্ঞাসা করব"* — অবরোহ।

দৃষ্টান্ত-২ ঃ মানুষ কি মরণশীল?

- *"আমি একথা মানি না; আমি গবেষণা করে জানতে চাই"* — আরোহ।
- *"আমি এই সত্যকে স্বীকার করছি"* — অবরোহ।

● অবরোহ জ্ঞানের মাধ্যমেই আপনি এটি নিশ্চিত রূপে স্বীকার করেছেন, সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন যে মানুষ মরণশীল। আপনার পিতা বলেন মানুষ মরণশীল, আপনার বোন বলেন মানুষ মরণশীল, প্রত্যেকেই বলেন মানুষ মরণশীল — আপনি পরীক্ষা করেন না। আপনি সত্য বলে স্বীকার করেন যে মানুষ মাত্রই মরণশীল।

এই হচ্ছে অবরোহ জ্ঞান। **সেজন্য অবরোহ পন্থায় প্রাপ্ত বৈদিক জ্ঞানকে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে।** যদি আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়াসের মাধ্যমে, আমাদের অপূর্ণ ইন্দ্রিয়গুলির উপর নির্ভর করে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হয়, তাহলে আমরা কখনোই সত্যে উপনীত হতে সমর্থ হব না।

বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রের মধ্যে ভগবদ্‌গীতার বিশিষ্টতা

বৈদিক শাস্ত্র সমূহের মধ্যে রয়েছে চারটি বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি। এই সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে অপ্রাকৃত সাহিত্য **শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা** হচ্ছে একটি অপ্রাকৃত গ্রন্থ, যা অন্য সমস্ত শাস্ত্রের সারাতিসার হিসাবে স্বীকৃত ভগবদ্গীতার নির্দেশ যথাযথরূপে অনুসরণ করলে আমরা জীবনের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা-উৎকণ্ঠা থেকে বিমুক্ত হতে পারি। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তাঁর রচিত *গীতা-মাহাত্ম্যে* ভগবদ্‌গীতার মহিমা এইভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

মলিনে মোচনম্‌ পুংসাং জল-স্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্‌-গীতামৃতস্নানং সংসারমলনাশনম্‌॥

"প্রতিদিন জলে স্নান করে মানুষ নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে। কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্‌গীতার গঙ্গাজলে একটি বারও স্নান করে; তা হলে তার জড় জীবনের মলিনতা একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়।" (গীতা মাহাত্ম্য — ৩)

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

"এই গীতোপনিষদ, ভগবদ্‌গীতা সমস্ত উপনিষদের সারাংসার এবং তা ঠিক একটা গাভীর মতো, আর রাখাল বালকরূপে প্রসিদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই গাভীকে দোহন করেছেন। অর্জুন যেন গোবৎসের মতো এবং জ্ঞানীগুণী শুদ্ধভক্তেরা ভগবদ্‌গীতার সেই অমৃতময় দুগ্ধ পান করছেন।" (গীতা মাহাত্ম্য — ৬)

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্র গীতম্‌ একো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা॥

"বর্তমান জগতে মানুষ আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করছে একটা শাস্ত্রের, একক ভগবানের, একটা ধর্মের এবং একটা বৃত্তির। তাই *একং শাস্ত্র দেবকী পুত্র গীতম্‌* — সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য সেই একক শাস্ত্র হোন ভগবদ্‌গীতা, *একো দেবো দেবকীপুত্র এব* — সমস্ত বিশ্বচরাচরের একক ভগবান হোন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। *একো মন্ত্রস্তস্য নামানি* — একক মাত্র, একক স্তোত্র হোক — হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ আর সমস্ত মানুষের একটাই বৃত্তি হোক — পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা।" (গীতা মাহাত্ম্য — ৭)

কলিযুগে মানুষ স্বল্পায়ু। সেজন্য সামগ্রিক বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে জ্ঞানলাভ করা এখন প্রায় প্রতিটি মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এজন্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারস্বরূপ ভগবদ্‌গীতা আধুনিক ব্যস্ত মানুষকে তার জীবনকে পরম সার্থক করে তোলার অভ্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

ভগবদ্‌গীতা উপলব্ধির জন্য অতি প্রয়োজনীয় কিছু সূত্র

ভগবদ্‌গীতা পাঠ শুরু করার পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর স্মরণ রাখা কর্তব্য ঃ

★ ভগবদ্‌গীতা বাস্তব সত্য, না প্রতীকি?

ভগবদ্‌গীতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথন যা প্রকৃতই ঐতিহাসিক। ভাবীকালের সকল মানুষের জন্য ঐ কথোপথন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কুরুক্ষেত্র একটি ঐতিহাসিক স্থান, যা আজও বিদ্যমান। অর্জুন, যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দুর্যোধন-এর মতো মহাভারতের সমস্তই চরিত্রই বাস্তব, তারা সত্যিসত্যিই ছিলেন। এই ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করা, কিংবা এর মধ্যে কোনো রূপক অর্থ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা অত্যন্ত অসমীচীন।

★ কিভাবে ভগবদ্‌গীতা উপলব্ধি করা উচিত?

ভগবদ্‌গীতাকে উপলব্ধি করতে হবে **"যথাযথ"** রূপে (**'As It Is'**)। আমাদের দেশে ভগবদ্‌গীতার অসংখ্য সংকলন রয়েছে, যা কষ্টকল্পিত, বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যায় ভর্তি। গীতার এই সব সংকলকেরা ব্যাখ্যা করেন ঃ "সম্ভবতঃ কৃষ্ণ এই উক্তির দ্বারা এটাই বোঝাতে চেয়েছেন" — এইভাবে তাঁরা জল্পনা কল্পনা করতে থাকেন। পরম সত্য সম্বন্ধে কোনো মানসিক জল্পনার প্রয়োজন নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা রিসার্চ-এর অর্থই হচ্ছে হারানো কোন কিছুকে নির্ধারণের প্রয়াস।

কিন্তু শাস্ত্র যখন পরম সত্যকে উপস্থাপন করে, তখন সরাসরি গ্রহণ করার পরিবর্তে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা, গবেষণা করা বা তাকে বিকৃত করার প্রয়োজন কোথায়? আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ অর্থকে গ্রহণ করা এবং তাকে কার্যে রূপায়িত করা। আমাদের এভাবে পড়া উচিত নয়, "ভগবদ্‌গীতা ঃ যেমন আমি এটিকে দেখতে চাই", কিংবা, "ভগবদ্গীতা ঃ যেমন এটি হওয়া উচিত"। আমাদের পড়া উচিত — "**শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ঃ যথাযথ (As It Is)**, যা আমাদেরকে ভগবদ্গীতার প্রত্যক্ষ অর্থ প্রদান করে — ঠিক শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলেছিলেন, কোনো রকম বিকৃতি বা অপব্যাখ্যা ছাড়াই। আর এটা ব্যবহারিকভাবেই প্রমাণিত সত্য যে পরম্পরা ধারা-ক্রমে আগত এই **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ** মানুষের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে পারে, তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত পাপময় কার্যকলাপ থেকে বিমুক্ত করে তাদের জীবনকে নির্মল, পবিত্র করতে পারে।

★ ভগবদ্গীতার লক্ষ্য — শ্রীকৃষ্ণ ঃ

ভগবদ্গীতার বিষয়, মুখ্য প্রতিপাদ্য এবং লক্ষ্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। ভগবদ্‌গীতার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হলেও সেগুলি যে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি, তার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত সংস্করণে কৃষ্ণ-অর্জুনকে দুরে সরিয়ে রেখে বা তাদের অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে ভাষ্যকারেরা তাদের নিজেদের স্বকপোলকল্পিত বা স্বমত-দুষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাদের ঐ সব সিদ্ধান্ত আদৌ গীতার বাণী নয়, তা তাদের আপন মানস-সৃষ্টি। গীতা যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়কে গুরুত্ব না দিয়ে কখনই ভগবদ্‌গীতাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

★ শ্রীকৃষ্ণ — ভগবদ্গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য ঃ

পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন যোগী পুরুষ, বিদ্বান বা বলশালী ব্যক্তি-মাত্র নন। ভগবান কোনো সাধারণ বা এমনকি অসাধারণ কোনো মানবও নন। তিনি পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। ভগবদ্‌গীতা যে সারা বিশ্বে অত্যন্ত সমাদৃত তার কারণ এটি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত, আর শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। অর্জ্জুনের মতো ভগবদ্ভক্তই কেবল ভগবদ্‌গীতা উপলব্ধি করতে পারেন। ভগবদ্‌গীতা উপলব্ধির জন্য অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবেও স্বীকার করতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। সুতরাং ভক্তিপূর্ণ মনোভাব নিয়ে ভগবদ্গীতাকে গ্রহণ করা উচিত।

★ আজকের দিনে ভগবদ্গীতার প্রাসংগিকতা ঃ

ভগবদ্গীতা কখনই পুরানো হয়ে যায় না, কেননা এটি সর্ব-স্থানে, সর্ব কালে, সর্ব পরিস্থিতিতে সর্বদাই ফলপ্রসু, প্রাসঙ্গিক। আপেক্ষিক জ্ঞান (যেমন পদার্থ বা রসায়নবিদ্যা) পুরানো বা পরিবর্তনযোগ্য হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা তাদের ত্রুটিপূর্ণ সীমিত-শক্তির ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে প্রবল প্রয়াসের মাধ্যমে এক ধরণের ত্রুটিপূর্ণ আপেক্ষিক সত্যকে পরাভূত করে তার থেকে উন্নততর কোনো ত্রুটিপূর্ণ আপেক্ষিক সত্যের অবতারণা করে চলেছেন। পক্ষান্তরে ***ভগবদ্গীতা*** উপস্থাপন করছেন পরম জ্ঞান (*Absolute Knowledge*), যা প্রদত্ত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা — যিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ (*Absolute Person*), এবং পরমেশ্বর ভগবান (*The Supreme Personality*), যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিহীন, পূর্ণ। তিনি আজ থেকে ১২ কোটি বছর পূর্বে এই একই জ্ঞান পৃথিবীতে প্রদান করেছিলেন। সেই একই জ্ঞান কোনোরূপে বিকৃতি বা পরিবর্তন ছাড়াই আজও বিদ্যমান। সুতরাং ভগবদ্‌গীতার জ্ঞান হচ্ছে 'রাজবিদ্যা', সকল জ্ঞানের রাজা। এই জ্ঞান পরম, অভ্রান্ত, শাশ্বত ; স্থান, কালের পরিধির অতীত।

★ ভগবদ্গীতা — একটি বিজ্ঞান ঃ

ভগবদ্‌গীতা একটি বিজ্ঞান। প্রকৃত ধর্ম একটি বিজ্ঞান বিশেষ। ভগবদ্‌গীতায় প্রদত্ত জ্ঞান পরীক্ষাযোগ্য ; সেকথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে প্রতিপন্ন হয়েছে ; '*প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং* (ভ. গী. ৯.২)। কোন ধর্মের যদি দার্শনিক ভিত্তি না থাকে,

তবে তা ভাবপ্রবণতা (*Sentimentalism*) ছাড়া আর কিছুই নয়। আর ধর্ম (ধর্মীয় ভিত্তি) ছাড়া যে কোন দর্শন কেবল মানসিক জল্পনা-কল্পনা-মাত্র। ভগবদ্গীতা হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম ও যথার্থ দর্শনের বিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপনা।

★ ভগবানের বাণী ভগবানের মতই মঙ্গলপ্রদ ঃ

ভগবানের বাণীর সংগে স্বয়ং ভগবানের কোনো পার্থক্য নেই। সেজন্য অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে, নিজ জীবনের পরম পূর্ণতা-সাধনের লক্ষ্য নিয়ে ভগবদ্গীতার অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ গ্রহণ করা উচিত। যদিও শ্রীকৃষ্ণ সেইভাবে এখন আমাদের সামনে উপস্থিত নেই — যেমন ভাবে তিনি অর্জুনের সামনে ছিলেন, তবু তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত "বাণী" বা উপদেশ আজও অবিকৃতভাবে বর্তমান। যিনিই প্রগাঢ় আন্তরিকতার সংগে ভগবৎ-প্রদত্ত বাণী অনুধাবনে প্রবৃত্ত হবেন, ভগবান তাঁর সঙ্গে অনুরূপভাবেই আদানপ্রদান করবেন।

★ ভগবদ্গীতা ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে কেন কথিত হয়েছিল?

ভগবদ্গীতার জ্ঞান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রদত্ত হয়েছিল — এটি তাৎপর্যবহ। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের মতো আমাদের জীবনও যেন এক মহাযুদ্ধ, মহাসংগ্রাম। রণভূমিতে অর্জুনের মতোই জীবন-যুদ্ধে আমাদের উত্তীর্ণ হওয়া অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার। যারা জীবন-সংগ্রামে প্রকৃতই জয়ী হতে অভিলাষী, ভগবদ্গীতা তাদের জন্য। ভগবদ্গীতা আমাদের সকলের জন্য, অজ্ঞানতা থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

কার কাছ থেকে ভগবদ্গীতা শ্রবণ করব?

আমরা বুঝতে পারি যে কেবল শব্দ-প্রমাণ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান অভ্রান্ত ও পূর্ণ। কেবল শব্দ-প্রমাণের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হলেই হবে না, এই জ্ঞান আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে ব্যক্তিগতভাবে একজন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের নিকট থেকে, অর্থাৎ গুরুদেবের নিকট থেকে শ্রবণের মাধ্যমে, যিনি এই জ্ঞান উত্তমরূপে অধীত করেছেন। মুণ্ডক *উপনিষদে* বলা হয়েছে (১/১/১২) ঃ *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।* (**মুণ্ডক উপ-১/২/১২**) "সেই পারমার্থিক বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করতে হলে অবশ্যই একজন সদ্গুরু গ্রহণ করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে গুরু গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে যজ্ঞ কাষ্ঠ বহন করে গুরুর কাছে যেতে হবে। সদ্গুরুর লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি বৈদিক সিদ্ধান্তে পারঙ্গম্ এবং তাই সর্বদাই তিনি পরমেশ্বরের সেবাকর্মে নিয়োজিত থাকেন।"

আমরা কেন গুরু গ্রহণ করব?

প্রায়ই দেখা যায় যে, আমরা যখন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সদ্গুরু গ্রহণের কথা বলি, তখন অনেকেই আমাদের ভর্ৎসনা করে যুক্তি দেখান যে অন্ধভাবে কারো কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে নিজের মহার্ঘ আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। তাঁরা ভাবেন, *"যদি নিজের চিন্তা নিজেই করি, নিজের যুক্তিবোধ বিচার শক্তির উপর আস্থা রাখি তাহলে সেটাই কি আরো ভালো নয়? অন্য কোনো ব্যক্তির মতবাদকে বেদবাক্য বলে মেনে নেবার কি দরকার? কেনই বা পরমসত্য বিশেষ কোনো একজন ব্যক্তির একচেটিয়া সম্পত্তিতে পরিণত হবে? সর্বোপরি, কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তি যা বলবেন তাকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে কেন?"* অবশেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন, *"... আমাদের উচিত হচ্ছে, আমাদের কাছে যা-কিছু ঠিক বা ভাল বলে মনে হবে, তা গ্রহণ করা, আর অন্য সব-কিছু বর্জন করা।"* এইভাবে তাঁদের দ্বৈত-অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ তাঁরা স্বাধীন থাকতে চান এবং একই সাথে সমস্ত প্রামাণিক আচার্যবর্গের কথিত জ্ঞান-সম্ভারের সর্বোত্তম রত্নসম্পদগুলি লাভ করতে চান। একজন পারমার্থিক আচার্য সম্বন্ধে এতটা আশঙ্কিত হবার

আগে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে কিছু দৃষ্টান্ত বিচার করে দেখা যাক ঃ

● একজন চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণের সময় আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একজন প্রামাণিক ব্যক্তিত্ব বা আচার্যের শরণাপন্ন হচ্ছি। একজন সুযোগ্য চিকিৎসকের কাছ থেকে ঔষধ ও পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা কি তাঁকে একজন চিকিৎসাশাস্ত্রের কর্ণধার বা মেডিক্যাল অথরিটি হিসাবে তাঁর উপর আমাদের আস্থা বা বিশ্বাস প্রদর্শন করছি না?

● যখনই আপনি কোনো বাসে উঠছেন, আপনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বাস-চালকের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছেড়ে দিচ্ছেন। আমরা কি প্রত্যেকবার বাসে ওঠার সময় বাস-ড্রাইভারের লাইসেন্স পরীক্ষা করে দেখি?

● ইঞ্জিনীয়রীং-এর কোনো ছাত্র যখন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং পড়তে চান, তখন তিনি এ-বিষয়ে দিক্পাল তাত্ত্বিক বি.আই.থেরেজার কর্তৃত্ব মেনে নেন। অথবা, বিজ্ঞানের যে কোনো ছাত্র বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রকাশিত বইগুলির প্রামাণিকতা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে স্বীকার করে নেন।

● শিশু তার জননীকেই প্রামাণিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে গ্রহণ-করে থাকে এবং কেবল তার মধ্যমেই শিশুটি তার বাবা-ভাই-বোনদের সম্বন্ধে অবগত হয়।

● সংবাদপত্র ও রেডিও-টিভি থেকে আমরা হয়ত জানতে পারলাম যে চীন ও ভারতে এইরকম সব ঘটনা ঘটছে। আমরা সরাসরি ঐসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করি না এবং আমরা জানিও না ঐসব ঘটনা সত্যিই সেখানে ঘটছে কিনা কিন্তু আমরা বাস্তবে সেগুলি বিশ্বাস করি, কেননা আমরা সংবাদদাতাদের প্রামাণিকতা স্বীকার করে নিই, তাঁদের উপর আস্থা স্থাপন করে থাকি, সংবাদমাধ্যমের প্রামাণিকতা স্বীকার করে নিই।

জ্ঞান লাভের জন্য প্রামাণিক কর্তৃপক্ষের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার ছাড়া আমাদের কাছে অন্য কোনো পথ খোলা নেই

আপনি যদি কোন এক দল সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে তাদের একজনকে ডেকে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মশাই! আপনি কি আমাকে একটি ফাইনাইট এলিমেন্ট অ্যানালিসিসের ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স অংকের সমাধান বলে দিতে পারেন?' তিনি তখন ঢোক গিলে বলবেন, "দুঃখিত, ওটি আমার সাব্জেক্ট নয়।" আপনি আরেকজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, "মশাই, আপনি কি মেডুলা অবলংগাটা বিষয়ে কিছু তথ্য দিতে পারেন?" তিনি বলবেন, "দুঃখিত, আমি মেডিক্যালের ছাত্র নই।" কিন্তু আপনি এবার তাদের এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করুন "আপনাদের মধ্যে কেউ কি ভগবান সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারেন?" তখন প্রত্যেকেই সরব হয়ে উঠবে, নানা কথা বলতে শুরু করবে ঃ "ভগবান এই রকম ... আমার ধারণা ভগবান ওইরকম" ... ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে এইসব কথাবার্তা কি ব্যাঙের গর্জনের চেয়ে আদৌ বেশি দামি? অন্য বিষয়গুলোতে তারা প্রামাণিক ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে শিক্ষালাভ না করার জন্য মুখ খোলেনি, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে তারা প্রত্যেকেই এক একজন মহাবিজ্ঞ। এটিই হচ্ছে আসল সমস্যা। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত তাদের এই প্রশ্নটি করা, "তোমাদের কথার প্রামাণিকতা কোথায়? কোথা থেকে পাওয়া তোমাদের এই 'জ্ঞান'?"

আমরা দেখলাম যে আমাদের চার ধরণের ত্রুটি রয়েছে, এবং আমরা এবিষয়েও নিশ্চিত হয়েছি যে আমাদের সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলি এমনকি এই জড়জগত সম্বন্ধেও ত্রুটিহীন, পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করতে পারে না; তাহলে জড়াতীত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? পারমার্থিক তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে কারোরই জল্পনা-কল্পনা করতে প্রয়াসী হওয়া উচিত নয়, কেনন এটি আমাদের মন ও জড়েন্দ্রিয়ের পরিধির অতীত।

অতএব একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলির সীমাবদ্ধতার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন, এবং তিনি আর প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণের মাধ্যমে প্রদত্ত জ্ঞানকে সত্য বলে গ্রহণ করেন না। তিনি কেবল সেটিই গ্রহণ করেন যা স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত, কেননা কেবলমাত্র তিনিই অভ্রান্ত পূর্ণজ্ঞান প্রদানে সমর্থ। আর যিনি ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন এবং কোন রকম সংযোজন-বিয়োজন না করে সেই একই বাণী বা তথ্য পুনরাবৃত্ত করছেন, তাঁকে ভগবানের একজন মহার্ঘ প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এইরকম একজন ব্যক্তির নিকট থেকে অভ্রান্ত সত্য-জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে।

এমনকি আপনি যদি সঙ্গীত, নৃত্যকলা, অ্যাথলেটিক্স কিংবা ক্যারাটেও শিখতে চান, তখন আপনি একজন প্রশিক্ষক বা কোচের তত্ত্বাবধানে সেগুলির শিক্ষালাভ করে থাকেন। আপনি ঐসব ক্ষেত্রের কোন সুপারদর্শী বিশেষজ্ঞের অধীনে একজন শিক্ষার্থী হবার জন্য স্বেচ্ছায় সম্মত হন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি; তাহলে আধ্যাত্মিক জীবনে একজন শিক্ষক গ্রহণ করতে বাধা কোথায়? আমাদের জানতে হবে যে আমরা সরাসরি ভগবানের সান্নিধ্যে যেতে পারিনা; সেটি সম্ভব নয়। তাঁর ভক্তগণের মাধ্যমেই সম্ভব ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার।

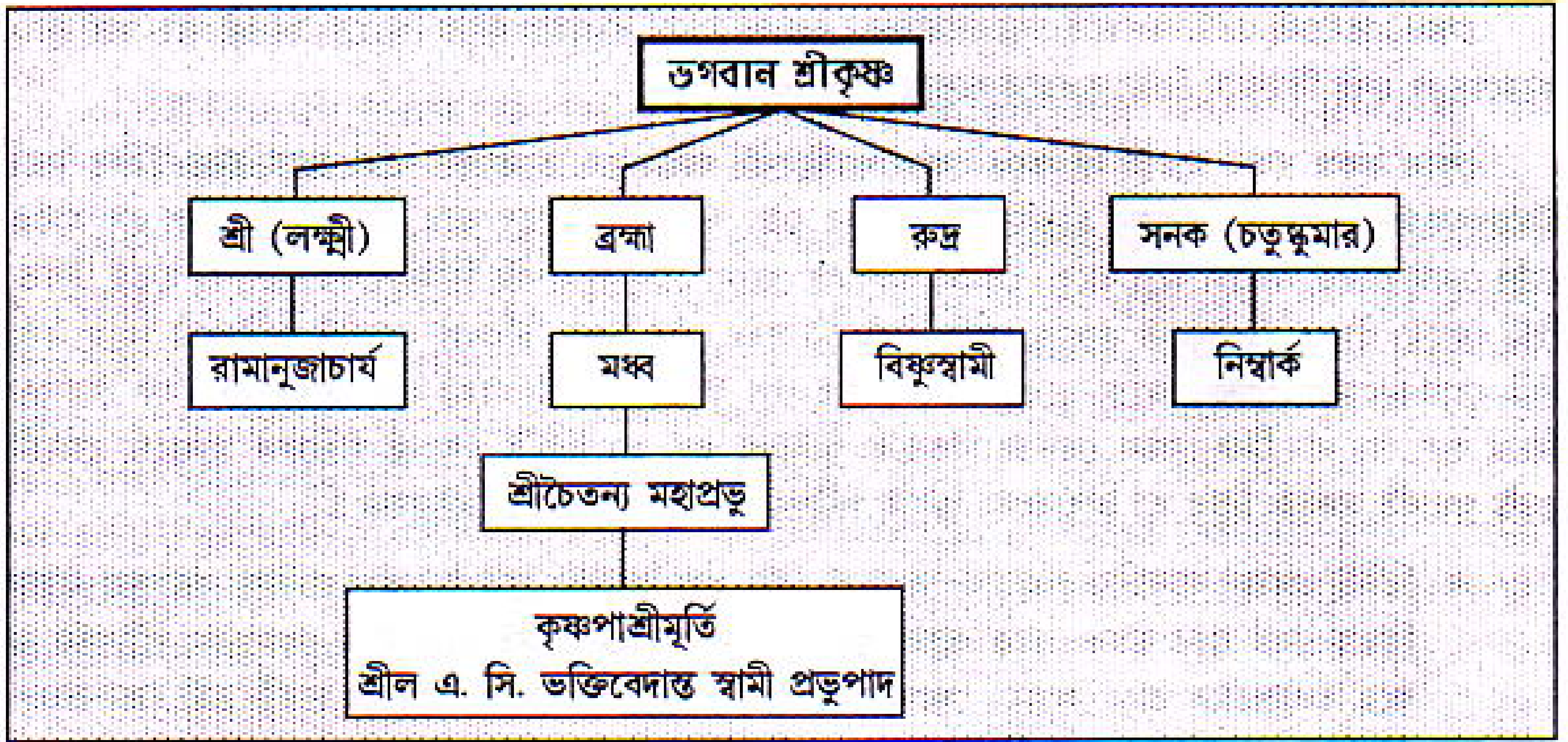
এমনকি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি সান্দীপনি মুনিকে গুরু-রূপে বরণ করার মাধ্যমে গুরুগ্রহণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বশিষ্ঠ মুনিকে গুরু রূপে বরণ করেন। সুতরাং সকল জ্ঞানের পরম উৎস স্বয়ং পরমপুরুষ ভগবানও গুরুগ্রহণের প্রায়োজনীয়তা বোঝানোর জন্য স্বয়ং গুরু গ্রহণ করে থাকেন।

পরম্পরা ধারা ও সম্প্রদায়

বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান বেদ হতে অবরোহ পন্থায় গুরুদেবের মাধ্যমে শিষ্যের কাছে প্রবাহিত হয়। এইভাবে জ্ঞান-প্রবাহের এই পর্যায়ক্রমিক শৃঙ্খলকে বলা হয় গুরু-পরম্পরা, গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারা। ভগবদ্গীতায় (ভ.গী. ৪.২) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, *এবং পরম্পরা প্রাপ্তং ঃ "এই পরম বিজ্ঞান (ভক্তিযোগ, ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান) লব্ধ হয়েছিল গুরু-শিষ্য পরম্পরা ক্রমে।"* এইভাবে, একজন শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সম্বন্ধ কেবল তার নিজ গুরুদেবের সংগেই নয়; তার সম্পর্ক তার গুরুদেবের গুরু, তাঁর গুরুদেব, তাঁর গুরু — এইভাবে অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্যক্রমে স্বয়ং ভগবানের সংগে যুক্ত গুরু-শিষ্যের এক শৃঙ্খলের সংগে। এইভাবে কোনো গুরুদেব যে বিশেষ পরম্পরা ধারার অন্তর্ভূক্ত, তাকে বলা হয় তাঁর সম্প্রদায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রহ্মা সম্প্রদায়ে (ইসকনের তত্ত্ব-দর্শনের ভিত্তি ব্রহ্মা সম্প্রদায়) বৈদিক জ্ঞান প্রবাহিত হচ্ছে ব্রহ্মা থেকে। ব্রহ্মা এই তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন নারদকে। নারদ এই জ্ঞান অর্পণ করেন ব্যাসদেবকে। এইভাবে ক্রমশঃ তা প্রবাহিত হয়। এই শিষ্য-পরম্পরা ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হতে থাকে, এবং আজও এই ধারা কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্ত্তি শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিষ্যবৃন্দের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে বহমান। *পদ্মপুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিস্ফলা মতাঃ।
অতঃকলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী ব্রহ্ম রুদ্র সনক বৈষ্ণব ক্ষিতিপাবন।
চত্বারস্তে কলৌ ভব্য হি উৎকলে পুরুষোত্তম॥
রামানুজম্ শ্রীঃ স্বীচক্রে মাধ্বাচার্যং চতুর্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনো রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥



উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কেউ যদি প্রামাণিক চতুঃসম্প্রদায় অর্থাৎ শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র বা কুমার সম্প্রদায়ের কোনো একটির সংগে গুরু-পরম্পরা ধারায় যুক্ত না হন, তাহলে যে মন্ত্রই তিনি জপ করুন না কেন, তা নিস্ফল হবে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রথমে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন **শ্রী** (লক্ষ্মী দেবী), **ব্রহ্মা**, **রুদ্র** (শিব) এবং **চতুষ্কুমারকে** (সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার), আর বর্তমানের কলিযুগে এই বৈদিক বাণী বাহিত হচ্ছে চারজন সম্প্রদায়-আচার্যবর্গের মাধ্যমে ঃ **রামানুজাচার্য** (শ্রী সম্প্রদায়), **মধ্বাচার্য** (ব্রহ্মা-সম্প্রদায়), **বিষ্ণুস্বামী** (রুদ্র সম্প্রদায়) এবং **নিম্বার্কস্বামী** (কুমার সম্প্রদায়)। এই চারটি সম্প্রদায় হচ্ছে চারটি ভগবদনুমোদিত প্রামাণিক সংস্থা যারা বেদের জ্ঞান নির্ভেজাল, অবিমিশ্রভাবে প্রদান করে থাকেন, কেননা এই জ্ঞানের উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, যিনি সমস্ত রকম ত্রুটি, ভ্রান্তি, অপূর্ণতার উর্ধ্বে। সুতরাং ঐ চারটি সম্প্রদায়ের যেকোন একটি হতে আগত গুরুদেব হচ্ছেন একজন যথার্থ প্রামাণিক সদ্গুরু। সেইজন্য ভগবদ্গীতা শ্রবণ করা উচিত এইরকম কোনো প্রামাণিক সদ্গুরুর নিকট থেকে।

গুরুদেবের যোগ্যতা

যেহেতু গুরুদেব হচ্ছেন শিষ্যের কাছে বৈদিক জ্ঞান বাহিত হবার মাধ্যম, সেজন্য তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জানা কর্তব্য কে গুরু নন, আর কেই বা প্রকৃত গুরু। **দুর্ভাগ্যবশতঃ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা প্রচুর সংখ্যায় পেশাদারী গুরুদেব এবং স্বঘোষিত বা শিষ্যঘোষিত ভণ্ড অবতারদের দেখতে পাচ্ছি, যারা —**

- কিছু গুপ্ত মন্ত্র ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবার জন্য নানা নামে ও ফন্দিতে ভালরকম দক্ষিণা নিয়ে থাকে;
- তাদের শিষ্যদেরকে সমস্ত রকম বৈদিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করার অনুমোদন দেয় (যেমন অবশ্য-পালনীয় চারটি বিধিনিষেধ ঃ মাংসাহার, নেশা, জুয়া বা অবৈধ যৌনক্রিয়া);
- যোগকে এক সাধারণ স্বাস্থ্য-চর্চার অঙ্গ হিসাবে শিক্ষা দেয় — যোগকে ভগবানের সংগে যুক্ত হবার কৌশল হিসাবে শিক্ষা না দেয় না;
- এই ধারণা পোষণ ও প্রচার যে যোগ-চর্চার উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়জাগতিক উপকার বা সুফল লাভ।
- এই রকম ঘোষণা করে বেদকে অমান্য করে থাকে ঃ *"আমি ভগবান। তুমিও ভগবান। প্রত্যেকেই ভগবান ..."* ইত্যাদি।

সেজন্য প্রথমেই এইটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন ঃ একজন যথার্থ সদ্গুরুর লক্ষণ কি, কে প্রকৃতই শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেছেন ও সেই দিব্যজ্ঞান তিনি অপরকে প্রদানে সমর্থ কিনা।

কোন রকম রকম যাচাই না করে কোন ব্যক্তিকেই অন্ধভাবে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি একজন হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছ থেকে ঔষধ গ্রহণ করে, সে বুদ্ধিহীন এবং সে আরও বেশি ভোগান্তিকেই আমন্ত্রণ করে থাকে। সেজন্য এইরকম কোনো যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত, যিনি কোনো স্বীকৃত মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডিগ্রী নিয়েছেন, যাঁর সুন্দর চিকিৎসা-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা আছে এবং যিনি রোগ-নিরাময়ে সুদক্ষ। কারো মুখের কথা, দেহের রূপ বা জাতি-বর্ণ বিচারের দ্বারা তাঁর গুরু হবার যোগ্যতা বিচার করা যায় না। **ঠিক যেমন সোনার বিশুদ্ধতা নির্ধারণ করা হয় নির্দিষ্ট ধরণের পরীক্ষার মাধ্যমে, তেমনি কেউ যথার্থই সদ্গুরু কিনা তা নির্ধারণের জন্যই পরীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে, তা এইরকম ঃ**

* তিনিই একজন প্রামাণিক গুরুদেব, 'সদ্গুরু', যিনি স্বয়ং ভগবান হতে আগত গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারায় শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভগবৎ-প্রদত্ত পরমতত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করেছেন। সেই জ্ঞান তিনি কোনরকম পরিবর্তন না করে অভ্রান্তভাবে প্রদান করেন। সেজন্য তাঁর কথা অভ্রান্ত, তা সাধারণ মানুষের চারটি ত্রুটি (*ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব*) হতে বিমুক্ত।

* **শ্রীমদ্ভাগবতে** বলা হয়েছে (১১/৩/২৯) ঃ

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়মুত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্॥

"অতএব কেউ যদি আন্তরিকভাবে প্রকৃত আনন্দ লাভের অভিলাষ করেন, তাহলে তাঁকে অবশ্যই দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে একজন সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। সদ্গুরুর যোগ্যতা হচ্ছে যে, তিনি গভীরভাবে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করেছেন, এবং অন্যদেরও সেই সব সিদ্ধান্ত বিষয়ে প্রত্যয় উৎপাদনে সক্ষম। যাঁরা জড় সুখ-সুবিধাকে অগ্রাহ্য করে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেছেন, সেই ধরণের মহান ব্যক্তিদেরই যথার্থ সদ্গুরু বলে জানতে হবে।"

একজন গুরুদেব অবশ্যই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তসমূহের সুগভীর তত্ত্ববোধ বা উপলব্ধি অর্জন করেছেন। কেননা তিনি পরম তত্ত্ব বা পরমসত্য শ্রবণ করেছেন, তা বুঝেছেন এবং অনুশীলনের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন। তিনি অবশ্যই ভগবদ্ভজনে ব্রতী হবেন। তিনি শাস্ত্রোক্তি দ্বারা এবং বর্তমান ও পূর্বতন সত্যদ্রষ্টা মহাজনগণের উক্তির দ্বারা তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত সমূহের সত্যতা, প্রামাণিকতা প্রতিপাদন করতে সমর্থ হবেন।

* তিনি কেবল পূর্ণজ্ঞান উপদেশ দেবেন না, তিনি হবেন একজন 'আচার্য', যিনি নিজ জীবনধারার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে শিক্ষা দেবেন।

* তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি অবশ্যই তাঁর বশীভূত থাকবে — তিনি হবেন সংযতেন্দ্রিয়। যদি কোনো গুরুদেবের ইন্দ্রিয়গুলি অসংযত থাকে, এবং তিনি যদি তাঁর শিষ্যদের ইন্দ্রিয় সংযমের শিক্ষা না দেন, তাহলে তিনি গুরু হবার যোগ্যতা-বিহীন। ষোড়শ শতাব্দীর একজন বৈদিক দার্শনিক এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন অগ্রগণ্য শিষ্য শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তার শ্রীউপদেশামৃত গ্রন্থে গুরুদেবের **ছয়টি লক্ষণের** উল্লেখ করছেন ঃ *"যে সংযমী ব্যক্তি বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, উদর এবং উপস্থের বেগ — এই ষড় বেগ দমন করতে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করতে পারেন।"*

* তিনি হবেন সত্যনিষ্ঠ, সকলের সুহৃদ, অনিন্দুক এবং সকল জীবের কল্যাণকামী।

* তিনি নিজে তাঁর ইন্দ্রিয়জ জল্পনা-কল্পনা-দ্বারা কোনরকম মনোধর্মী তত্ত্ব উদ্ভাবন করবেন না; তিনি কেবল তাঁর গুরুদেবের নিকট হতে প্রাপ্ত বাণী যথাযথ ও নির্ভেজালভাবে উপস্থাপিত করবেন।

প্রখর বৌদ্ধিক ঔৎকর্ষ থাকলেও কোনো ব্যক্তির যদি ব্যক্তিগত চরিত্র সন্দেহজনক হয়, তিনি যদি স্বার্থ বাসনাযুক্ত ও ভোগলিপ্সু হন, তিনি গুরুপদবাচ্য নন। যেহেতু ভগবানই হচ্ছেন গুরু-পরম্পরার আদি উৎস, যিনি পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রদানে সমর্থ, এবং যেহেতু ভগবান হতে পরম্পরা ধারায় ঐ একই জ্ঞান অবিমিশ্রভাবে প্রবাহিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছায়, সেজন্য আমরাও সেই পরম সত্য উপলব্ধি করতে পারি এবং আমাদের জীবন সার্থক করতে পারি। প্রত্যেক সভ্য মানবের কর্তব্য হচ্ছে এইরকম একজন প্রামাণিক তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিত্বকে গুরুরূপে বরণ করা, তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করা এবং এইভাবে জীবনকে সফল করে তোলা। ঠিক যেমন সুইচ টিপে আলো জ্বালা মাত্রই একটি ঘনান্ধকার ঘর নিমেষেই আলোকিত হয়ে ওঠে, তেমনি দিব্যজ্ঞানের জ্যোতিঃপ্রভার দ্বারা অজ্ঞান-তমসাবৃত হৃদয়কন্দর আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এইভাবে জ্ঞানদীপ্তি দ্বারা উদ্ভাসিত হলে মানুষ শাশ্বত অমৃতময় সুখ লাভ করতে পারে।

গুরু-সাধু-শাস্ত্রের মাধ্যমে যাচাই ও সামঞ্জস্যবিধান

কোনো বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য একটি পরীক্ষা-ও সামঞ্জস্যবিধানের ব্যবস্থা রয়েছে ঃ **গুরু-সাধু-শাস্ত্র**। গুরুদেবের শিক্ষাকে অবশ্যই **সাধুর** (অর্থাৎ গুরু-পারম্পর্যের পূর্বতন আচার্যগণের) **সিদ্ধান্তের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, এবং ঐ সিদ্ধান্তকে আবার হতে হবে প্রত্যক্ষভাবে শাস্ত্রানুগ**। কেউ তাঁর গুরুদেবের নিকট থেকে যে-জ্ঞান শ্রবণ করছেন, তিনি তার প্রামাণিকতা যাচাই করতে পারেন ঐ তত্ত্ব পরম্পরা ধারার অন্যান্য পূর্বতন আচার্যবৃন্দের প্রদত্ত জ্ঞান-এর সংগে এবং শাস্ত্রধৃত জ্ঞানের সংগে সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস কিনা, তা বিচারের মাধ্যমে। এই হচ্ছে পূর্ণ অভ্রান্ত জ্ঞানের প্রমাণ।

শিষ্যের যোগ্যতা

সকলেই গুরুদেবের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য উন্মুখ, কিন্তু বৈদিক জ্ঞানের গ্রহীতার জন্যও কিছু অবশ্যপূরণীয় যোগ্যতাবলী রয়েছে। একজন যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু শিষ্যের প্রত্যাশিত যোগ্যতা নীচে উল্লেখ করা হল ঃ

* *তস্মাৎগুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয়মুত্তমম্" (ভাঃ ১১/৩/২১)।* শিষ্য হবেন জীবনের চরম ও চিরন্তন লক্ষ্যের বিষয়ে আন্তরিকভাবেই জিজ্ঞাসু। জীবনের চিরস্থায়ী পরম কল্যাণ হচ্ছে পারমার্থিক কল্যাণ এবং শিষ্যকে হতে হবে এ-বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগী।

* *তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ* (ভ. গী. ৮.৩৪) ঃ *"সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর; তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।'* শিষ্যের চিন্তাধারা হবে এইরকম ঃ *"আমি ভগবান সম্বন্ধে কিছুই জানি না। এজন্য আমি বিনম্রচিত্তে আমার গুরুদেবের নিকট থেকে শ্রবণ করব।"* যদি শিষ্য এমন চিন্তা করে যে সব-কিছুই তাঁর জানা হয়ে গেছে, তাহলে এটাই বুঝতে হবে যে তার প্রকৃতপক্ষে কোন জ্ঞানই নেই।

একবার একজন যুবক একজন গুরুর কাছে ভগবান সম্বন্ধে জানবার জন্য উপস্থিত হল। গুরুদেব বলা শুরু করলেন কিন্তু যুবকটি তখনই বলে উঠল, "জানি জানি, আমি এটা জানি।' এইরকম প্রতিবারেই গুরুদেব যখন কিছু বলতে

যাচ্ছিলেন, যুবকটি একই উক্তির পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। তাঁক শিক্ষা দেবার জন্য গুরুদেব তাঁর হাতে একটি গ্লাস রেখে তাতে গরম দুধ ঢালতে লাগলেন। গ্লাসটি পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তারপর দুধ ছাপিয়ে পড়ে যেতে লাগল, তবুও গুরুদেবের দুধ ঢালায় বিরতি নেই। যুবকটি তা দেখে চীৎকার করে বলতে লাগল ঃ "আপনি কি দেখছেন না যে দুধ ছাপিয়ে পড়ে যাচ্ছে? আপনি বন্ধ করছেন না কেন?" গুরুদেব হাসলেন এবং বললেন, "এই হচ্ছে তোমার অবস্থা। যেহেতু অসংখ্য পূর্ব-ধারণায় তোমার মস্তিস্ক ভর্তি হয়ে রয়েছে, সেজন্য শাস্ত্র কি বলছে তা শ্রবণ করার মতো অবস্থা তোমার নেই।" যুবকটি তার ভুল বুঝতে পারল।

সুতরাং, শ্রবণ করতে হবে বিনীতভাবে, এবং খোলা মনে।

"স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥" (ভ.গী. ৪-৩) ***"সেই সনাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা; তাই তুমি এই বিজ্ঞানের অতি গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।"*** দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে — দেব ও অসুর। ভগবান অর্জুনকে এই মহিমময় বিজ্ঞানের একজন গ্রহীতা রূপে নির্বাচন করেছিলেন এইজন্য যে অর্জুন ছিলেন ভগবানের একজন ভক্ত। এই রহস্যময় 'উত্তম্' বিজ্ঞান উপলব্ধি করা একজন অসুরের পক্ষে সম্ভব নয়। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করেছেন, এবং অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রচিত গীতার যেকোনো ভাষ্য প্রামাণিক। অসুর স্বভাববিশিষ্ট মানুষেরা অবশ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর যথার্থ স্বরূপে গ্রহণ করতে আদৌ প্রস্তুত নয়। পরিবর্তে কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু মানসিক জল্পনার সৃষ্টি করে এবং তাঁদের এই কৃত্রিম উদ্ভাবনকে বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা তাঁরা অত্যন্ত রমণীয় রূপে উপস্থাপিত করে তাঁরা পাঠকবর্গকে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা-নির্দেশের পথ থেকে ভ্রষ্ট করে, তাঁদেরকে বিপথে পরিচালিত করে। সেজন্য *ভগবদ্গীতা* উপলব্ধি করতে হলে একজন শিষ্যকে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হতে হবে।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ***"সেই সব মহাত্মাগণ, যাদের গুরু ও ভগবানে পরা ভক্তি রয়েছে, কেবল তাঁদের কাছেই বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত তাৎপর্য স্বতঃই প্রকাশিত হয়"*** (*শ্বেতাশ্বতর* উপ. ৬.৩৮)। গুরুদেবের প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা থাকতে হবে। এই শ্রদ্ধা কেবল কোনো তাত্ত্বিক বিষয়ে বৌদ্ধিক সম্মতি-মাত্র নয়। বরং শিষ্য অবশ্যই গুরুদেবের নিকট তাঁর একজন অনুগত দাস হিসাবে আত্মসমর্পণ করবেন এবং গুরুদেবের উপদেশকে তাঁর জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করবেন। সর্বোপরি, গুরুদেব শিষ্যের পরিত্রাতা হিসাবে কার্য করেন। কেবল তিনিই বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করতে পারেন, এভাবে শিষ্যের জড়বন্ধন মোচন করতে পারেন। সেজন্য শিষ্য তাঁর গুরুদেবের নিকট চির ঋণী থাকবেন, যিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অজ্ঞানতাময় বদ্ধ জীবন থেকে উদ্ধার করেন এবং তাকে পূর্ণ জ্ঞানময়, দিব্যানন্দময় নিত্য জীবন প্রদানের মাধ্যমে তাঁকে আশীর্বাদধন্য করেন, কৃতকৃতার্থ করেন।

সংক্ষেপে, একজন শিষ্যের যোগ্যতাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ঃ

* শ্রবণের আগ্রহ
* আন্তরিক হৃদয়ে বিনম্রভাবে পারমার্থিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসা
* সেবার মনোভাব
* পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি
* গুরুদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা
* গুরুদেবের আদেশ পালনে উন্মুখতা।

ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু

ভগবদ্গীতায় **পাঁচটি মূল তত্ত্ব** আলোচিত হয়েছে ঃ

ঈশ্বর : পরম নিয়ন্তা, ভগবান।

জীব : অধঃস্তন নিয়ন্তা চেতন-সত্তা — ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

প্রকৃতি : সত্ত্ব-রজ-তম-এই ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতি।

কাল : শাশ্বত কাল — শ্রীকৃষ্ণের একটি শক্তি।

কর্ম : শাশ্বত কালের পরিসীমায় ও নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রকৃতির ত্রিগুণের সমন্বয়ে সম্পাদিত কার্যকলাপ।

ভগবদ্গীতায় প্রদত্ত সামগ্রিক তত্ত্বজ্ঞানকে তিনটি শিরোনামে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে ঃ

সম্বন্ধ : ভগবান কে? আমি কে? আমার ও ভগবানের মধ্যে সম্পর্ক কি?

অভিধেয় : সেই সম্বন্ধ পুনর্জাগরিত করার পন্থা।

প্রয়োজন : অন্তিম ফল লাভ, ভগবৎ-প্রেম প্রাপ্তি।

সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয় তত্ত্ব ও প্রয়োজন তত্ত্বের ভিত্তিতে ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু উপলব্ধির প্রয়াস পাঠককে সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করবে।

গীতা প্রতিযোগিতা ঃ এক

এর জন্য

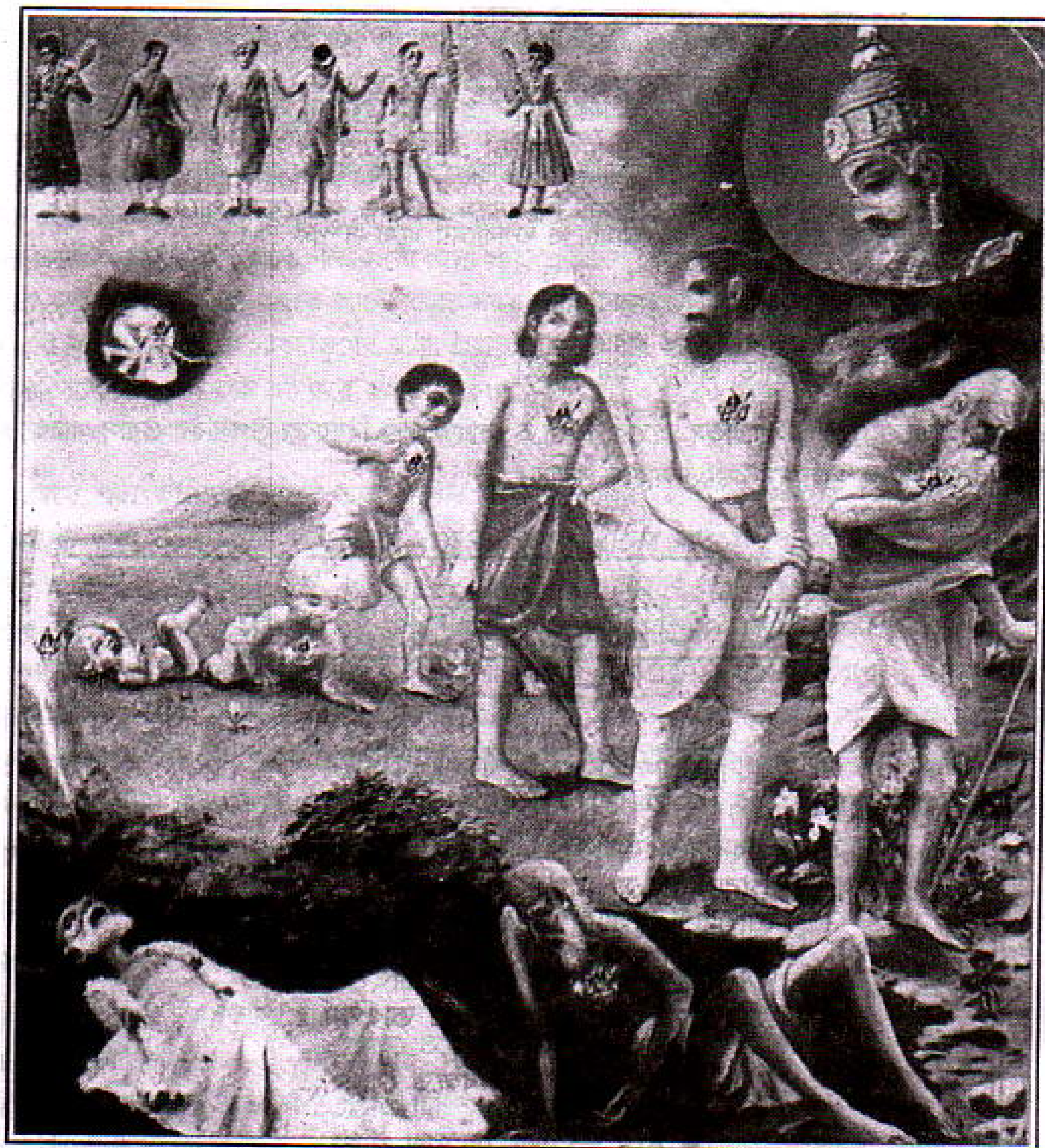
কিছু প্রাসঙ্গিক শ্লোক

- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ-র মুখবন্ধ ঃ ১ থেকে ৩৩ পৃষ্ঠা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ গ্রন্থ থেকে
নিম্নোক্ত শ্লোক, অনুবাদ ও তাৎপর্য ঃ

- ৪/১ — ইমং বিবস্বতে যোগং ...
- ৪/২ — এবং পরম্পরা প্রাপ্তং ...
- ৪/৩ — স এবায়ং ময়া তেহদ্য ...
- ৪/৩৪ — তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন ...

পর্ব ২ঃ আত্মার বিজ্ঞান



পর্ব ২ ঃ আত্মার বিজ্ঞান

সমগ্র বিশ্ব এই ভ্রান্ত মোহে কর্মমুখর যে আমরা হচ্ছি এই দেহ। মানুষের সমগ্র কাজকর্মই তাদের জড় শরীরকে ঘিরে আবর্তিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রথম যে বিষয়টি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, তা হচ্ছে, "আমরা এই দেহ নই, আমরা চিন্ময় আত্মা।" এমনকি সামান্য একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব যে আমরা এই দেহ নই।

আত্মা প্রকৃতপক্ষে কি?

আত্মা হচ্ছে জীবনী শক্তির এক চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ যা প্রত্যেকটি দেহকে ক্রিয়াশীল করে, সেটিকে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে সক্ষম করে, ঠিক যেমন ইলেক্ট্রন কণার স্রোত তামার তারের মধ্যে প্রবাহিত হবার সময় শক্-এর সৃষ্টি করে। দেহকে একটি গাড়ীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, আর আত্মাকে তুলনা করা যায় গাড়ীরটির চালকের সংগে। আত্মা সেই জীবনের এক স্ফুলিঙ্গ, যার উপস্থিতির ফলে দেহকে জীবন্ত বলে মনে হয়, আর যখন আত্মা দেহটি ছেড়ে চলে যায়, তখন আমরা বলি যে লোকটি 'মৃত'।

আত্মার অস্তিত্বের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ

আমরা কেবল জড় পদার্থ ও শক্তির সংগে সমন্বিতভাবে 'বিজ্ঞান' শব্দটিকে বুঝতে অভ্যস্ত। কিন্তু আরো এক উচ্চতর মাত্রার বিজ্ঞান রয়েছে, যা আত্মা ও অ-জড়, চিন্ময় শক্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করে। আত্মা স্বরূপতঃ জড়াতীত, **চিন্ময়,** অপ্রাকৃত বস্তু। অন্য কথায়, আত্মা মূলগত ভাবেই জড় ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষণের পরিধির অতীত। জড়বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক কলাকৌশলগুলি আত্মার অস্তিত্ব 'প্রমাণ' করার জন্য অপর্যাপ্ত, অনুপযুক্ত, ঠিক যেমন কানের দ্বারা আলোর অনুভব লাভের চেষ্টা বৃথা। কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের নিয়মবিধির অনুসরণের মাধ্যমে একে এক উচ্চতর বাস্তবতা বলে উপলব্ধি করা যায়। চরমে, সমগ্র পারমার্থিক সত্যই প্রকাশিত ও 'প্রমাণিত' হয় আভ্যন্তরিকভাবে, অনুভবের মাধ্যমে। তবু আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধিতে নীচের বিষয়গুলি আমাদের সাহায্য করতে পারে।

১. সাধারণ জ্ঞান

যখন কেউ মারা যায়, আমরা বলি, "উনি চলে গেলেন।" এখন, কে চলে গেছেন? ব্যক্তিটির শরীর তো এখনো সেখানে শায়িত রয়েছে? সত্যটি হচ্ছে এই যে জীবনের উৎস আত্মা দেহটি ছেড়ে চলে গিয়েছে, এবং সেজন্য ব্যক্তিটিকে এখন বলা হচ্ছে মৃত।

২. স্বজ্ঞা-গত উপলব্ধি

আমাদের প্রত্যেকেরই একটি স্বজ্ঞাগত বোধ রয়েছে যে প্রকৃত সত্তা বা ব্যক্তি, 'আমি' দেহ, মন ও বুদ্ধি থেকে আলাদা, পৃথক। আমরা বলি "আমার হাত," "আমার মাথা" ইত্যাদি। এইভাবে আমরা দেহটির উপরের মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের ডগা পর্যন্ত 'আমার এটা, সেটা' বলে অভিহিত করতে পারি। এটি নির্দেশ করছে যে ঐসব বস্তুগুলি কোনো একজনের, কোনো মালিকের। চোখ, কান বা মস্তিষ্ক হচ্ছে কেবল কতকগুলি যন্ত্র, যেগুলির মাধ্যমে "আমরা" দেখি,

শুনি, অথবা চিন্তা করি। এইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি নিজেরা কোনো কিছু করতে পারে না। এমনকি একটি মৃতদেহেরও মস্তিষ্ক রয়েছে, কান রয়েছে, চোখ রয়েছে কিন্তু সেগুলি অকেজো, ক্রিয়াশক্তিরহিত। চালক, অর্থাৎ আত্মা এই দেহ-রূপ যানটিকে পরিত্যাগ করেছে বলেই এইসব যন্ত্রের কাজকর্ম সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে হয়ে গেছে।

৩. চেতনা (Consciousness)

জীবন্ত দেহে রয়েছে চেতনা। ঠিক যেমন সূর্য তার চতুর্দিকে তাপ ও আলোকরশ্মি বিকিরণ করে, তেমনি আত্মাও সমগ্র দেহে চেতনা পরিব্যাপ্ত করে — পায়ের ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত, সর্বত্র। দেহে পরিব্যাপ্ত এই চেতনাই আমাদেরকে চিন্তা, অনুভব বা চলাফেরা করতে সক্ষম করে। অতএব **চেতনা হচ্ছে আত্মার লক্ষণ**। চেতনার অস্তিত্বই একটি মৃত দেহের সঙ্গে জীবন্ত দেহের পার্থক্য সূচিত করে। এমন একটি যন্ত্র সহজেই তৈরী করা যেতে পারে, যেটির লেন্সে লাল আলো পড়া মাত্রই সেটি সাড়া দেয় ও তার থেকে এই তথ্য লেখা কাগজের টেপ বেরিয়ে আসে ঃ *"আমি লাল আলো দেখছি"*, কিন্তু এই যান্ত্রিক সাড়া বা প্রক্রিয়ার মধ্যে কি সত্যি সত্যি কোনো অনুভবের স্পন্দন আছে, যা একটি চেতন জীব উপলব্ধি করে—যেমন কোনো মানুষের প্রভাতের রক্তিম সূর্যোদয় দেখে অনুভব করে? **টমাস হাক্সলি** যেমন যথার্থই বলেছেন, *"এই বিশ্বে একটি তৃতীয় পদার্থ রয়েছে, অর্থাৎ চেতনা, যাকে আমি আদপেই কোনো জড় পদার্থ বা শক্তি বলে মনে করি না।"* এই চেতনার অস্তিত্ব আত্মার অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে।

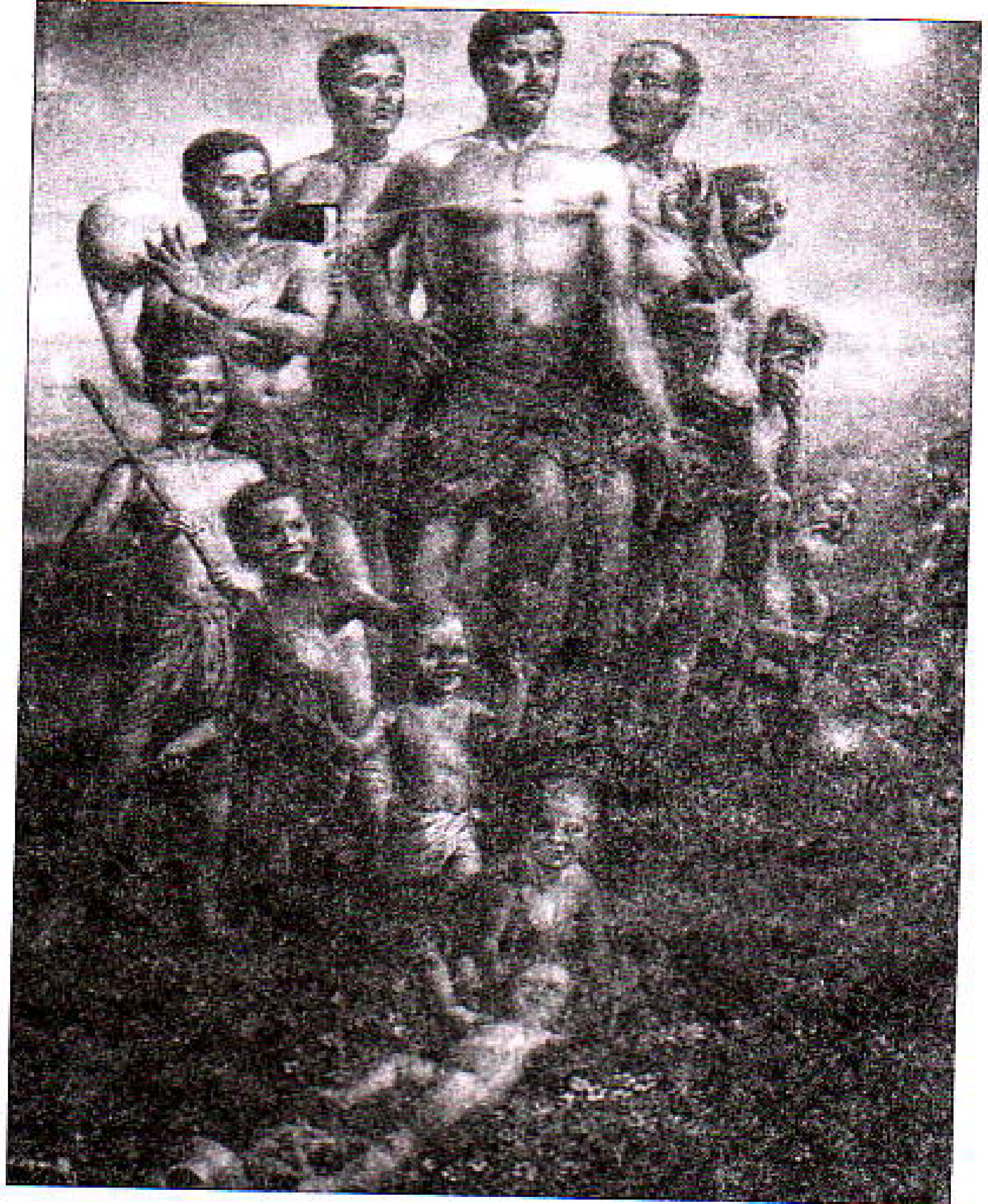
৪. আসন্ন-মৃত্যুর অভিজ্ঞতা (এন.ডি.ই — নিয়ার ডেথ-এক্সপিরিয়েন্স)

গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হয় যে মন জড়ীয় মস্তিষ্ক ও দেহ হতে স্বতন্ত্র। এন.ডি.ই-র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দেহাতিরিক্ত অভিজ্ঞতা বা ও.বি.ই (আউট-অব-বডি এক্সপিরিয়েন্স), যেখানে বিভিন্ন মানুষ তাদের নিজেদের দেহ ও অন্যান্য দেহসংক্রান্ত ঘটনাবলীর কথা জানাচ্ছেন যা দেহাতীত কোন পটভূমিতে থেকে পর্যবেক্ষণ করা — তাদের গুরুতর অসুস্থতা, দৈহিক যন্ত্রণা বা অপারেশনের সময়, যখন তাদের দেহ থাকে অজ্ঞান বা 'অচেতন'। এর আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একজন হৃদরোগী শল্য চিকিৎসার পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে অপারেশনকালীন সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিচ্ছেন, যেন বাইরে থেকে তিনি সেসব দেখেছেন। এইরকম অনুভবের সময় মেডিক্যাল অভিমত অনুসারে তার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যায় — যন্ত্রে ব্রেন-ওয়েভের রেখাচিত্র বা গ্রাফের রেকর্ড থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়, এবং ঐ রোগী তখন অজ্ঞান অবস্থায় থাকেন।

এন.ডি.ই নিয়ে পরিপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত, নিখুঁত গবেষণা করে বহু ব্যক্তি তাদের রিসার্চ-রিপোর্ট উপস্থাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, **এমরি ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুলের প্রফেসর ও কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর মাইকেল বি. স্যাবম্** প্রথমে এন.ডি.ই — সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সন্দিগ্ধ; কিন্তু ঐগুলির সত্যতা তদন্ত করে দেখার পর তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। কঠোর রিসার্চ-এর ভিত্তিতে ডক্টর স্যাবম লেখেন, *"মানুষের মস্তিষ্ক যদি এই দুটি মৌলিক উপাদান দিয়ে নির্মিত হয় — 'মন' ও 'মস্তিষ্ক', তাহলে বহু মানুষের মৃত্যুকালীন অভিজ্ঞতার ঘটনা কি অত্যন্ত অস্থায়ী সময়ের জন্য হলেও মন ও মস্তিষ্কের বিচ্ছিন্নতাকেই প্রদর্শন করে না? এই দেহাতীত অভিজ্ঞতার জবানবন্দী আসলে প্রচলিত ধর্মীয় তথ্যের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়। সেই মন, যা শরীরস্থ মস্তিষ্ক হতে বিমুক্ত হয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে — সেটি কি আসলে মূলগতভাবে আত্মা হতে পারে, চরমে জড় শরীরের বিনাশের পরেও যার অস্তিত্ব থাকে অব্যাহত, ঠিক যেমন কিছু কিছু ধর্মীয় মতবাদে বলা হয়ে থাকে? আমার মনে হচ্ছে যে এই সব এন.ডি.ই-র রিপোর্টগুলি যে চরম প্রশ্নটিকে তুলে ধরেছে, এ হচ্ছে সেই প্রশ্ন।"*

৫. পূর্বজন্মের স্মৃতি

বহু নিষ্ঠাবান গবেষক এই পূর্বজন্মের স্মৃতির উপর নিরপেক্ষ কঠোর ও নিয়মানুগভাবে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার সাইকিয়াট্রির অধ্যাপক ইয়ান স্টিভেনসন শিশুদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভবে কথিত তাদের পূর্বজন্মের স্মৃতির উপর ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। শিশুদের দেওয়া তাদের পূর্ব জন্মের জন্মস্থান, তাদের পূর্ব নাম ও চেহারা, তাদের স্বজন-বর্গের ও অন্যান্য পরিচিতদের নাম পুনর্জন্মের সত্যতাকেই স্ববহ সমর্থন করে। প্রফেসর স্টিভেনসন বহু সংখ্যক ঘটনার-বিবরণী একত্রিত করে সেগুলির সত্যতা যাচাইয়ে ব্রতী হন এবং সেই সাথে কোন প্রকার জালিয়াতি যা‌তে না হতে পারে সে ব্যাপারে তিনি কঠোর সতর্কতা গ্রহণ করেন। তাঁর গবেষণা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করে যে চেতন আত্মা একটি জড় শরীর থেকে অপর একটি জড় শরীরে গমন করতে পারে, দেহান্তরিত হতে পারে। স্পষ্টতঃই, যখন একটি দেহের মৃত্যু হয় তখন তার মস্তিষ্কের কোষগুলি নষ্ট হয়ে যায়, এবং কোন রকম বাহ্যিক প্রক্রিয়ার সাহায্যেই সেগুলিকে আর অন্য আরেকটি মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করতে পারে না, সেইজন্য কখনই কোন মৃত মানুষের স্মৃতি কোনো শিশুর মস্তিষ্কে শারীরিকভাবে সঞ্চারিত হবার বা করবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সেজন্য একটি শিশুর পূর্বজন্মের স্মৃতিচারণ এটিই প্রমাণ করে যে ঐ দেহস্থ ব্যক্তি আগের জন্মে ঐ পূর্বেকার দেহটি ব্যবহার করেছে, যার কিছু স্মৃতি সে অভিব্যক্ত করতে পারছে। অতএব সরলার্থ হচ্ছে এই যে চেতন আত্মা অবশ্যই এমন একটি সত্তা যা দেহস্থ মস্তিষ্ক থেকে পৃথক।



জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপলব্ধি

যদিও উপরোক্ত ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষজ প্রমাণগুলি দেহের মধ্যে এক চেতন সত্তার উপস্থিতিকে প্রতিপন্ন করে, তবুও এই ধরণের অনুমানমূলক পদ্ধতির নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যদি কেউ এইরকম প্রতীক্ষায় থাকেন যে বিজ্ঞান একদিন

আত্মার স্বরূপ এবং গুণ-বৈশিষ্ট সম্বন্ধে পরিপূর্ণ উপলব্ধি প্রদান করবে, তাহলে তাঁকে সম্ভবতঃ কোটি বছর অপেক্ষায় থাকতে হবে। বিজ্ঞান হচ্ছে একটি শিশুর অ্যাডভেঞ্চারের মতো, পক্ষান্তরে সনাতন ধর্ম হচ্ছে শিষ্য-পরম্পরায় প্রবাহিত ভগবানের শাশ্বত ও পূর্ণ বাণী। আমরা জীবন ও মৃত্যু কি সে-বিষয়ে কোন রকম মানসিক জল্পনা কল্পনা ছাড়াই শাস্ত্র থেকে সুস্পষ্ট তথ্য পেতে পারি।

স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন ঃ

অবিনাশী তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্বং ইদং ততম্।
বিনাশং অবিনাশ্যস্য ন কিঞ্চিৎ কর্তুমর্হসি॥

"সমগ্র শরীরে পরিব্যাপ্ত রয়েছে যে অক্ষয় আত্মা, জেনে রেখো তাকে কেউ বিনাশ করতে সক্ষম নয়।" (ভ.গী. — ২/১৭)

ভগবদ্গীতা অনুসারে, আপনি এই দেহ নন। আপনি মন নন। আপনি বুদ্ধিও নন, আপনি মিথ্যা অহঙ্কারও নন। আপনি এই জড় দেহের সমস্ত জড় পদার্থের অতীত বস্তু। **আপনি হচ্ছেন সেই চেতনা, সারা দেহে যা পরিব্যাপ্ত রয়েছে। আপনি হচ্ছেন চির অবিনাশী আত্মা।** এরপর শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কারং ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

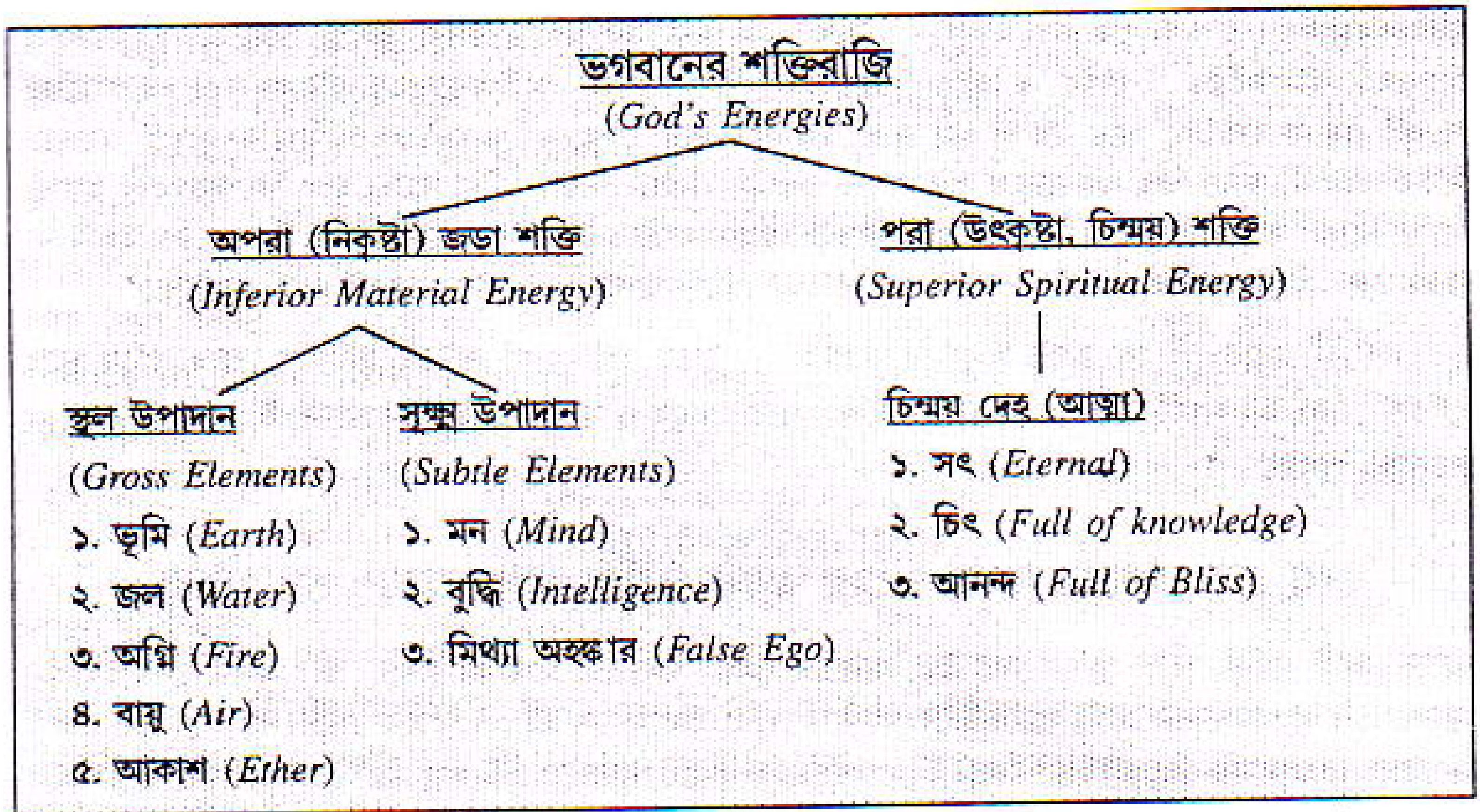
"ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার — এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত।" (ভ.গী. ৭/৪)

এই উপাদানগুলি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। স্থূল শরীর তৈরী হয়েছে উপরোক্ত প্রথম পাঁচটি উপাদান দিয়ে ঃ **'ভূমি'** বলতে বোঝায় সমস্ত কঠিন পদার্থকে। **জল** বলতে বোঝায় সমস্ত তরল পদার্থ। **অগ্নি** হচ্ছে আলোক ও তেজ (তাপ)। **বায়ু** হচ্ছে সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থ। **আকাশ** হচ্ছে শূন্যস্থান (ইথার) এবং শব্দ। স্থূল দেহে এই পাঁচটি পদার্থ রয়েছে।

সূক্ষ্ম শরীর তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান দ্বারা গঠিত : মন, বুদ্ধি ও মিথ্যা অহংকার (ভ্রান্ত 'আমি' বোধ)। প্রকৃত অহঙ্কার হচ্ছে এই উপলব্ধি ঃ **'আমি চিন্ময় আত্মা, কৃষ্ণের নিত্য দাস'**। মিথ্যা অহঙ্কার হচ্ছে মোহগ্রস্ত অবস্থায় এই রকম চিন্তা করা, **"আমি এই দেহ।"** সূক্ষ্ম দেহ ও স্থূল দেহ হচ্ছে চেতনার উপর জড়ীয় আবরণ। এইরকম সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহে বদ্ধ একটি জীবাত্মাকে বলা হয় 'বদ্ধ জীব'। যিনি এইরকম আবরণ থেকে মুক্ত এবং ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন, তাঁকে বলা হয় মুক্তাত্মা। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

"হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড়জগতকে ধারণ করে আছে।" (ভ. গী. ৭/৫)।



অনুৎকৃষ্টা অপরা শক্তি (জড় বস্তু) এবং উৎকৃষ্টা পরা শক্তি (আত্মা) উভয়ই পরমেশ্বর ভগবানের অধীন। আত্মাই হচ্ছে জীবন। শরীরটি সবসময়ই মৃত। ঠিক যেমন আপনি যদি হাতে দস্তানা পরেন এবং আঙুলগুলি সঞ্চালন করতে থাকেন, তাহলে দস্তানাকে জীবন্ত বলে মনে হতে পারে। ঠিক তেমনি আত্মা শরীরকে সঞ্চালন করে। শরীরটি সবসময়ই মৃত, এমনকি যখন আত্মা ঐ দেহের মধ্যে অবস্থান করতে থাকে তখনও দেহটি মৃত, কেননা শরীরটি কেবল কিছু মৃত অচেতন জড় পদার্থ দিয়ে তৈরী — মাটি, জল, আগুন, বাতাস, আকাশ এবং মন, বুদ্ধি ও মিথ্যা অহঙ্কার।

মানুষ কি কেবল একটি শক্তিশালী কমপিউটার/রোবট?

কমপিউটারের হার্ডওয়্যারটি কতকগুলি নির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (এই সব নির্দেশগুচ্ছের জন্য নানারকম ভাষাও রয়েছে, যেমন ফরট্রান, বেসিক, অথবা সি প্লাস প্লাস, ইত্যাদি)। এটি স্পষ্ট যে একটি কমপিউটারকে কার্যক্ষম হওয়ার জন্য অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান মানুষের দ্বারা নির্দেশিত (*প্রোগ্রাম্‌ড্*) হতে হয়। যে-ক্ষমতাই একটি কমপিউটারের থাকুক না কেন, তা সে সংখ্যার কচকচি, তথ্য সংরক্ষণ, বস্তু সনাক্তকরণ, বা স্বাভাবিক ভাষার প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি যাই হোক না কেন — তার সমস্ত ক্রিয়াক্ষমতাই একজন সংবেদনশীল চেতন মানুষ-এর দ্বারা প্রদত্ত। অন্য কথায়, যদি কমপিউটারের কার্যনির্দেশক বা প্রোগ্রামার কম্‌পিউটার-সিস্টেমকে দুই যোগ দুই = পাঁচ, এই অঙ্ক কষতে প্রোগ্রাম করে রাখে, তাহলে কমপিউটার ঐরকমই করবে। ঠিক সেই রকম দেখার ক্যামেরা-ব্যবস্থার সংগে সংযুক্ত কোনো কম্‌পিউটারকে যদি কোনো ঘনকাকৃতি (স্কয়ার) বস্তুকে গোল বলে সনাক্ত করার জন্য প্রোগ্রাম করা থাকে, তাহলে সেটি তাই-ই করবে। কমপিউটার নিজে থেকে কোনো কিছুই বুঝতে পারে না। প্রোগ্রাম করা না থাকলে শুধু কমপিউটারটি কেবল একটি বোবা যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

উদাহরণস্বরূপ, একটি নাটকাভিনয়ের কথা মনে করুন। একদল বিচারকমণ্ডলী নাটকটি দেখছেন, আর একটি ভিডিও ক্যামেরার দ্বারা পুরো নাট্যাভিনয়টি রেকর্ড করা হচ্ছে। বিচারক অভিনীত ঘটনাবলীকে রেকর্ড করতে তার চোখকে ব্যবহার করছেন, আর ভিডিও ক্যামেরাটি সমস্ত ঘটনাবলীকে রেকর্ড করছে লেন্সের মাধ্যমে, যা চোখেরই যান্ত্রিক রূপায়ণ বা

মেশিন-অ্যানালগ। ঐ দর্শন-যন্ত্র এবং মানুষ — উভয় পর্যবেক্ষক তথ্য-উপাত্ত রেকর্ড করছে, কিন্তু মানুষ-পর্যবেক্ষক পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলীকে "উপলব্ধি"-ও করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিচারকমণ্ডলী একটি আবেগময় নাটকের সমগ্র আবেগমথিত দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করলেন, তাঁরা নাটকে গর্ব, দুঃখ, প্রকাশিত হতে দেখলেন। অপরদিকে ভিডিও ক্যামেরাটি আবেগ-অনুভবহীনভাবে কেবল কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন ও শব্দাবলী রেকর্ড করল। নাটক সমাপ্ত হলে বিচারকমণ্ডলী তাঁদের চোখের সামনে দৃশ্যায়িত দৃশ্য-চিত্রের ভিত্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়কারীকে নিরূপণ করলেন। কিন্তু ভিডিও ক্যামেরাটি কি ঐরকম কোন সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম — যদিও সে নাটকের প্রতিটি দৃশ্যই অভ্রান্তভাবে রেকর্ড করে রেখেছে?'

পার্থক্যটি হচ্ছে এই যে, যদিও মানুষ ও ক্যামেরা — উভয় পর্যবেক্ষকই নাটকটি নিরীক্ষণ করছে, মানুষ হচ্ছে "চেতন", কিন্তু ক্যামেরাটি সম্পূর্ণরূপে চেতনাহীন। সুতরাং মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে প্রধান পার্থক্যটি হচ্ছে চেতনা — চেতনাগত পার্থক্য।

দেহ এবং আত্মার সম্বন্ধ ঃ দেহ একটি গাড়ীর মতো; আত্মা তার চালক

দেহকে একটি গাড়ীর সংগে তুলনা করা হয়, আত্মাকে তুলনা করা হয় চালকের সংগে। যদি একটি বোধশক্তিহীন কুকুরের ছানা রাস্তায় কোন একটি বড় গাড়ীকে আসতে দেখে, তাহলে সে এই ভেবে ভয় পেতে পারে যে ওটি একটি চার চাকায় চলমান বড় কোনো জন্তু। কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারে যে ওটি জন্তু নয় — একটি মৃত, ব্যক্তিত্বহীন গাড়ী যা একজন চেতন চালকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। গাড়ীতে রাস্তা দেখার জন্য হেডলাইট রয়েছে, ঠিক যেমন আপনি আপনার চোখের সাহায্যে দেখেন। গাড়ী হর্ণের সাহায্যে আওয়াজ করে, আপনি মুখের সাহায্যে। গাড়ীর চারটি চাকা রয়েছে, আপনার দেহটির দুটি হাত ও দুটি পা রয়েছে। গাড়ীটি এক জায়গা হতে অন্যত্র চলাফেরা করে, আপনিও সেটাই করেন। কিন্তু গাড়ীটি থেকে চালক নেমে যাওয়ার পর ঐ গাড়ীটি এমনকি দশ লক্ষ বছরেও এক ইঞ্চি চলতে পারে না। ঠিক তেমনি, যখন একজন মানুষ মারা যায়, শরীরটি তখন পুরোপুরিই ঐ চালক-বিহীন গাড়ীটির মতোই — নিশ্চল, অনড়। সুতরাং আমরা যে দেহটিকে দেখি তা সবসময়ই মৃত। আত্মার উপস্থিতির জন্যই দেহকে জীবন্ত বলে মনে হয়। আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করে, তখন দেহটি সম্পূর্ণ চলচ্ছক্তিহীন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

একবার একজন বিজ্ঞানী একটি মৃতদেহ নিয়ে সেই দেহটির সমস্ত রাসায়নিক পদার্থকে পৃথক করে তার বাজার মূল্য যাচাই করে রিপোর্ট করে দিলেন যে ঐ দেহটির দাম দাঁড়াচ্ছে ১১০ টাকা (যদি সেটিকে বাজারে বিক্রী করা হয়)! তা, আপনি কি এমন মনে করেন যে আপনার মূল্য ১১০ টাকা? কিন্তু যখন একজন জীবিত ব্যক্তি তাঁর দেহের ছোট্ট একটি আঙুল হারায়, কিংবা তাঁর কিডনীটিকে বদলাতে হয়, তাহলে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে থাকেন। জীবিত দেহের মধ্যে এমন কোন পদার্থ রয়েছে যা এই দেহকে এত মূল্যবান করে তোলে? আর একটি মৃতদেহে কি অনুপস্থিত যা ঐ দেহকে মূল্যহীন জঞ্জালে পরিণত করে? উত্তর হচ্ছে ঃ আত্মা।

আত্মা (জীবনী শক্তি), উদ্ভিদ, পশুপাখী এবং মানুষ সকলের মধ্যেই রয়েছে। যেখানেই জীবন রয়েছে, সেখানে অবশ্যই আত্মা রয়েছে, কেননা আত্মাই হচ্ছে জীবন। অ্যামিবাই হোক, হাতি হোক, অথবা একটি মানুষ হোক — সব জীবিত দেহের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে আত্মা।

আধুনিক যুগ ঃ খাঁচা-পরিচর্যার সংস্কৃতি

শরীরকে একটি খাঁচার সংঙ্গেও তুলনা করা হয়, আর খাঁচার টিয়া পাখীকে তুলনা করা হয় শরীরস্থ আত্মার সংগে। ধরুন কেউ খাঁচায় এইভাবে একটি পাখী পুষে কেবল খাঁচাটিকে সুন্দরভাবে তদ্বির করছে — যেমন বিশেষ ডিজাইনের সুন্দর সোনার খাঁচায় পাখীটিকে রেখে প্রতিদিন খাঁচাটিকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা, খাঁচাটিকে ভালভাবে ঘষে-মেজে

পালিশ করে ঝকঝকে করা ইত্যাদি। সকলে খাঁচাটিকে দেখে বিমুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করে, এবং তাতে উৎসাহিত হয়ে সে আরো ভালভাবে খাঁচাটির যত্ন নিতে থাকে। কিন্তু এসব করতে গিয়ে সে পাখীটির কথা বেমালুম ভুলে যায়। পাখীটিকে দেয় না খাদ্য জল। ঠিক তেমনি, বর্তমান যুগে, আধুনিক সভ্যতায় প্রত্যেকে দেহের জন্য সমস্ত রকম আরাম স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসিতার ব্যবস্থা করার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত, কিন্তু আত্মার প্রয়োজনের দিকে কেউ দৃষ্টিপাত করছে না। সেজন্য প্রত্যেককেই পারমার্থিক ভাবে 'অনশনে' ভুগছে। প্রত্যেকেই অন্তরে বিষণ্ণ, নিরানন্দ, এবং প্রত্যেকেই অজ্ঞান-তমসায় আবৃত হয়ে দুর্দশা ভোগ করছে। দেহ-খাঁচাটি যে অচিরেই ছাড়তে হবে, সে সম্বন্ধে অধিকাংশেরই কোনো জ্ঞান নেই, আর সে শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে না কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে, বিশ্বজুড়ে এই দেহতন্ত্রিরের, খাঁচাটি-পালিশের গভীরতাহীন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

আত্মা-সম্পর্কিত জ্ঞান

আত্মা অবিনশ্বর

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, *নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥* অর্থাৎ "আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, অথবা হাওয়াতে শুকানোও যায় না।" (ভ. গী. ২/২৩)

আত্মা একজন ব্যক্তি

প্রত্যেক আত্মাই পৃথক পৃথক চেতনা-সমন্বিত এক একজন ব্যক্তি। আপনি আপনার দেহ, মন, বুদ্ধি ও মিথ্যা অহঙ্কার সম্বন্ধে সচেতন। আপনার মাথাব্যথা আমি অনুভব করতে পারি না, আবার আমি কি চিন্তা করছি আপনি তা জানেন না। কিন্তু ভগবান সৃষ্টির প্রত্যেকটি কণিকা সম্বন্ধে সচেতন; *ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।/ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম॥* "এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি এবং এই সমস্ত রাজারা ছিল না; এবং ভবিষ্যতেও কখনো আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না" (ভ. গী. ২/২২)। "*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত সনাতন* ...'; 'এই জড়জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ ..." (ভ. গী. ১৫/৭)।

আত্মার রূপ রয়েছে

আত্মা 'নিরাকার নির্গুণ জ্যোতি' বা 'শূন্য' কিছু নয়, কিছু মানুষ যেমন ভুল করে ভেবে থাকেন। আত্মা হচ্ছে এক সুন্দর ব্যক্তিত্ব, যার দেহ সৎ-চিৎ-আনন্দময়। আত্মা কেবল শক্তি মাত্র নয়, আত্মা একজন পূর্ণচেতন ব্যক্তি।

আত্মা শাশ্বত

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন : *ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন: ভূয়ঃ।/অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরানো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥* "আত্মার কখনো জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না। অথবা পুনঃপুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না; তিনি জন্মরহিত শাশ্বত, নিত্য এবং নবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনো বিনষ্ট হয় না" (ভ.গী. ২/২০)।

আত্মার একটি শরীর রয়েছে, যা সৎ (নিত্য, শাশ্বত), চিৎ (জ্ঞান), আনন্দময়

আত্মা এই জড়জগতে এসেছে ভগবৎ-ধাম থেকে, আর এজন্য ভগবদ্ধামে ভগবানের সংগে প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধিত হবার উপযোগী আত্মার একটি শাশ্বত, জ্ঞানময় ও আনন্দময় শরীর রয়েছে, যা অ-জড়, চিন্ময় — অর্থাৎ পূর্ণচেতন। কিন্তু

আত্মা যখন একজন স্বাধীন ভোক্তা হতে আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তাকে জড় জগতে প্রেরণ করা হয়, যেখানে তাকে একটি জড় শরীরে আবদ্ধ হতে হয়। এটা হচ্ছে ঠিক একটি টিয়া পাখীর (আত্মা) খাঁচায় (জড় দেহে) আবদ্ধ হওয়ার মতো। কেন আমরা দুর্দশা ভোগ করি? কারণ সচ্চিদানন্দময় আত্মা এমন একটি দেহে আবদ্ধ হয়েছে যা অসৎ-অচিৎ-নিরানন্দ, সুতরাং চিদ্‌রূপময় আত্মার ক্ষণস্থায়ী জরা-ব্যাধিগ্রস্ত জড়শরীরে অবস্থান অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আর সেজন্যই আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হয় — আমাদের যাবতীয় দুর্দশার এটিই মূল কারণ।

আত্মার অবস্থান হৃদয়-প্রদেশে

আত্মা সারা দেহকে চেতনা দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে, ঠিক যেমন একটি বাতি সারা ঘরকে আলোয় ভরে দেয়। সারা ঘরকে যে বাতিটি আলোকোজ্জ্বল করে তুলছে, সেই বাতিটি ঘরের একটি কোণে থাকতে পারে। ঠিক তেমনি আত্মা হৃদয়-প্রদেশে (হৃৎ-পিণ্ডে) অবস্থান করেও সারা দেহে চেতনা পরিব্যাপ্ত করে। **হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের সময় আত্মাকে দেহ থেকে সরানো যায় না, কেননা আত্মা চিন্ময় (অ-জড়)।** দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন একটি গাড়ী থেকে স্টেপনী কিংবা রেডিয়েটর সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন ঐ গাড়ীতে বসে থাকা চালকের কিছুই হয় না। ঠিক তেমনি একটি-হৃৎপিণ্ড (যে কেবল রেডিয়েটরের মতো একটি রক্ত-সঞ্চালনকারি যন্ত্র) অন্য আরেকটির দ্বারা প্রতিস্থাপন করলেও শরীরস্থ আত্মা তাতে প্রভাবিত হয় না।

আত্মা দেহ-পরিবর্তন করে

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরানি।/তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥' **"মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন"** (ভ. গী. — ২/২২)। *'দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।/তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥'* **"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনো এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না** (ভ.গী.. — ২/১৩)।"

আত্মার আয়তন

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এবং ***শ্রীমদ্ভাগবতে*** বীজ-রূপে জড়দেহে বিরাজিত আত্মার আয়তন বর্ণিত হয়েছে। যেমন ***শ্বেতাশ্বতর উপ***-৫/৮-এ বলা হয়েছে, ***'বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥'*** **"কেশাগ্রকে শতভাগে ভাগ করলে তার যে আয়তন হয়, আত্মার আয়তনও ততখানি।'** এই হচ্ছে আত্মার বীজ-রূপী আয়তন। আত্মা জড়-ব্রহ্মাণ্ডে নানা শরীরে ভ্রমণকালে তার এই আয়তন থাকে। কিন্তু চিন্ময় জগতে ভগবদ্ধামে আত্মার একটি আদি, অপরূপ-সুন্দর সচ্চিদানন্দময় অর্থাৎ নিত্য, আনন্দময় ও জ্ঞানময় দেহ রয়েছে, যাকে বলা হয় আত্মার 'স্বরূপ' (আত্মার আদি নিত্য-সনাতন স্বরূপদেহ); পক্ষান্তরে জড় জগতে বদ্ধাবস্থায় আত্মার জড় শরীরকে বলা হয় **বিরূপ** বা বিকৃত জড়-রূপ)। তার নিত্য চিন্ময় স্বরূপে প্রত্যেক আত্মার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংগে নিম্নোক্ত পাঁচটি রসের যেকোন একটিতে এক শাশ্বত মধুর সম্পর্ক রয়েছে ঃ শান্ত রস, দাস্য রস, সখ্য রস, বাৎসল্য রস এবং মাধুর্য-(দাম্পত্য) রস।

আত্মা অচিন্ত্য

চুলের অগ্রভাগের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ এতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যে এমনকি বর্তমানের সবচেয়ে শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপেও তা দেখা অসম্ভব। কিন্তু আমরা যদি এমনকি এই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের থেকেও অনেক শক্তিশালী

কোনো অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারেও সক্ষম হই, এবং তার মধ্য দিয়ে আত্মাকে দেখার চেষ্টা করি, তবুও আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। আমরা এমনকি আমাদের চিন্তাকেও দর্শন করতে পারি না, তা পরিমাপ করতে পারি না। এমনকি মনও — যা হচ্ছে জড়ের সূক্ষ্ম রূপ — আমাদের কাছে অদৃশ্য, দৃষ্টির অগোচর, অব্যক্ত। সংজ্ঞানুযায়ী আত্মা মনেরও অতীত। এটি কেবল অব্যক্তই নয়, আত্মা অচিন্ত্য, অচিন্তনীয়। আপনি এমনকি এর-চিন্তাও করতে পারেন না ঃ *অব্যক্তোঽয়ম্ অচিন্ত্যোঽয়ম্ অবিকার্যোঽয়মুচ্যতে,* "এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী বলে শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে।" (ভ. গী. — ২/২৫)।

দেহ ও আত্মার পার্থক্য

দেহ (Body)	আত্মা (Soul)
১. অচেতন (*Unconscious*);	১ চেতন (*Conscious*), দেহে পরিব্যাপ্ত চেতনার উৎস;
২. জড়, আট রকম জড় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত;	২. জড় উপাদানশূন্য, চিন্ময়, চিৎকণা (তিন রকম চিদ্বিভাবের অভিভাজ্য রূপ);
৩. সদা পরিবর্তনশীল; প্রতিদিনই দেহের রূপান্তর হয় (বৃদ্ধি-ক্ষয় প্রভৃতি ৬টি পরিবর্তনের অধীন);	৩. চির অ-পরিবর্তনীয়, অব্যয়; 'অবিকারী', বৃদ্ধি-ক্ষয় প্রভৃতি পরিবর্তনহীন;
৪. নশ্বর, বিনাশশীল, অনিত্য;	৪. অবিনশ্বর, নিত্য, শাশ্বত;
৫. ভগবানের বহিরঙ্গা, অপরা জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি;	৫. ভগবানের অবিচ্ছেদ্য-অংশ, তটস্থা শক্তি, পরা প্রকৃতি-সম্ভূত;
৬. স্থূল, পরিমাপযোগ্য;	৬. সূক্ষ্ম, অপরিমেয়;
৭. ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবযোগ্য;	৭. জড়-ইন্দ্রিয়ের অগোচর;
৮. অস্ত্রাদির দ্বারা বিনাশযোগ্য;	৮. অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য;
৯. অজ্ঞান বস্তুপিণ্ড;	৯. জ্ঞানময়; সকল গুণাবলীর আধার;
১০. ব্যক্তিত্বহীন যন্ত্র;	১০. মূল ব্যক্তি, ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র;
১১. দুঃখ-ক্লেশের আধার নিরানন্দময়;	১১. আনন্দময়;
১২. পরিচালিত যন্ত্র (*Car, Instrument*);	১২. পরিচালক (*Driver, user*);
১৩. অনুভব-সামর্থ্যহীন;	১৩. অনুভূতিশীল; অনুভবের কেন্দ্র;
১৪. ইচ্ছা-দ্বেষ-বাসনা-সক্রিয়তা শূন্য;	১৪. ইচ্ছা-দ্বেষ-মান-অভিমান-বাসনা-সক্রিয়তা যুক্ত;
১৫. মিথ্যা অহঙ্কার নামক সূক্ষ্ম উপাদান সমন্বিত;	১৫. 'মিথ্যা-অহঙ্কার বিহীন; প্রকৃত আমি (*Real person*);
১৬. জড় ইন্দ্রিয়যুক্ত;	১৬. চিন্ময় ইন্দ্রিয়যুক্ত;
১৭. মন, বুদ্ধি জড়;	১৭. মন, বুদ্ধি চিন্ময়;
১৮. অস্থায়ী পোশাক, 'বিরূপ'।	১৮. শাশ্বত ব্যক্তি, 'স্বরূপ'।

আমি কি ভগবান?

ভারতবর্ষে বর্তমানে অদ্বৈতবাদ, অর্থাৎ "আমি ভগবান। তুমি ভগবান। প্রত্যেকেই ভগবান" — এই দর্শন খুবই প্রচলিত। এই ধরণের দর্শন সেই সব বদ্ধ জীবাত্মাদের অন্তরে অসীম সন্তোষ প্রদান করে থাকে, যাদের ভোক্তা ও নিয়ন্তা হবার বাসনা প্রবল। বদ্ধ জীবাত্মা এমন ভোক্তা ও নিয়ন্তা হতে চায়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কেউ কি আছে

যে নিয়ন্ত্রণাধীন, নিয়ন্ত্রিত নয়? সংজ্ঞানুসারে ভগবান পরম স্বরাট, স্বাধীন স্বতন্ত্র পুরুষ এবং তিনি কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নন। তিনিই পরম নিয়ন্তা। জীব অবিনাশী, শাশ্বত, অব্যক্ত এবং অচিন্ত্য, কিন্তু তবুও সে কি ভগবান হতে পারে? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর আপনার পারমার্থিক জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ভগবদ্গীতা এ-বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে জীব কখনো ভগবান নয়, কখনো সে ভগবান হতেও পারবে না; সমস্ত জীবসত্তা ও ভগবান নিত্য স্বতন্ত্র, যদিও উভয়ে চিন্ময়, সেজন্য গুণগতভাবে উভয়েই এক। জীব ক্ষুদ্রচিদ্ অণু, তাই সূর্যের কিরণকণা যেমন সূর্যের মতো ধর্ম বিশিষ্ট হলেও স্বয়ং সূর্য নয়, তেমনি চিৎ-কণাজীব ভগবানের মতো চিদ্ধর্ম বিশিষ্ট হলেও **পরিমাণগতভাবে** অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ভগবদ্গীতায় এটাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে **এমনকি মোক্ষ বা মুক্তিলাভের পরও জীব আত্মস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ভগবানে একীভূত হয়ে যায় না; প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বই শাশ্বত। ভগবদ্গীতায়** বলা হয়েছে (১৫/১৬) ঃ

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥

"ক্ষর এবং অক্ষর দুই প্রকার জীব রয়েছে। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই ক্ষর, এবং চিজ্জগতে প্রতিটি জীবই অক্ষর।"

এই জগতে আমরা যারা আমাদের **শাশ্বত** চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে অ-সচেতন, তারা **ক্ষর** (পরিবর্তনশীল দেহ-সম্পন্ন জীব)। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য একটি পিঁপড়ে পর্যন্ত যে জীব-সত্তাই জড়ের সংস্পর্শে এসেছে, জড়-পদার্থের আবরণে তৈরী দেহাবয়ব ধারণ করেছে, সে ক্ষর। কিন্তু চিন্ময় জগতে দেহটি জড় পদার্থের তৈরী নয়, সেজন্য সেই দেহে কোনো পরিবর্তন হয় না; ঐ চিদ্-দেহ চির-শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়। ঐ দেহে কখনো জরা-ব্যাধি-বার্ধক্য আসে না, সেই দেহের জন্ম-মৃত্যুও নেই। যে সব জীবসত্তা চিন্ময় জগতে পরম পুরুষ ভগবানের সংগে আনন্দবিলাসরত, তাঁরা সকলেই **অক্ষর** (অপরিবর্তনীয়), তাঁরা অনন্তকালের জন্য অপরিবর্তনীয় **শাশ্বত** আনন্দময় স্বরূপ-বিশিষ্ট।

উত্তম পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

"এই উভয় পুরুষ থেকে ভিন্ন, পুরুষোত্তম, পরমাত্মা রূপে সমগ্র বিশ্বে প্রবেশ করে তাদের পালন করেন" (ভ. গী. ১৫/১৭)। এখানে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে অগণিত জীবসত্তা-সমূহের মধ্যে কিছু জীব বদ্ধ, এবং অন্য সমস্ত জীব মুক্ত ; এবং এই এই বদ্ধ ও মুক্ত (ক্ষর ও অক্ষর) উভয় জীবসত্তার মধ্যে পরম পুরুষোত্তম হচ্ছেন পরমাত্মা, ভগবান।

পরমাত্মা ঃ জীবাত্মার বন্ধু

যখন জীবাত্মা এই জড় জগতে পতিত হয়, তখন তাকে নানা দেহে দেহান্তরিত করা, তার তত্ত্বাবধান করা এবং তাকে পথনির্দেশ দানের জন্য পরমপুরুষ ভগবানের এক **প্রকাশ** জীবাত্মার সঙ্গী হন। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকাশ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন — *ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি* — ভ.গী. ১৮/৬১), এবং প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যেও তিনি প্রবেশ করেন (*পরমাণুচয়ান্তরস্থং*, ব্রহ্মসংহিতা — ৩৫)। তাঁকে বলা হয় **পরমাত্মা**।

দুই প্রকারের আত্মা রয়েছে ঃ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিৎ-কণ (অণু-আত্মা, জীবাত্মা), এবং পরম আত্মা (বিভু-আত্মা,

পরমাত্মা)। জীবাত্মার অর্থ একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, পরমাত্মার অর্থ একজন পরম ব্যক্তিসত্তা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রয়েছে, উভয়েই ব্যক্তিত্ব সমন্বিত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, জীবাত্মা কেবল একটি বিশেষ দেহে আবদ্ধ, পক্ষান্তরে পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজমান। *কঠোপনিষদেও* একথা সমর্থিত হয়েছে ঃ

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিত গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥

"পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েই বৃক্ষসদৃশ জীবদেহের হৃদয়ে অবস্থিত। যিনি সব রকম জড় বাসনা এবং সব রকমের শোক থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন, তিনিই কেবল ভগবানের কৃপার ফলে আত্মার মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন।"

"পরমাত্মার কৃপার ফলেই অণু আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়। বন্ধু যেমন বন্ধুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে, পরমাত্মাও তেমনি অণু আত্মার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। *মুণ্ডকোপনিষদ্* ও *শ্বেতাশ্বেতর* উপনিষদে আত্মা এবং পরমাত্মাকে একই গাছে বসে থাকা দুটি পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি পাখী (জীবাত্মা) সেই গাছের ফল, ফল ভক্ষন করছে, অপর পাখীটি (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁর বন্ধুকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। এই দুটি পাখী গুণগতভাবে যদিও এক, (উভয়েই সচ্চিদানন্দময়, অ-জড়), তবুও তাদের একজন (জীবাত্মা) সেই জড়জগৎ-রূপ গাছের ফলের আকর্ষণে আবদ্ধ। কখনো সে তিক্ত ফল আস্বাদন করে শোক করছে, কখনো বা সে মিষ্টি ফল খেয়ে আনন্দ করছে। পক্ষান্তরে অন্যজন তার সখাটির কার্যকলাপ কেবল পর্যবেক্ষণ করে চলেছে।

অর্জুন হচ্ছেন ফল-আহারে রত পাখী, আর পর্যবেক্ষণরত পাখীটি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যদিও তাঁরা একে অপরের বন্ধু, তবুও তাঁদের একজন হচ্ছেন প্রভু এবং অন্যজন হচ্ছেন ভৃত্য। পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্কের কথা ভুলে যাবার ফলেই জীবাত্মা-রূপ পাখি এক গাছ থেকে অন্য গাছে, অর্থাৎ এক দেহ থেকে আরেক দেহে ঘুরে বেড়ায়। এই জড়দেহ-রূপ বৃক্ষে জীবাত্মা তার কর্মের ফল-স্বরূপ নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, কিন্তু যে মুহূর্তে সে পরমাত্মার নিত্য দাসত্ব বরণ করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে — সেই মুহূর্তে সে জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং তার সবরকম দুঃখ-কষ্টের নিবৃত্তি ঘটে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্জুনের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আমরা এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারি। *কঠোপনিষদ* এবং *শ্বেতাশ্বতর* উপনিষদে আছে—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

'দুটি পাখী একই গাছে বসে, কিন্তু যে পাখাটি ফল-আহারে রত, সে তার কর্মের ফলস্বরূপ সর্বদাই শোক, আশঙ্কা এবং উদ্বেগের দ্বারা মুহ্যমান। কিন্তু যদি সে একবার তার নিত্যকালের বন্ধু অপর পাখীটির দিকে ফিরে তাকায়, তবে তার সমস্ত শোকের অবসান হয়, কারণ তার বন্ধু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি সমগ্র ঐশ্বর্যের দ্বারা মহিমান্বিত।'

পদ্মপুরাণ থেকে আমরা জানতে পারি যে এই ব্রহ্মাণ্ডে মোট ৮৪ লক্ষ ধরণের জীব-শরীর বা প্রজাতি রয়েছে এদের মধ্যে ৯ লক্ষ প্রজাতি হচ্ছে জলচর জীব, ২০ লক্ষ উদ্ভিদ প্রজাতি, কীট-পতঙ্গ হচ্ছে ১১ লক্ষ প্রজাতির, পাখী-প্রজাতি হচ্ছে ১১ লক্ষ, পশু ৩ লক্ষ প্রজাতির, এবং মানুষ ৪ লক্ষ প্রজাতির। জীবসত্তা নানা প্রজাতির বিভিন্ন রকম জীব-শরীরে অবিরাম দেহান্তরিত হয়ে চলে, কিন্তু পরমাত্ম একান্ত সখার মতোই সর্বদাই তার সঙ্গে থাকেন; সেই জীবসত্তা মানবদেহে বা একটি কীট দেহে — যে দেহেই অবস্থান করুক না কেন, ভগবান সর্বক্ষণ তার সঙ্গে থাকেন।

চেতনা এবং পরম চেতনা

জীবাত্মা এবং **পরমাত্মা** সম্পর্কে অত্যন্ত সুসংবদ্ধভাবে আমরা আমাদের জ্ঞান বিকশিত করব, কিন্তু সেই সাথে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই আত্মা-পরমাত্মা-বিষয়ে যে ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে, সে সম্বন্ধেও অবহিত থাকাটা প্রয়োজন। **'চেতনা'** শব্দটির দ্বারা বোঝায় জীবাত্মা, জীবসত্তা, আর **'পরমচেতন'** শব্দে পরমাত্মাকে বোঝায়। আজকাল কিছু ব্যক্তি একটা নব-উদ্ভাবিত মতবাদ প্রচার করছে। তারা বলে যে আত্মা হচ্ছে এখন এক চেতন ব্যক্তি-সত্তা, কিন্তু মৃত্যুর পর আপনাকে কেবল সেই মহাজাগতিক চেতনা, সেই সর্বব্যাপী পরম চেতনের সংগে একীভূত হতে হবে। কিছু কল্পবিদ তত্ত্ববিশারদ এমনকি একথাও বলে, *"আসলে আপনিই সেই মহাজাগতিক চেতনা। আপনাকে কেবল এটি উপলব্ধি করতে হবে, আর কিছু নয়।"* এইরকম কিছু মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আপনাকে বোঝাতেই থাকবে যে আপনি হচ্ছেন ভগবান, আর আপনি কেবল এটি ভুলে গিয়েছেন।

'আমি ভগবান, তুমিও ভগবান, বহুরূপে সকলেই ভগবান, তাই আর ভগবানের আরাধনা বা অনুসন্ধান করার কোন দরকার নেই', এই ধরণের কল্পিত মতবাদ আজকাল খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। **যেহেতু এই ধরণের দর্শন ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ দাবী করে না, এবং প্রত্যেককেই তাদের ইন্দ্রিয়-ভোগবাসনা চরিতার্থ করার অনুমোদন দেয়, এজন্য কিছু মানষের কাছে এই মত খুবই পছন্দের। এই ধরণের দর্শন ভগবানকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক করে তুলে তাকে দূরে বিসর্জন দেয়, মানুষের জীবন থেকে সমস্ত ধর্মাচার ও নৈতিকতাকে মুছে দেয় (যেমন পশু হত্যা করে ঐ পশুদের মাংসে গলাধঃকরণে উস্কানি দান), এবং যেটি সবচেয়ে গুরুতর, তা হচ্ছে জীবসত্তা-সমূহের পারমার্থিক জীবন ধ্বংস করে দেয় ও এভাবে চিজ্জগতে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে সর্বসৌন্দর্যের আকর সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবানের সংগে তার মিলিত হবার সুযোগকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে তার মূল্যবান ও সুদুর্লভ মানব জীবনকে এক গভীর ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে।** যদি কেউ এই রকম পারমার্থিক ভিত্তিহীন স্বকল্পিত মতবাদ নিয়ে আমাদের কাছে বিতর্কের জন্য আসে, আমরা তাদের কাছে শাস্ত্রযুক্তি সহকারে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হব।

শ্রীকৃষ্ণ ও জীবসত্তার মধ্যে পার্থক্য

- জীবসত্তা অণু-সদৃশ ক্ষুদ্র, কিন্তু কৃষ্ণ অসীম ঃ

বৈদিক শাস্ত্রে, যেমন ***কঠোপনিষদে*** ও ***শ্বেতাশ্বতর*** উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বদ্ধ ও মুক্ত সকল জীবসত্তার মধ্যে একজন পরম চেতন ব্যক্তি রয়েছেন, পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যিনি সকল জীবকে পালন করেন এবং তিনি একাকী সেই অনন্ত-সংখ্যক জীবসত্তার ভিন্ন ভিন্ন বাসনা পুরণ করার সুযোগ প্রদান করেন ঃ *"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্"।* শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, এবং জীবসত্তা সমূহও নিত্য। শ্রীকৃষ্ণের যেমন একটি সচ্চিদানন্দময় দেহ রয়েছে, তেমনি সমস্ত জীবসত্তার প্রত্যেকেরই এক একটি সচ্চিদানন্দময় দেহ রয়েছে। কিন্তু জীব ও শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্য হচ্ছে, কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান, প্রভু ও সকল জীবসত্তার পরম নিয়ন্তা ঈশ্বর। আর জীব নিত্যকালের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দাস, সেবক।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, জীব শ্রীকৃষ্ণের সংগে এক কেবল *গুণগতভাবে* (উভয়ই সৎ-চিৎ-আনন্দময়), কিন্তু *পরিমাণগতভাবে* জীব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিদ্ অণু, আর শ্রীকৃষ্ণ অসীম, বিভু। একে বলা হয় **'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব'**, যার অর্থ জীব ও শ্রীকৃষ্ণ 'যুগপৎ ভিন্ন আবার অভিন্ন, যা অচিন্তনীয়'। এই অভিন্নতা বা অভেদত্ব হচ্ছে

শ্রীকৃষ্ণ ও জীবসত্তার গুণগত একত্ব, আর ভিন্নতা, ভেদত্ব হচ্ছে পরিমাণগত (যেমন সূর্য ও তার কিরণ কণা — উভয়ের গুণগত ধর্ম এক, কিন্তু পরিমাণগতভাবে অসীম প্রভেদ)।

● জীবসত্তা তার নিজ দেহটির জ্ঞাতা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দেহ সমূহের জ্ঞাতা

দেহ ও দেহের জ্ঞাতা — বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন তিনটি মুখ্য বিষয় পাই ঃ ভগবান, জীব-সত্তা, এবং জড় পদার্থ। প্রত্যেক জীব-শরীরে দুটি আত্মা রয়েছে ঃ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। আর পরমাত্মা যেহেতু পরম পুরুষ ভগবানেরই অংশ-প্রকাশ, সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "আমিও জ্ঞাতা, আমি পরমাত্মারূপে প্রত্যেক জীবদেহে অবস্থান করি" (ভ. গী. — ১৩/২-৩, ১৫/১৫)।

আত্মার জড় শরীরকে বলা হয় '**ক্ষেত্র**', আর ঐ শরীরটিকে যিনি জানেন, সেই আত্মাকে বলা হয় '**ক্ষেত্রজ্ঞ**'। একজন জীবাত্মা হিসাবে আমি আমার শরীরটি সম্বন্ধে, জ্ঞাত, অবগত। ঠিক তেমনি আপনি (জীবাত্মা) আপনার শরীরটির জ্ঞাতা, আপনি আপনার শরীরের সংবেদনশীলতা অনুভব করেন। কিন্তু আপনার যদি মাথা যন্ত্রণা হয়, আর আপনি যদি আমাকে না বলেন, তাহলে আমি সে বিষয়ে কিছুই জানতে পারি না। তেমনি আমি যদি কোন বিষয়ে চিন্তা করতে থাকি, আপনি জানতে পারেন না কোন বিষয়টি নিয়ে আমি ভাবছি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকল জীব শরীরে পরমাত্মারূপে বিরাজিত থাকায় তিনি সকল জীব শরীরের সবকিছুই জ্ঞাত, অবগত। তিনি সকল ধরণের প্রজাতির সবরকমের শরীরের জ্ঞাতা: সেই জন্য প্রত্যেক শরীরে বিরাজিত পরমাত্মাকে বলা হয় '**পরম ক্ষেত্রজ্ঞ**'।

ঠিক যেমন আত্মা তার চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করার মাধ্যমে সমগ্র শরীরটিতে বিরাজিত, **তেমনি পরমাত্মা তাঁর পরমচৈতন্যকে সারা সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত করার মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে বিরাজমান। সীমিত-চেতন জীবাত্মা কখনোই এই অসীমরূপে সর্বব্যাপ্ত পরমচৈতন্যের অনুকরণ করতে পারে না।** আমার সীমিত শরীরটিতে কি চলছে, আমার অনুভবের পরিধি কেবল সেটুকুতেই সীমাবদ্ধ; অন্যের শরীরে কি ঘটছে তা আমার উপলব্ধির অতীত। আমার চেতনার মাধ্যমে আমি আমার সারা শরীরটিতে উপস্থিত, কিন্তু আমি আমার চেতনার দ্বারা অন্যের শরীরে উপস্থিত নই। পক্ষান্তরে পরমাত্মা সকল জীব শরীরে ও সকল পরমাণুতে — সর্বত্র বিরাজ করায় তিনি অস্তিত্বশীল সবকিছু সম্বন্ধে সচেতন তিনি পরম চেতন, পরম ক্ষেত্রজ্ঞ।

● জীবসত্তা তার নিজ দেহটির কর্তা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকল দেহের কর্তা, অধীশ্বর

জীবাত্মা তার দেহটির গৌণ মালিক, পরমেশ্বর ভগবানই সকল দেহের মুখ্য মালিক। *একজন রাজা হচ্ছেন তার রাজ্যের মূল মালিক, অধিকর্তা, আর প্রজারা হচ্ছে গৌণ অধিকর্তা। আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কোন মালিকের একটি বাড়ী যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো ভাড়াটিয়ার কাছে ভাড়া দেওয়া থাকে, তাহলে ঐ মালিককে বলা হয় মুখ্য অধিকর্তা, আর ঐ ভাড়াটিয়াকে বলা যেতে পারে গৌণ অধিকর্তা।*

ঠিক তেমনি শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত শরীরের মালিক, আর আমরা হচ্ছি এই শরীর-রূপ নানা-আকারের গৃহগুলির ভাড়াটিয়া। ভাড়াটিয়ারা যেমন তাদের মূল্য দানের ক্ষমতা অনুসারে নানা রকম মেয়াদে থাকার অধিকার পায়, তেমনি আমরাও (জীবাত্মা) নানা কর্ম-রূপ মূল্যদানের মাধ্যমে নানা মেয়াদকালের জন্য এই সব দেহ-রূপ ঘরগুলিতে বাস করতে পারি। সুতরাং প্রত্যেক দেহে আত্মা হচ্ছে গৌণ মালিক। আর জীবাত্মা যদিও তার শরীরটির জ্ঞাতা ও মালিক, পরমেশ্বর ভগবান ঐ শরীর ও শরীটির মালিক — উভয়েরই জ্ঞাতা এবং উভয়েরই মুখ্য মালিক।

● জীবাত্মাকে বিস্মৃতির মধ্যে ফেলা যায়,
<u>কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে কখনই বিস্মৃতি অধিকার করতে পারে না</u>

ভগবদ্দগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে তিনি ভগবদ্‌গীতার এই জ্ঞান কোটি কোটি বছর পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে দান করেছিলেন। অর্জুন তখন জিজ্ঞাসা করেন, *"সূর্যদেব বিবস্বানের জন্ম হয়েছিল আপনার অনেক পূর্বে। আপনি সৃষ্টির প্রারম্ভে তাঁকে এই জ্ঞান উপদেশ করেছিলেন, তা আমি কেমন করে বুঝব?'* (ভ. গী. ৪/৪)। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নটির উত্তর দিলেন, *"হে পরন্তপ অর্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু তুমি পারো না।"* (ভ. গী. — ৪/৫)।

বেদে বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান এক ও অদ্বিতীয় হলেও নিজেকে বহু রূপে প্রকাশ করেন। তিনি ঠিক বৈদুর্যমণির মতো, যা রঙ পরিবর্তন করে বহু বর্ণে প্রতিভাত হলেও সর্বদাই একই থাকে। অর্জুনের মতো ভক্তগণ ভগবানের সর্বক্ষণের সঙ্গী, আর যখনই ভগবান অবতীর্ণ হন, তখন বিভিন্ন ভাবে তাঁর সেবা করার জন্য তাঁর নিত্য পার্ষদ ভক্তগণও অবতীর্ণ হন। অর্জুন সেইরকম নিত্য ভগবৎ-পার্ষদ গণের একজন, এবং যখন কোটি কোটি বছর পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সূর্যদেব বিবস্বানকে **ভগবদ্‌গীতা** বলেছিলেন, তখন ভিন্ন কোনো উপযোগী রূপে অর্জুনও সেখানে ছিলেন। কিন্তু ভগবানের সংগে পার্থক্য এই যে ভগবান সেই ঘটনা স্মরণ করেছিলেন, কিন্তু অর্জুন সবকিছু বিস্মৃত হয়েছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) মধ্যে এই হচ্ছে প্রভেদ। ভগবানের নিত্য পরিকর এমন যেকোনো ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই একজন মুক্ত পুরুষ, কিন্তু তিনি ভগবানের সমকক্ষ হতে পারেন না। ***ব্রহ্মসংহিতায়*** ভগবানকে অচ্যুত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে এই যে তিনি কখনো নিজেকে বিস্মৃত হন না। সেইজন্য জীবসত্তা কখনোই ভগবানের সম পর্যায়ভুক্ত নয়, এমনকি সেই জীবসত্তা যদি অর্জুনের মতো মুক্তাত্মাও হন, তবুও নয়।

জীবসত্তার এই বিস্মৃতির প্রবণতা যুক্তিসঙ্গত; কেননা, জীবসত্তা হচ্ছে অণু-আয়তন বিশিষ্ট এবং সে মায়া শক্তির দ্বারা পরাভূত হতে পারে, যদিও গুণগতভাবে সে ভগবানেরই মতো। এইভাবে মায়াগ্রস্ত হয়ে পড়লে জীবসত্ত্বা পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য থেকে ভ্রষ্ট হয় এবং সে জড়া প্রকৃতির কবলে পতিত হয়ে নশ্বর জড় আবরণময় দেহ-ধারণে বাধ্য হয়, তাঁর আলোকোজ্জ্বল চিৎপ্রভা আবরিত হয়ে পড়ে; ঠিক যেমন বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের থেকে ছিটকে আসা অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি অগ্নির মতো সমগুণবিশিষ্ট হলেও অচিরেই স্তিমিত, প্রভহীন হয়ে যায়। অর্জুনের প্রতি প্রদত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা অনুসারে এমনকি মুক্তিলাভের পরও জীবের ব্যক্তিগত সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যায় না, সে 'পরমচৈতন্য'র সাথে 'লীন' হয়ে যায় না, কেননা আত্মা মানেই এক জন অপরিবর্তনীয় (অবিকার্য ঃ ২/২৫) নিত্য, শাশ্বত, সনাতন ব্যক্তি।

সেইজন্য ভিত্তিহীন মায়াবাদী দর্শনের গোড়াতেই এক গভীর গলদ রয়েছে, যেখানে বলা হচ্ছে যে সেই পরম তত্ত্ববস্তু এই সমস্ত ৮৪ লক্ষ প্রজাতির জীব শরীর ধারণ করেছেন। যদি পরম তত্ত্ববস্তু মায়াগ্রাসে পতিত হয়ে এভাবে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-র মতো অতি ভীষণ দুর্দশা-ভোগে বাধ্য হন, তাহলে কি মায়া ভগবানের থেকে শক্তিশালী? ভগবান কখনই মায়াগ্রস্ত হতে পারেন না। যদি তিনি তা হতেন, তাহলে তাঁকে ভগবান বলা যেতে পারে না। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই প্রশ্নগুলি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা, যারা নিরাকারবাদ বা অদ্বৈতবাদ প্রচার করছে, অথবা যারা নিজেদেরকেই ভগবান বলে দাবী করছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদ্‌গীতায় (৭/৪) বলেছেন যে তিনি কখনোই মায়ার অধীন হন না। পক্ষান্তরে মায়াই বিনীতভাবে তাঁর সেবা করে চলেছে ঃ *'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥* (ভ. গী. — ৭/১৪). *"আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা*

দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।" এই শ্লোকের "মম মায়া"-র অর্থ হচ্ছে "আমার মায়াশক্তি"। অতএব শ্রীকৃষ্ণ এখানে দাবী করছেন যে মায়া শক্তি তাঁর অধীন এবং তাঁর আজ্ঞানুসারে তা কার্য করে। সুতরাং এই মায়াশক্তি ভগবানকে পরাভূত করবে, এমন কোনো সম্ভাবনাই নেই।

• জীবসত্তার কেবল প্রত্যক্ষ সচেতনতা রয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার সচেতনতা রয়েছে

আমরা এমন কত বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকি যা আমাদের প্রত্যক্ষণ বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরিধির মধ্যে। কিছু বিষয় সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সচেতনতা বা জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু আমরা এমনকি এটাও জানতে পারি না — এক টুকরো খাদ্য গলাধঃকরণ করার পর কি ঘটে, কিভাবে খাদ্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদানে ও রক্তে পরিণত হয়, কিভাবে তা শরীরের পুষ্টিসাধন করে, কিভাবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুষ্ট হয়, কিভাবে সেগুলি কাজ করছে। আমাদের পরোক্ষ-অনুভবের বা প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা নেই।

কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম শ্লোকে (১/১/১) বলা হয়েছে, ***'জন্মাদস্য যতহম্বয়াদিতরতশ্চার্থেস্বভিজ্ঞঃ স্বরাট'।*** *'অন্বয়াৎ'*শব্দের অর্থ **'প্রত্যক্ষভাবে'** এবং *'ইতরতঃ'*শব্দের অর্থ — **'পরোক্ষভাবে'**। **সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সর্বকাল ধরে ঘটমান সবকিছু সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সচেতন।** আর 'স্বরাট' শব্দের অর্থ হচ্ছে **"পরম স্বাধীন"**। শক্তি বা জ্ঞানের জন্য তিনি কারো উপর নির্ভরশীল নন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শক্তিসমূহের মাধ্যমে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ ***'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব সূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ,*** যার অর্থ, *'শ্রীকৃষ্ণের অসীম শক্তিরাজি রয়েছে, এবং তিনি তাঁর শক্তিরাজির মাধ্যমে ক্রিয়া করেন।'* শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনো অংশের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োগ করতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপনার শরীরে যদি কোথাও চুলকানি থাকে, তাহলে সেখানে চুলকানোর জন্য কোনো পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন হয় না। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই (*'স্বাভাবিকী'*) আপনার হাত সেখানে চুলকাতে শুরু করে। ঠিক সেইরকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন জড় জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখন এজন্য তার কোনো নক্‌শা বা মডেল রচনা করার দরকার হয় না, তাঁকে ভাবতে হয় না কোথা থেকে উপাদানগুলি সংগ্রহ করতে হবে, কিভাবে সেগুলিকে একত্রে মিশ্রিত করতে হবে — ইত্যাদি, এবং পরে কিভাবে ঐ সৃষ্ট-জগতকে পালন করতে হবে। এসব কোন কিছু সম্বন্ধে তাঁর কোনো উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোনো প্রয়োজনই হয় না — *'স্বাভাবিকী'*। **সব কিছু স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে।** সবকিছুই তিনি সম্পন্ন করেন তাঁর শক্তিরাজির মাধ্যমে। **তাঁর শক্তি স্বয়ংক্রিয়, স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত। এই হচ্ছে পরমচৈতন্যের স্বরূপ।**

• জীব-সত্তার চেতনা সীমিত শ্রীকৃষ্ণের চেতনা অসীম

কিছু গোয়েন্দা উপন্যাস রয়েছে, যেগুলি খুবই জনপ্রিয়। এইসব উপন্যাসে বলা হয় কিভাবে এক দেশের প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত গোপন খবর অন্য দেশ জানার চেষ্টা করে। তারা সেখানে গোয়েন্দা পাঠায়। কেন তাদেরকে গোয়েন্দা পাঠাতে হয়? কেননা তারা এইসব দেশের তথ্য জানে না, তারা সীমিতভাবে সচেতন; তাদের সচেতনতার পরিধি সীমিত। তারা কত-সব ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করে, সেখানে কি চলছে তা জানার জন্য। আশির দশকে ইরাক-ইরাণ যুদ্ধের সময় আমেরিকা সেখানে স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ও পারমাণবিক স্থাপনাগুলি খুঁজে বের করা, তা নিরীক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে

সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য বহু সংখ্যক উপগ্রহ মহাকাশে মোতায়েন করেছিল। এইভাবে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে কত প্রবল প্রয়াসের পর আমরা ছোট একটি দেশের একটি ছোট্ট পরমাণু কেন্দ্র সম্বন্ধে অবগত হতে সক্ষম হই। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যখন কোনো কিছু সম্বন্ধে অবগত হতে চান, তাহলে তাঁকে কেবল ইচ্ছা করতে হয়, সেটিই যথেষ্ট। অবগত বা সচেতন হবার জন্য তাঁকে কঠোর প্রচেষ্টা করেতে হয় না। তিনি চিন্ময় জগতে বিরাজিত রয়েছেন এবং সেখানে বিরাজমান থেকেই তিনি এই মহাবিশ্বের, জড় ও চিন্ময় অসীম মহাজগৎ-প্রকাশের সমস্ত কিছুই অবগত।

সংক্ষেপে ভগবান ও জীবের পার্থক্য

অতএব, সংক্ষেপে আমাদের উপলব্ধি করা উচিত ঃ

- আমরা জীবাত্মা; ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা;
- আমরা অণু (ক্ষুদ্র চিৎ-কণ); ভগবান বিভু (অসীম);
- আমরা কেবল আমাদের নিজ দেহটি সম্বন্ধে সচেতন, অবগত; ভগবান প্রত্যেকের সম্বন্ধে এবং সমস্তকিছু সম্বন্ধে অবগত;
- আমরা নিত্যকালের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময় সেবক, দাস, আর ভগবান হচ্ছেন আমাদের প্রেমময় প্রভু;
- আমরা *গুণগতভাবে* ভগবানের সংগে অভেদ, কিন্তু *পরিমাণগতভাবে* আমরা ভগবান হতে ভিন্ন। এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার উপর আমাদের জীবনের পরম সার্থকতা লাভ নির্ভর করে।

গীতা প্রতিযোগিতা ঃ দুই

এর জন্য

কিছু প্রাসঙ্গিক শ্লোক

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ থেকে

নিম্নোক্ত শ্লোক, অনুবাদ ও তাৎপর্য

২/১৩	২/২০	৭/৪	১৩/২৩	১৫/১৬
২/১৪	২/২২	৭/৫	১৫/৭	১৫/১৭
২/১৭	২/২৩	১৩/২২	১৫/১৫	১৮/৬১

পর্ব ৩ ভগবান কে?
পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র কেন?



পর্ব ৩ ঃ ভগবান কে?
পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ কেন?

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রহীতাদের জন্য

যথার্থ সত্যের অন্বেষণকারীর মনে কখনো কখনো প্রশ্ন জাগে, *"ভগবান যদি একই হন, তাহলে বিশ্ব জুড়ে এত রকমের ধর্ম, কত ধরণের ধর্মগ্রন্থ, আর কত রকমের ঈশ্বর রয়েছে কেন? কোনটি আমাদের অনুসরণ করা উচিত? ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য কোন পথটি সর্বোত্তম?"*

ভগবান এক। সেই জন্য সমস্ত ধর্মগ্রন্থ, যা ভগবানের বাণী, তাও এক। এই সত্যটি সম্বন্ধে অজ্ঞতা পৃথিবীর ইতিহাসে বহু সংঘাত, হানাহানি, যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে। প্রকৃত সত্যটি হল, ভগবান নিজে সরাসরি অথবা তাঁর বাণীর প্রচারক দূতের মাধ্যমে তাঁর বাণী প্রচার করেন — যাঁরা তা গ্রহণ করেন সেইসব মানুষদের যোগ্যতা বা অধিকার অনুসারে। **পারমার্থিক দিক দিয়ে অগ্রসরদের জন্য যদি তাঁকে তাঁর বাণী প্রদান করতে হয়, তাহলে অবিমিশ্র, শুদ্ধ রূপে সেই তত্ত্বজ্ঞান তাঁদেরকে তিনি প্রদান করতে পারেন। যদি সেই তত্ত্ববাণী নৈতিক ও পারমার্থিক দিক দিয়ে অনুন্নত, অনগ্রসর মানুষদের জন্য হয়, তাহলে তা এমন পর্যায়ের হবে যাতে তা সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য হয়, তারা তা প্রত্যাখ্যান না করে — এবং সেই সাথে তা যেন সীমিত কিছু পারমার্থিক উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে।**

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, প্রাইমারী স্কুলের গণিত ক্লাসে একটি শিশুকে শেখানো হয়, ৫ – ৩ = ২। ঐ শিশুটি এ-রকম যোগ-বিয়োগে হয়ত বেশ পারদর্শী হয়ে উঠল, কিন্তু তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ২ – ৫ = কত? সে বলবে যে একটি ছোট সংখ্যার থেকে একটি বড় সংখ্যা বিয়োগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ঐ শিশুটি যখন বড় হয়ে হাইস্কুলে পড়তে যায়, তখন সে শিক্ষা লাভ করে, ২ – ৫ = – ৩। এটিও গণিত। তারপর যখন সে কলেজে যায়, সে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস, ইন্টেগ্রাল ক্যালকুলাস, প্রভৃতি শেখে, এগুলিও গণিত। সবই অঙ্ক, কিন্তু ক্লাস ওয়ানের গণিতের সংগে এম.এস.সি-র গণিতের মান-এর পার্থক্য রয়েছে। একজন পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীধারী শিক্ষক প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল বা কলেজে অংক পড়াতে গেলে ছাত্রদের জ্ঞানের স্তর অনুসারে তিনি শিক্ষা দেন।

ইসলাম এবং খ্রীষ্টান ধর্মমত
প্রদত্ত হয়েছিল স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে

শ্রোতা বা গ্রহীতাদের গ্রহণ, আত্তীকরণ ও অনুসরণ করার সামর্থ্য অনুসারে সর্বদাই প্রফেট, মেসিয়া বা ধর্ম প্রচারকগণ শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁর কাছে যেমন প্রকাশিত হয়েছিল, সেইভাবে ধর্মপ্রচারক মহম্মদ যখন সেই কোরাণের বাণী প্রদান করেন, তখন তার গ্রহীতা ছিল অত্যন্ত অনুন্নত মানুষ। কোরানের ১৬ নং সুরাহ্ তে বলা হয়েছে, *"তোমরা তোমাদের মায়েদের ও বোনেদের সঙ্গে যৌনক্রিয়া কোরো না।"* এখন, মহম্মদ যদি সুসভ্য মানুষদের কাছে এই উক্তি করতেন, তাহলে তা হতো নিতান্তই অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয় (কেননা সভ্য সমাজে ঐ বিকৃত কদাচারের কথা উচ্চারণ করাও লজ্জাজনক)। মহম্মদ ছিলেন একজন ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এবং ভগবানের বাণী প্রচারের জন্য ভগবৎ-নির্ধারিত; তাঁকে সেই তত্ত্ব-বাণী প্রচার করতে হয়েছিল আরবীয় মরু অঞ্চলের অপরিশীলিত উপজাতি-প্রধান মানুষদের মধ্যে, যাদের মধ্যে ঐ ধরণের যৌন-কার্যকলাপের প্রচলন ছিল।

বাইবেলে বলা হয়েছে, *'হত্যা করিও না'।* কোন ধরণের ব্যক্তির জন্য এই ধরণের উপদেশ প্রযোজ্য ঃ 'হত্যা কোরো না'? কেবল একজন হত্যাকারীকে এই ধরণের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। যীশুখ্রীষ্ট কেবল তিন বছর প্রচার করেছিলেন। তিন বছর পর তারা তাঁকেই হত্যা করে। এতেই বোঝা যায় সে সময় তাঁর জ্ঞান গ্রহণের পাত্র ছিল কারা, আর কতটুকু জ্ঞান তাদের কাছে দেওয়া সম্ভব ছিল। কেবল সাধারণ মানুষই এত হীন স্তরের ছিল না, তাঁর সবচেয়ে ভাল শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁকে ৩০ টি রূপোর টাকার বিনিময়ে বিক্রী করে দেয়, আর অপর আরেকজন শিষ্য বিচার কক্ষে তাঁর পক্ষাবলম্বন করে কিছু বলার পরিবর্তে, তাঁকে আগে কোথাও দেখেছে বলেই অস্বীকার করে।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সংগে কথা বলছেন, তাঁকে তত্ত্বজ্ঞান দান করছেন, আর অর্জুন ছিলেন তৎকালীন ভারতের ক্ষাত্রতেজ, শৌর্য-বীর্য-পৌরুষের সারাতিসার — একজন তেজস্বী বীর পুরুষ, যখন ভারতীয় সভ্যতা ছিল তার গরিমার শীর্ষবিন্দুতে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যের সেই ঋষিগণের নিকট ভগবৎ-তত্ত্ব কথা বলেছিলেন, যাঁরা ছিলেন আত্মসংযমী তপস্বী, এবং মানবজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য তাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই হচ্ছে ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণকারী শ্রোতাদের গুণমান বা যোগ্যতা। তাহলে সবগুলি ধর্মগ্রন্থ হলেও, ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত বাইবেল ও কোরাণের থেকে যে স্বতন্ত্র বলে প্রতিভাত হচ্ছে, সেটা কি বিস্ময়কর কিছু?

বিভিন্ন ধর্ম — অভিন্ন বাণী

বেদব্যাস, যীশু খ্রীষ্ট এবং মহম্মদ — সকলেই ছিলেন একইরকমভাবে ভগবৎ-শক্তি দ্বারা আবিষ্ট ও অণুপ্রাণিত। তবুও দিব্য বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে তাঁরা কেবল সেটুকুই প্রকাশ করেছিলেন, যতটুকু তাঁদের শ্রোতাদের আত্তীকরণের সামর্থ্য ছিল। কিন্তু বিশ্বের সকল প্রধান প্রধান ধর্মশাস্ত্রের সারতত্ত্ব একই, নীচে প্রধান বাণীগুলিকে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে।

সকল ধর্মগ্রন্থের সারকথা

১. ভগবান এক।
২. ভগবৎ-প্রণীত আইন (ধর্ম) মেনে চলা কর্তব্য।
৩. ভগবানকে ভালবাসা কর্তব্য।
৪. ভগবানের জন্য সেবা-কর্ম সম্পাদন।
৫. আর পাপ-কর্ম নয়।
৬. ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া লক্ষ্য।
৭. ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অনুশীলন, জড়েন্দ্রিয় ভোগে অনাসক্তি।
৮. তত্ত্বদর্শী সদ্গুরু গ্রহণ।
৯. ভগবানের দিব্য নামের অনবদ্য মহিমা।

<u>মাংসাহার</u> ঃ এইভাবে, প্রত্যেক ধর্মেই মাংসাহারের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ রয়েছে। ইসলাম ধর্মে, কোরবানি দেওয়ার পর সব পশুকে আহার করা যায়, কেবল শূকর ও কুকুর ছাড়া। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানেরা-প্রতিদিন মাংসাহার করত—কেবল শুক্রবার ছাড়া। আজকাল যেহেতু মানুষ এমনকি এই সামান্য বিধিনিষেধটুকুও মেনে চলতে অনিচ্ছুক, সেজন্য ঐসব রীতি-নিয়মের আর প্রচলন নেই। পক্ষান্তরে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে মাংসাহার হচ্ছে পাপময় জীবনের একটি স্তম্ভ-স্বরূপ, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের সৃষ্ট সমস্ত জীবগণের প্রতি আমরা করুণা প্রদর্শন না করছি, ততক্ষণ প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা হতে পারে না।

<u>যৌন-জীবন</u> ঃ প্রত্যেক ধর্মেই যৌন-জীবন ও বিবাহের উপর বিধি-নিষেধ রয়েছে। ইসলাম ধর্মে একজনকে

একবারে কেবল চারজন নারীকে বিবাহ করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বাইবেলে করিন্থিয়ান্‌স্ অংশে সন্ত পল বলেছেন যে যৌনাবেগে দগ্ধ হওয়ার থেকে বিবাহ করা ভাল। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, 'যন্মৈথুনাদি ... (ভা. ৭/৯/৪৫)' চুলকানি কমানোর উদ্দেশ্যে দুহাতের ঘর্ষণের সঙ্গে যৌন জীবনের তুলনা করা হয়। গৃহমেধি বা তথাকথিত গৃহস্থদের কোন পারমার্থিক জ্ঞান নেই। তাই তারা মনে করে যে এই চুলকানিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের স্তর, যদিও বাস্তবে তা শুধু দুঃখেরই উৎস। কিন্তু যাঁরা ধীর তাঁরা এই চুলকানি সহ্য করেন, তাঁদের কখনও গণ্ডমূর্খদের প্রাপ্য দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয় নয়।"

এইভাবে আমরা একটি ধর্মশাস্ত্রে দেখি একজনকে চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। অপর আরেকটি শাস্ত্রে নিতান্তই অনিচ্ছুকভাবে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে যৌনবেগে দগ্ধ হওয়ার পরিবর্তে (সহ্য না করতে পারলে) বিবাহ করা উচিত্ আর অপর'একটি শাস্ত্রে যৌন জীবন পুরোপুরি পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। একটি ধর্মে কেবল শূকর ও কুকুর ছাড়া সব ধরণের পশুকে আহারের জন্য কোরবানি দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। অন্য আরেকটি ধর্মে বলা হচ্ছে যে শুক্রবারে আমাদের মাংস ভক্ষণ করা উচিত নয়। আর অপর আরেকটি ধর্মে মাংসাহার সম্পূর্ণভাবে বর্জন করার জন্য প্রবল গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এইসব পার্থক্যগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে কিভাবে? খুবই সরল। ভগবদ্‌প্রেরিত সকল শক্ত্যাবিষ্ট প্রচারকগণের বাণী যদিও একই, তবুও তাঁরা তাঁদের গ্রহীতা শ্রোতাদের গ্রহণক্ষমতার মাত্রানুযায়ী উপযুক্ত স্তরের শিক্ষাই প্রদান করেন, অবশিষ্টাংশে, তার চেয়ে উচ্চতর শিক্ষা তাঁরা সংগুপ্ত রাখেন।

মহম্মদ যেটুকু শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার জন্যও তিনি প্রাণ হারানোর আশংকায় মক্কা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিন বছর মাত্র প্রচার করার জন্য যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়েছিল। এতে অল্পই আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে, যখন বাইবেলে যীশু বলেন, *"তোমাদের কাছে আমার অনেক কিছুই বলবার আছে, কিন্তু এখন তোমাদের তা শোনবার সামর্থ্য নেই।"* কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (৭/২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন,

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥

"আমি এখন তোমাকে পূর্ণরূপে ঐশ্বর্যময় এবং মাধুর্যময় জ্ঞানের কথা বলব, যা জানা হলে আর কিছুই জানবার থাকে না।"

পূর্ণজ্ঞান বলতে বোঝায় পরিদৃশ্যমান (অপরা জড়া প্রকৃতি-প্রসূত) বস্তুজগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং এর অন্তরালে যে চেতন সত্তা রয়েছে, সেই সম্বন্ধীয় জ্ঞান। উভয় প্রকার জ্ঞানের উৎস হচ্ছে চিন্ময় অপ্রাকৃত জ্ঞান।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের কাছে একটি পকেট ডিক্‌শনারি রয়েছে, আর একটি বিপুলায়তন *চেম্বারস্ ডিক্‌শনারি* রয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম — প্রভৃতি স্বীকৃত ধর্মগুলি পকেট ডিক্‌শনারির মতো (যেখানে শ্রোতাদের স্তর অনুসারে আংশিকভাবে পরম সত্যের প্রকাশ রয়েছে), এবং ভগবদ্গীতার মতো সনাতন ধর্মের শাস্ত্রগুলি চেম্বারস্ ডিক্‌শনারির মতো (যেখানে পূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়েছে বলে বলা হচ্ছে, যা জানলে আর কিছু জানবার থাকে না)। 'কাম্', 'গো', 'হুট', প্রভৃতি ছোট ছোট শব্দগুলি পকেট ও চেম্বারস্ — উভয় ডিক্‌শনারিতেই রয়েছে। ঠিক সেইরকম সত্ত্বগুণ উন্মোচক বিষয়গুলি — যেমন 'চুরি করিও না', 'প্রত্যেককে ভালবাস', 'তোমার শত্রুর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর', 'সর্বদাই সকলের কল্যাণ কর' — ইত্যাদি নির্দেশগুলি সব ধর্মশাস্ত্রেই দেখতে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু, বড় বড় শব্দ — যেমন 'ক্যাটাক্লিজম্', 'করোবোরেট' — এগুলি পকেট ডিক্‌শনারিতে পাওয়া যাবে না, এজন্য চেম্বারস্ ডিক্‌শনারি দেখতে হবে। ঠিক তেমনি এইসমস্ত বিষয়-বস্তু, যেমন 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব', 'অহৈতুকী

অপ্রতিহতা ভগবদ্ভক্তি — ভগবানের ইচ্ছার কাছে পরিপূর্ণ নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদন,' 'সমস্ত জড় সুখ বর্জন করে দিনের ২৪ ঘন্টাই ভগবৎ চিন্তায় ও ভগবৎ-সেবায় তন্ময় থাকা', 'এমনকি মুক্তিলাভেরও আকাঙ্ক্ষা-শূন্য হয়ে জন্ম জন্ম ধরে ভগবানের সেবা করার অভিলাষ' — এই ধরণের অতি উচ্চস্তরীয় বিষয়বস্তু কেবল সনাতন ধর্মের সবচেয়ে উন্নত শাস্ত্রগুলির মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় (উদাহরণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে)।

তবুও, সমস্ত শাস্ত্রই উন্নত পারমার্থিক জীবন-লাভে সহায়ক। ইসলাম ধর্মে সুফী সাধকগণ কোরাণের বাণী অনুসরণ করে মাংসাহার ত্যাগ করেন ও মাদকাসক্তি বর্জন করেন এবং ফলে উন্নত আধ্যাত্মিক স্থিতি প্রাপ্ত হন। খ্রীষ্টান ধর্মে ফ্রান্সিনিয়ান ভিক্ষু ও বেনেডিক্টাইন সন্ন্যাসীগণ কঠোর নিরামিষ আহার, সংযম পালন ও ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে একই রকম উন্নত আধ্যাত্মিক স্থিতি লাভ করেন।

সনাতন ধর্ম ঃ সমস্ত ধর্মের সুপার মার্কেট

আফগানীয়রা যাকে 'সিন্ধু' নামে আখ্যাত করেছিল, পরবর্তীতে ও এখনও সাধারণ মানুষ যাকে 'হিন্দুধর্ম' বলে থাকে, সেই সুপ্রাচীন সনাতন ধর্ম আজও বিদ্যমান ও শক্তিশালী — এর উপর সর্বদিক থেকে সমস্ত ধরণের আক্রমণ সত্ত্বেও। পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলির উদ্ভবের কালানুক্রম এইরকম ঃ **ইসলাম — ১৪০০ বছর পূর্বে; খ্রীষ্টান ধর্ম — ২০০০ বছর পূর্বে; বৌদ্ধ ধর্ম — ২৫০০ বছর পূর্বে; ভগবদ্গীতা — ৫০০০ বছর পূর্বে।**

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও অর্জুনকে **ভগবদ্গীতা** বলেছিলেন পাঁচ হাজার বছর পূর্বে, তবু চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলেন, **"আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্যদেব তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। ... ... সেই সনাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা; তাই তুমি এই বিজ্ঞানের অতি গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।"** (ভ.গী. — ৪/১-৩)

যদি ধরে নেওয়া হয় যে মনুর জন্মের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য বিবস্বানকে ভগবদ্গীতার জ্ঞান দান করেছিলেন, তা হলেও গীতা বলা হয়েছিল অন্ততঃপক্ষে ১২ কোটি ৪০ লক্ষ বছর পূর্বে; আর মানব সমাজে এই জ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছিল বিগত প্রায় ২০ লক্ষ বছর; এর পর প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে অর্জুনকে পুনরায় এই গীতাজ্ঞান প্রদত্ত হয়। গীতার বক্তা স্বয়ং ভগবানের বর্ণনা অনুযায়ী এই হচ্ছে **ভগবদ্গীতার** ইতিহাস।

এইভাবে, সবচেয়ে প্রাচীনতম ধর্ম হওয়ার জন্য সনাতন (শাশ্বত) **ধর্ম** হচ্ছে অন্য সকল ধর্মের সূতিকাগার, বা বলা যায় সকল ধর্মের বড়বাজার বা সুপার মার্কেট। এখানে বহু ধরণের ধর্মমত রয়েছে, কালের গতিতে চলমান বিশ্বমানব-সভ্যতার নৈতিকভাবে হীন কিংবা আধ্যাত্মিকতায় উন্নত — ভিন্ন ভিন্ন রুচির বহু মানুষের জন্যই সেগুলি মানানসই করে তৈরী।

মৎস্যপুরাণ অনুসারে মোট ১৮ টি পুরাণ রয়েছে।

- ৬টি পুরাণ রয়েছে **তমোগুণ-বিশিষ্ট** মানুষদের জন্য (যেখানে শিব ও দুর্গার মহিমা কীর্তিত হয়েছে);
- ৬টি পুরাণ রয়েছে **রজোগুণ-বিশিষ্ট** মানুষদের জন্য (এইসব পুরাণে ব্রহ্মা সহ অন্যান্য দেবদেবীর পূজার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে);
- ৬টি পুরাণ রয়েছে **সত্ত্বভাবাপন্ন** মানুষদের জন্য। এইসব পুরাণে ভগবান শ্রীহরি — শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে।

তমো-গুণে আরাধনা

শিব হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন অবতার। তিনি একজন গুণাবতার, যিনি তমোগুণে আচ্ছাদিত জীবদের উপর আধিপত্য করেন, তাদের পরিচালিত করেন।

আপনি যদি কক্কেশ্বর (মুম্বই-এর কাছাকাছি একটি শিব মন্দির) দর্শনে যান, তাহলে সেখানে আপনি এমন সব সাধুদের দেখতে পাবেন, যাঁরা 'চরস' খাচ্ছে। করুণা পরবশ হয়ে আপনি যদি তাদের কাছে বলেন সাধুর উচিত মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা, তাহলে তারা আপনার প্রতি মৃদু হেসে শৈব-শাস্ত্রগুলি থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করে দেবে যে ঠিক ঠিক ভাবে শিবের আরাধনার জন্য শিবভক্তগণের মাদক সেবন একান্ত আবশ্যক। তারা বলবে যে বিশেষতঃ মহাশিবরাত্রির দিন 'ভাঙ্গ'-নেশা হচ্ছে উৎসবের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঠিক তেমনিভাবে দুর্গার উপাসকেদের (তান্ত্রিক আরাধনা বিধি অনুসারে) পঞ্চ ম' গ্রহণ করতে হয়; পঞ্চ 'ম' হচ্ছে মৎস্য, মাংস, মদিরা, মৈথুন এবং মরা (মৃতদেহ)।

এই ধরণের (নিয়ন্ত্রিত কিছু নির্দিষ্ট দিনের জন্য) পূজা-বিধি হচ্ছে অত্যন্ত হীনাবস্থা প্রাপ্ত মানব-মনকে ভগবানের মহিমার প্রতি প্রলুব্ধ করার একমাত্র উপায়। এদের উপর যদি এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা না হয় তাহলে দিনের পর দিন তারা অবিশ্রান্তভাবে এইসব অপকর্ম করে চলবে।

এইরকম তমোগুণে-প্রভাবিত কেউ যদি এই নিয়মবিধি মেনে চলে (যেমন পঞ্চ ম' কেবল মহাশিবরাত্রিতে) — শাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে, তাহলে তাদের ঐ সমাজে সে সাধু বলে বিবেচিত হবে। তবুও, তমো-স্বভাব মানুষেরা এইসব আরাধনার মাধ্যমে ধীরে ধরে উন্নত হয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নততর চেতনায় উপনীত হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, বৈদিক শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে কালীকে সন্তুষ্ট-করার জন্য পশুবলি দেওয়া কর্তব্য। এই নির্দেশটি তাদের জন্য, যারা তমোগুণে আচ্ছাদিত ও মাংসাহারে আসক্ত। এই শাস্ত্রনির্দেশের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ঐ মাংসাহারের অভ্যাস বিনষ্ট করা। দেবী কালিকার কাছে কেবল অমাবস্যার রাত্রে ছাগল বলি দেওয়া যেতে পারে, যা মাসে একবার আসে (অবশ্য দেবী কালিকা পশুরক্ত গ্রহণ করেন না, তাঁর দু'পাশের ডাকিনী যোগিনী ঐ মাংস খেয়ে উচ্ছিষ্ট করে)। পশুবলি দিতে হলে ঐ কালী-ভক্তের নিজেকে ঐ পাঁঠার কানে একটি মন্ত্র বলতে বলতে তার গলা কাটতে হয়। ঐ মন্ত্রটির অর্থ হচ্ছে ঃ *"প্রিয় ছাগল, এই জন্মে আমি তোমাকে দেবী কালিকার নিকট বলি দিচ্ছি, পরের জন্মে তুমি আমাকে এইরকম কোরো" (!)।*

কয়েকবার এইরকম বলিদান যজ্ঞের পরে এমনকি সবচেয়ে অসুর প্রকৃতির কালীভক্তও চেতনা ফিরে পায়। সে যখন বুঝতে পরে যে সে এইভাবে তার নিজের ভবিষ্যত দুর্দশাময় করে তুলছে, তখন তাঁর পারমার্থিক বোধ জাগ্রত হয়। এইভাবে উচ্চ চেতনা লাভের ফলে সে একদিন মাংসাহার পরিত্যাগ করতে পারে। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে বৈদিক শাস্ত্র-সমূহ খুব বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ভগবান-কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে, যাতে সকল ধর্মের মানুষ শাস্ত্র অনুসরণ করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে উন্নত চেতনা ও পরিশেষে পারমার্থিক পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

কলিযুগের জন্য নির্দিষ্ট শাস্ত্র

বৈদিক কৃষ্টি অনুযায়ী প্রত্যেক যুগের জন্য নির্দিষ্ট শাস্ত্র বিহিত রয়েছে। শাশ্বত মহাজাগতিক কালচক্রের নির্দিষ্ট কিছু কাল বা যুগের জন্য এইসব শাস্ত্র নির্দিষ্ট। এই সব শাস্ত্র ঐ বিশেষ কালের মানুষদের গুণ-দোষ স্বভাব-রুচি অনুসারে বিশেষভাবে পরিকল্পিত।

১০৮টি উপনিষদ রয়েছে। এর মধ্যে একটি উপনিষদ বিশেষভাবে এই কলিযুগের জন্য নির্দিষ্ট, আমরা যে-যুগে

বাস করছি। এই শাস্ত্রটির নাম *কলিসন্তরণ উপনিষদ*। এই গ্রন্থের নামেই যেমন ঘোষিত হয়েছে, "এই উপনিষদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে কলি যুগ-রূপ মহাসাগর অতিক্রম করতে সাহায্য করা।" **হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র :**

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই উপনিষদে অভিব্যক্ত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে ভগবানের ষোলটি দিব্যনাম সমন্বিত এই মহামন্ত্র জপের ফলে জীবনের পরম লক্ষ্য — ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা-জ্ঞান দান করেছিলেন দ্বাপর যুগের শেষে; কেবল অর্জুনের জন্যই নয়, পরবর্তীকালের কলিযুগের মানুষের জন্যও তিনি এই জ্ঞান দান করেছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর দ্বারা **শ্রীমদ্ভাগবতও** কথিত হয়েছিল (পরবর্তীতে সুত গোস্বামীর দ্বারা পুনরাবৃত্ত হয়েছিল) মুখ্যত কলিযুগের মানুষদের জন্য। এই শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন ও অনুসরণের মাধ্যমে আমরা কলিযুগের মানুষেরা এই যুগের দুঃখ-দুর্দশা থেকে স্বস্তি পেতে পারি এবং জীবনের পরম লক্ষ্য — ভগবৎ-প্রেম লাভ করতে পারি।

ভগবান : বিভিন্ন নামে অভিহিত হন

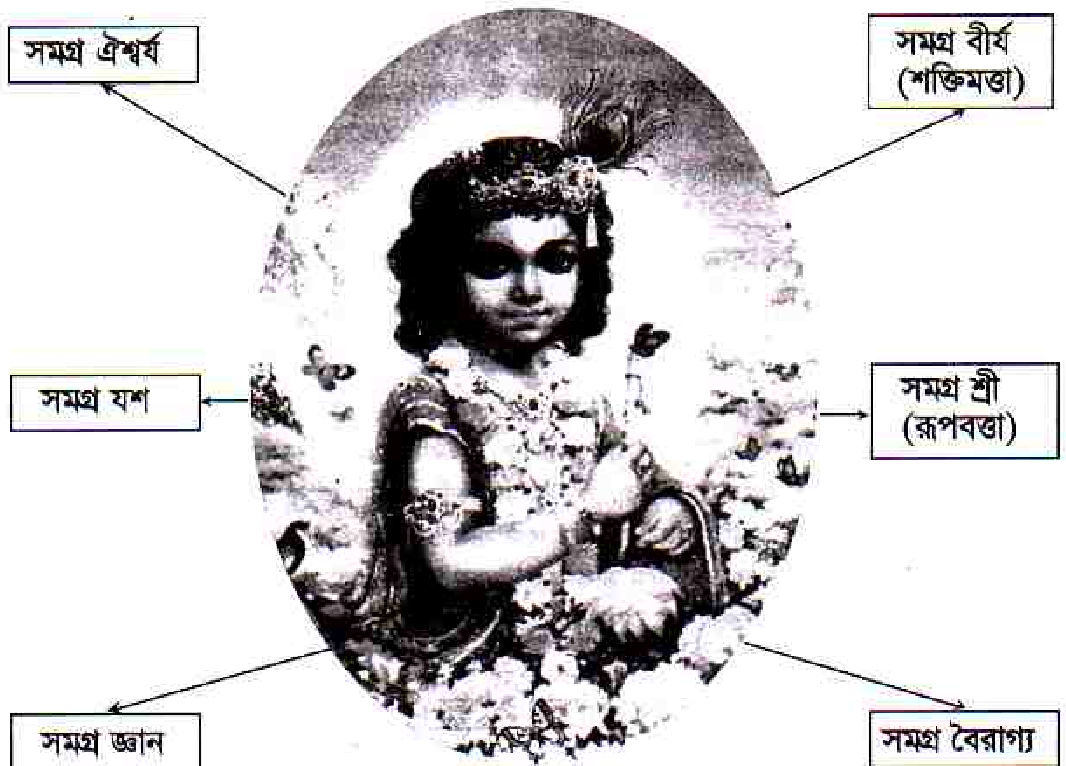
সংজ্ঞানুযায়ী, ভগবান হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং তিনি সকল গুণাবলী, চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। গুণে, বৈভবে, চরিত্রে অপর কেউই তার সমকক্ষ নয়, তাঁর থেকে কেউ শ্রেষ্ঠ নয়। ভগবানের প্রত্যেক গুণ, লীলা বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাঁর একটি নাম রয়েছে। **যেমন 'সর্বশক্তিমান' শব্দের দ্বারা বোঝায় যে কেউই ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। 'সর্বশক্তি-সমন্বিত'-এর অর্থ হচ্ছে ভগবান সর্বশক্তির অধীশ্বর। ভগবান অসীম রকমের শক্তিরাজির অধীশ্বর, তাঁর শক্তিরাশির কোনো অন্ত নেই। সূর্যকে ইংরেজরা 'সান' বলে, হিন্দী ভাষীরা বলে 'সুরজ,' সংস্কৃতভাষীরা 'সূর্য্য'। যখন এই তিন শ্রেণীর ভাষাভাষী মানুষ উচ্চৈঃস্বরে এই শব্দ তিনটি উচ্চারণ করেন, তখন তাঁরা ঐ একই সূর্যকে বোঝান। ঠিক তেমনি ভগবানকেও বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, যেমন : 'জিহোবা' যার অর্থ 'সর্ব শক্তিমান', 'আল্লাহ্'-এর অর্থ 'সবচেয়ে মহান', 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থ 'সর্বাকর্ষক', 'রাম' শব্দের 'পরম ভোক্তা', ইত্যাদি।**

ভগবানের সংজ্ঞা

ভগবানের একটি সরল সংজ্ঞা হচ্ছে : *'জন্মাদ্যস্য যতঃ'* — *"যাঁর থেকে সমস্ত প্রকাশিত হয়"* (ভাঃ ১/১/১)। 'ভগবান' শব্দটি সংস্কৃত, এবং এর অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনি — "(১) **সমগ্র ঐশ্বর্য** (ধনসম্পদ), (২) **সমগ্র বীর্য** (শক্তিমত্তা), (৩) **সমগ্র যশ**, (৪) **সমগ্র শ্রী** (সৌন্দর্য, রূপবত্তা), (৫) **সমগ্র জ্ঞান** ও (৬) **সমগ্র বৈরাগ্য যাঁর মধ্যে পূর্ণ-রূপে বর্তমান, সেই পরম পুরুষ হচ্ছেন ভগবান।**" *'ভগ'* শব্দের অর্থ ছয়টি ঐশ্বর্য (ষড়ৈশ্বর্য) এবং *'বান'* শব্দের অর্থ যুক্ত বা সমন্বিত। যেমন জ্ঞানবান অর্থ জ্ঞান-সমন্বিত, ধনবান শব্দের অর্থ ধন-সমন্বিত, তেমনি *ভগবান* শব্দের অর্থ যিনি সম্পূর্ণভাবে ৬টি ঐশ্বর্য সমন্বিত। ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য অন্যকে আকর্ষণ করে — আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হবার এটিই রহস্য। কারও যে-পরিমাণে এই ঐশ্বর্য থাকে, তিনি ততটাই আকর্ষণীয় হন। এজগতে সকলেরই ঐসব ঐশ্বর্য কিছু কিছু পরিমাণে রয়েছে — কিন্তু কেউই সমগ্র ঐশ্বর্য-সম্পন্ন নয়। অনেক ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা অত্যন্ত ধনবান, খুব বলবান, খুব রূপবান, অত্যন্ত যশস্বী, খুব জ্ঞানী এবং অত্যন্ত বৈরাগ্যবান, কিন্তু কেউই দাবী করতে পারে না যে তাঁর সমগ্র ধনৈশ্বর্য, সমগ্র বলবত্তা, সমগ্র সৌন্দর্য ইত্যাদি রয়েছে — একমাত্র ভগবানেরই

এইগুলি পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে। উপরোক্ত ছয়টি ঐশ্বর্য যাঁর পূর্ণমাত্রায় আছে, তিনি নিশ্চয়ই 'সর্বাকর্ষক'। সংস্কৃত ভাষায় সর্বাকর্ষক শব্দের সমতুল শব্দ হচ্ছে 'কৃষ্ণ'।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, যিনি শাশ্বত কাল ধরে, সম্পূর্ণভাবে সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ঐশ্বর্যসম্পন্ন পরমপুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান। পূর্ণমাত্রায় ঐশ্বর্য সমূহের অধিকারী হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ পরম আকর্ষক, তিনি সর্বাকর্ষক পরম পুরুষ, সেজন্যই তাঁর নাম 'কৃষ্ণ', যিনি সকলকে আকর্ষণ-পূর্বক আনন্দ প্রদান করেন।



<u>শ্রীকৃষ্ণ ঃ পরম সুন্দর</u>

■ ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর দ্বিভূজ নরাকার রূপকে দুর্লভ দর্শন বলেছেন *(সুদুর্দর্শম্ ইদং রূপং — ১১/৫২)*। ব্রহ্মসংহিতায় তাঁর রূপের অনবদ্য বর্ণনা রয়েছে — তিনি ত্রিভঙ্গললিত, গোপবেশ তাঁর মস্তক ময়ূর-পুচ্ছ যুক্ত উষ্ণীষ-শোভিত, তাঁর নয়নদ্বয় পদ্মের পাপড়ির মতো আয়তাকার ও সুকোমল, তাঁর গলদেশে শোভমান বৈজয়ন্তীমালা, তাঁর সুন্দর অধরে শোভিত মোহন মুরলী; তাঁর গাত্র বর্ণ ঘন মেঘের মতো নীলাভ, তিনি দিব্য আভরণভূষিত সুন্দরাঙ্গ, তিনি নিত্য-নব-নবায়মান যৌবন সম্পন্ন। বস্তুতঃ, যুগ-যুগান্ত ধরে শিল্পে-সাহিত্যে, ভাস্কর্যে-চিত্র কলায়, নাট্যে-সঙ্গীতে পৃথিবীর মানুষ শ্রীকৃষ্ণের অনুপম রূপ-মহিমার গুণ-গান করে আসছে।

শ্রীকৃষ্ণ ঃ সর্বজ্ঞ

■ জড় দেহধারী কেউই তার অতীতের লক্ষ লক্ষ জন্মের কথা স্মরণ করতে পারে না, সে তার ভবিষ্যত জীবন সম্বন্ধেও কিছু বলতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *"হে অর্জুন! পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত। আমি সমস্ত জীব সম্বন্ধে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না।"* (ভ.গী. ৭/২৬) কেবল শ্রীকৃষ্ণই জানেন সমস্ত জীবসত্তার অতীত ইতিহাস, তিনিই জানেন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের বর্তমান এবং কেবল তিনিই জানেন সকলের ভবিষ্যত। আমরা কেউ এমনকি গতকাল ও আগামী কালের কথাও ঠিকভাবে বলতে পারি না।

■ ভগবদ্গীতার চতুর্থ-অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জানান যে তিনি কোটি কোটি বছর পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। কিন্তু অর্জুন তখন জানতে চান, শ্রীকৃষ্ণের জন্মের এত পূর্বে জন্মানো বিবস্বানকে কিভাবে তিনি জ্ঞান দান করতে পারেন। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে তিনি বহুবার অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই সাথে অর্জুনেরও অনেকবার জন্ম হয়েছে, কিন্তু তিনি তাঁর সমস্ত আবির্ভাবের কথা, তাঁর কার্যাবলীর কথা অবগত, কিন্তু অর্জুন কিছুই অবগত নন (ভ. গী. ৪/৫)।

শ্রীকৃষ্ণ ঃ পরম শক্তিমান

■ এজগতে যারা খুব বলশালী, মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ওয়েট-লিফ্টার-যারা সারা জীবন ধরে ওজন তোলার জন্য মর্মন্তুদ পরিশ্রম করে, তারপর বহু বছরের নিদারুণ কসরতের শেষে বিশ্ব-ক্রীড়াঙ্গনে যখন তারা অল্প কিছু ওজন কয়েক মুহূর্তের জন্য উপরে তুলে ধরে রাখতে সক্ষম হয়, তখন লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে সে একজন বীর তারকায় পরিণত হয়। কিন্তু তাদের শক্তির সংগে যদি গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণের শক্তি তুলনা করা হয়? শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন মাত্র সাত বছর, তখন তিনি তাঁর বাঁহাতের কনিষ্ঠ আঙুলটির সাহায্যে একটা গোটা পর্বত তুলে ধরেছিলেন — ইন্দ্রের সৃষ্ট অবিশ্রান্ত বর্ষণ থেকে ব্রজবাসীদের রক্ষা করার জন্য। সেই গোবর্দ্ধন পর্বতটি এখনো বৃন্দাবনে রয়েছে, ২২ কিলোমিটার যার পরিধি, আর পাঁচ হাজার বছর আগে এটি আরো বড় ছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সহজেই পর্বতটি ধরে রেখেছিলেন — কয়েক মুহূর্তের জন্য নয় — সাতদিন সাত রাত্রি ধরে। শ্রীকৃষ্ণের অলোকসামান্য বীর্যবত্তার এটি একটি দৃষ্টান্ত।*

একবার শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যা যদুরাণীকে (জ্যাড, অস্ট্রেলিয়া) গোবর্দ্ধন-ধারী কৃষ্ণের একটি ছবি আঁকতে বলেছিলেন। যদুরাণী কৃষ্ণকে একজন বলশালী এক যুবক-রূপে আঁকল, তাঁর পেশীবহুল দেহের বাইসেপগুলো ভালভাবেই দেখা যাচ্ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে বললেন যে গোবর্দ্ধন উত্তোলন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের এইরকম বড় বড় পেশীর প্রয়োজন হয় না; তাঁর দেহটি চিন্ময়, আর তিনি অচিন্ত্য অনন্ত শক্তির অধিকারী। একটি হাতি যেমন বিনা আয়াসে একটি ব্যাঙের ছাতা বা ছত্রাক তুলে ধরতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তেমনই অনায়াসে গোবর্ধন পর্বত তুলেছিলেন, ধরে রেখেছিলেন সাতদিন।

---

* তাহলে, বড় পৃথিবী গ্রহটি কিংবা দৈত্যাকার বৃহস্পতি-গ্রহ — যার খোলের মধ্যে ধরে যাবে ১৩০০ পৃথিবী, কিংবা মহাদ্যুতিশালী সূর্য — এদের মহাশূন্যে ভাসিয়ে রাখার জন্য যে মহাকর্ষ-শক্তির প্রয়োজন, সেটি কত প্রচণ্ড হতে পারে? সেটি আসছে কোথা থেকে, কার কাছ থেকে? শ্রীকৃষ্ণ বলেন, *'গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়ামি অহম্ ওজসা* (ভ. গী. ১৫/১৩), তাঁর শক্তিতেই গ্রহ, জীবসমূহ রয়েছে নির্ভর করে। শুধু একটি সৌরজগৎ নয়, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তিনি ধারণ করেন — সূত্রে গ্রথিত মণি-সমূহের মতো, তিনিই সবকিছুকে ধারণকারী সূত্র (*ময়ি সর্বম্ ইদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব* (ভ. গী. ৭/৭)। গ্রহসমূহ যে ভগবানের পরিকল্পনায়, ভগবানের শক্তিতে স্থিত, সেকথা বলেছেন মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্তা নিউটনও; তিনি তাঁর 'প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "The motions which the planets now have, could not spring from any natural cause alone, but were impressed by an Intelligent Agent."

■ শ্রীকৃষ্ণ কংসের আমন্ত্রণে মথুরায় গিয়ে বিশাল হরধনুটি নিমেষেই ভেঙে ফেলেছিলেন; বিশাল ও ক্রোধোন্মত্ত কুবলয় হস্তীকে বধ করেছিলেন, চাণুর, মুষ্টিকের মতো বিশালদেহী মুষ্টিযোদ্ধাদের বধ করেছিলেন। অথচ তখন তাঁর 'বয়স' ছিল মাত্র ১১ বছর ৬মাস। ভগবান সবসময়ই ভগবান, শিশু বা তরুণ — তিনি সবসময়ই সমান শক্তিশালী, সমান অচিন্ত্য শক্তির অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন মাত্র সাতদিন, তখন তিনি কংসের পাঠানো বিশালদেহী পুতনা রাক্ষসীকে বধ করেছিলেন। পরবর্তীতে, অর্জুনকে তিনি বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, যা দর্শন করে অর্জুনের মতো বীরও ভয়ে কাঁপছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ভীষ্ম-দ্রোণ-দুর্যোধন-সহ সমস্ত যোদ্ধাদের তিনি নিহত করেই রেখেছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাস তাঁর উক্তির সত্যতা বহ করেছেন। ভীষ্ম-দ্রোণ ছিলেন প্রায় অজেয়। অথচ তাঁদের মৃত্যুবরণ করতে হয়, কেননা সেটাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মদেব স্বীকার করেন যে অনন্ত শক্তিধর সর্বাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত।

■ শুধু তাই নয়, আমাদের যা বল, শক্তি, শৌর্য আছে, তা শ্রীকৃষ্ণের থেকেই আসছে। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তা বলেছেন ঃ ***বলং বলবতা চ অহম্, "আমি বলবানদের বল।"***

<u>শ্রীকৃষ্ণ ঃ সর্বাপেক্ষা যশস্বী</u>

■ শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম 'উত্তমশ্লোক'। এই পৃথিবীতে, ব্রহ্মাণ্ডের নানা লোকে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে এবং চিন্ময় জগতের বৈকুণ্ঠ গ্রহলোকে সবচেয়ে বিদগ্ধ মহাত্মাগণ সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর শ্লোকে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের যশোমহিমা গান করে থাকেন।

■ ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শয্যা-স্বরূপ অনন্ত শেষ তার সহস্র বদনে স্মরণাতীত কাল ধরে শ্রীকৃষ্ণের যশোমহিমা গান করছেন, কিন্তু এখনো তিনি ভগবানের মহিমার অন্ত পান নি।

■ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভগবান বলেন, "একজন বিজ্ঞানী ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণুও গণনা করতে সক্ষম হতে পারেন, আমার মহিমা বর্ণনা করতে কেউই সমর্থ নয়।"

■ একজন কবি গেয়েছেন যে আমরা যদি আকাশকে কাগজ হিসাবে ব্যবহার করি, বিশ্বের সমস্ত বৃক্ষগুলিকে লেখনী আর সমস্ত মহাসমুদ্রগুলিকে কালি হিসাবে ব্যবহার করি, তবুও সেগুলি ভগবানের গুণগাথার বর্ণনা এমনকি শুরু করার পক্ষেও যথেষ্ট হবে না।

■ মহাভারতে, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনার সময় বিষ্ণু সহস্র নাম (শ্রীকৃষ্ণের এক হাজার নাম) স্তোত্র কীর্তন করেন। এই নামগুলির প্রতিটিই ভগবানের অচিন্ত্য অপ্রাকৃত গুণ-মহিমা ব্যক্ত করছে।*

---

* পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কেউ জন্মগ্রহণ করেনি, যে শ্রীকৃষ্ণের মতো যশখ্যাতি লাভ করতে পেরেছে। সারা ভারতে শ্রীকৃষ্ণের যশমহিমা প্রচারে জন্য লক্ষাধিক মন্দির রয়েছে। শুধু বৃন্দাবনেই রয়েছে পাঁচ হাজার মন্দির। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ, কোনো শহর নেই, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শ্রীমন্দির নেই। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ, ১০৮ উপনিষদ, ১৮টি পুরাণ বা পৌরাণিক ইতিবৃত্ত, প্রাচীনতম মহাকাব্য রামায়ণম্ ও মহাভারতম্, শ্রীমদ্ভাগবত সহ শতশত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করছে। বেদে পরম পুরুষ ও তাঁর শক্তিরাজি ধারণকারী দেবদেবীর মহিমা বর্ণিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জীব ব্রহ্মাকে বেদ-জ্ঞান প্রদান করেন, অতীতে বেদ শিক্ষা দেন (*যো ব্রহ্মানং বিদধাতি পূর্বম্ যে বব বেদংশ্চ গাপয়তিচন্দ্রস্ম কৃষ্ণঃ* — অথর্ববেদ)। শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণের অবতার, উভয়ে অভিন্ন, (ভগবান দুইজন নন — একমেবাদ্বিতীয়ম্ — বেদ), সেজন্য রামায়ণও শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করছে। মহাভারত ১ লক্ষ শ্লোকের, শ্রীমদ্ভাগতে ১৮ হাজার শ্লোক রয়েছে, বেদ-পুরাণ লক্ষ লক্ষ শ্লোকের। ইলিয়াড-ওডিসির যা মিলিত আয়তন, শুধু মহাভারত তার চারগুণ।

শ্রীকৃষ্ণ ঃ পরম সম্পদশালী

● ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন (১০/৮), *"আমি জড় ও চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন।"* শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুর পরম উৎস হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তিনি জড় ও চিন্ময় জগতের সব কিছুর উৎস।

● এই জগতে সকলেই লক্ষ্মীদেবীর সামান্য কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য চেষ্টা করছে, কিন্তু চিন্ময় জগতে শতসহস্র লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য সর্বদা তৎপর, *ব্রহ্মসংহিতায়* যেমন তা বলা হয়েছে (৫/২৯), *"লক্ষ্মী সহস্র শতসম্ভ্রম সেব্যমানম্"*। ব্রহ্মসংহিতার ঐ শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণের আবাস গোলোকের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে যে তার ভূমি চিন্তামণিময় এবং সমস্ত বৃক্ষগুলিই কল্পবৃক্ষ, সমস্ত গাভীই সুরভী গাভী ঃ *চিন্তামণি প্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ/লক্ষাবৃতেষু সুরভিরভিপালয়ন্তম্।*

■ এই পৃথিবীতে লীলাবিলাসকালে শ্রীকৃষ্ণ যখন দুরাচারী নরকাসুরকে বধ করেন, তখন তার কারাগৃহে বন্দী ১৬০০০ রাজকন্যা তাদেরকে গ্রহণ করার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ করে তাদের সকলকে দ্বারকায় নিয়ে যান এবং প্রত্যেকের জন্য একটি করে অত্যন্ত সুরম্য বিশাল অট্টালিকার ব্যবস্থা করেন, এইরকম প্রত্যেক প্রাসাদে ছিল শোভাময় মোজেইক-রাস্তা, সুন্দর উদ্যান, হাজার হাজার দাস-দাসী, মণি-রত্নখচিত অনন্যসুন্দর আসবাবপত্র।

বৈকুণ্ঠ জগতের গ্রহলোকগুলিতে ঐরকম কোটি কোটি অতিসুরম্য অট্টালিকা ও মহা-ঐশ্বর্য বিদ্যমান, এবং শ্রীকৃষ্ণই সকল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর।

শ্রীকৃষ্ণ ঃ পরম বৈরাগ্যবান

কেউ যখন উপরোক্ত ঐশ্বর্যগুলির একটিরও অধিকারী হয়, তখন স্বভাবতই সে ঐগুলির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ও গর্বিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ঐ সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ বিন্দু মাত্রও ঐসবের প্রতি আসক্ত নন। এইভাবে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যটিরও অধিকারী হন ঃ বৈরাগ্য। কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ

■ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় পাণ্ডবদের জন্য সামান্য দূত হিসাবে দুর্যোধনের কাছে যান। যিনি লক্ষ্মীপতি, মাধব, সেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর সখা অর্জুনের রথের সারথ্য বরণ করে অর্জুনের কথামত রথ চালনা করতে থাকেন। মহৈশ্বর্য-শালী শ্রীকৃষ্ণ এতই সুন্দর যে, যে তাঁকে ভালবাসে, তিনি নিজেকে পর্যন্ত তার কাছে বিকিয়ে দেন।

■ মহাভারতে, যখন রাজসূর্য যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের সংগে পরামর্শ করার পর তার বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনদের বিভিন্ন সেবা করার ভার দেন। ভীষ্ম-দ্রোণের উপর যজ্ঞ তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে, দুঃশাসনের উপর খাদ্য বিতরণের ভার ন্যস্ত হয়, অশ্বত্থামাকে অনুরোধ করা হয় অভ্যাগত ব্রাহ্মণদের দেখাশুনা করার জন্য, দুর্যোধনের উপর ভার ছিল যুধিষ্ঠিরের জন্য আনীত সমস্ত উপহারগুলি গ্রহণ করার। বিদুর হয়েছিলেন কোষাধ্যক্ষ। সমস্ত অভ্যাগত অতিথিবর্গ ও ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ লাভের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিগতভাবে তাদের পদ ধৌত করার ভার নেন ও গভীর যত্ন সহকারে সেই দায়িত্ব সম্পাদন করেন। এইভাবে পরম ঐশ্বর্যশালী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন।

■ শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হন, তখন সুন্দরী সুবিনীতা স্ত্রী ও পরম স্নেহশীলা মাতৃদেবীকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

ভগবান কে

বাইবেলে যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বরের দূত বলেছেন। কোরানে মহম্মদ নিজেকে ধর্মপ্রচারক বা আল্লাহ্-এর দূত বলেছেন। এঁদের কেউই নিজেকে ভগবান বলে দাবী করেননি। তাহলে ভগবান কে? একমাত্র ভগবানই এই প্রশ্নের উত্তর জানেন এবং আমাদের উচিত স্বয়ং তাঁর কাছ থেকেই শ্রবণ করা (*শব্দ-প্রমাণ*)। **আমরা যেমন পূর্ব-আলোচনায় দেখেছি, বৈদিক শাস্ত্রের সারাতিসার ভগবদ্গীতা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সব কিছুর পরম উৎস, দেবতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ পরম ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেছেন।** দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকে ভেবে থাকেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একজন সাধারণ মানুষ এবং কেউ কেউ স্বীকার করেন যে শ্রীকৃষ্ণ কিছু অলৌকিক শক্তির অধিকারী একজন অতিমানব ছিলেন। **কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ কোন সাধারণ মানব নন, তিনি অতিমানবও বা অসাধারণ কোন ব্যক্তিত্ত নন। তিনি পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং।**

ভগবান সবিশেষ, সাকার না নির্বিশেষ, নিরাকার?

সংজ্ঞানুসারে, ভগবান পূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ। যদি কেউ বলে, 'ভগবান কেবল নির্বিশেষ, নিরাকার, তিনি সবিশেষ, রূপযুক্ত হতে পারেন না,' তিনি তার এই উক্তির দ্বারা ভগবানকে সীমিত করেছেন। ভগবান যদি রূপহীন নিরাকার হতেন, তাঁর সৃষ্টির থেকে কোন অংশে ন্যুন হতেন, তাহলে তিনি পূর্ণ হতে পারতেন না। যিনি সমগ্র, পূর্ণ, তার মধ্যে অবশ্যই আমাদের অনুভব-অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে যাকিছু আছে এবং তার বাইরেও যা-কিছু আছে, সবকিছুই তার মধ্যে থাকতে হবে, তা না হলে তিনি 'পূর্ণ' হতে পারেন না। সুতরাং ভগবানকে ন্যূনতা রহিত, পূর্ণ হতে হলে তাঁকে অবশ্যই হতে হবে সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়ই।

শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে ভগবান তিনটি রূপে বিরাজমান — **ব্রহ্ম, পরমাত্মা** এবং **ভগবান** ঃ

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

"যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরম-তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান — এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।"

ব্রহ্ম হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি যাকে সূর্যালোক বা সূর্যের শক্তির সংগে তুলনা করা যেতে পারে। সূর্য নিয়ে অধ্যয়নরত যেসব সাধারণ ছাত্র কেবল সূর্যালোক — মহাকাশে সূর্যের কিরণরাশির মহাবিস্তার, এর নির্বিশেষ আকারহীন ধরণের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিচ্ছটা উপলব্ধি করেই তৃপ্ত থাকে, তাদেরকে তুলনা করা যেতে পারে অধ্যাত্মবিদ্যার সেই সব বিদ্যার্থীদের সংগে, যাঁরা কেবল পরমসত্যের নির্বিশেষ ব্রহ্ম-বিভাবটি উপলব্ধি করে। নিরাকার ব্রহ্ম বা নির্বিশেষ সর্বব্যাপী ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় অঙ্গ-নিঃসৃত রশ্মিচ্ছটা বা অঙ্গজ্যোতি।

"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য-দ্বারা পৃথক-কৃত, নিষ্কল (জড়-উপাদান-গুণাদি কলুষ-রহিত), অনন্ত (সর্বব্যাপী), অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁর অঙ্গ-প্রভা হতে উৎপন্ন হয়েছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"
— *ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪০*

'জ্ঞানী'রা ভগবানের এই সর্বব্যাপী নির্বিশেষ ব্রহ্ম-রূপের উপলব্ধি লাভ করে থাকেন — ব্রহ্ম-বিভাবের অনুভব হচ্ছে তাঁদের উপলব্ধির চরম সীমা।

পরমাত্মা হচ্ছেন প্রতি-স্থানে বিরাজিত ভগবানের সর্বব্যাপী অংশ প্রকাশ, যিনি প্রতিটি পরমাণুতে বিদ্যমান, এবং

একইভাবে প্রতিটি জীবের হৃদয়েও বিরাজমান। সূর্য-সম্পর্কে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে সেসব ছাত্র আরেকটু অগ্রসর হয়েছে, তারা জানতে পারে যে সূর্য কেবল সর্বব্যাপ্ত নিরাকার আলোক-প্রকাশই নয়, এটি একটি গোলাকার বস্তু, একটি গোলক-বিশেষ। এভাবে তারা সূর্যমণ্ডল-এর জ্ঞানলাভ করে, যাকে তুলনা করা যেতে পারে পরমতত্ত্বের পরমাত্মা-রূপের উপলব্ধির সংগে। যোগী ধ্যান-অভ্যাসের মাধ্যমে নিজের হৃদয়ে বিরাজিত ভগবানের অংশ প্রকাশ পরমাত্মা রূপ অবলোকন করেন। এই পরমাত্মা হচ্ছেন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি, যিনি সকল পরমাণুনিচয়ে এবং নিখিল জীবনিচয়ের হৃদয়ে বিরাজমান (*'অণ্ডান্তরস্থং পরমাণুচয়ান্তরস্থং'* — ব্রহ্মসংহিতা)।

ভগবান হচ্ছেন পরমতত্ত্বের চরম উপলব্ধি এবং চিন্ময় তত্ত্বের পরম সারাতিসার। যে ছাত্র সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে সূর্যের নিয়ন্ত্রণ-ভার-প্রাপ্ত দেবতা সূর্যদেবের দর্শনলাভ করতে পারে, তাঁর সংগে তাঁদের তুলনা করা যেতে পারে, যাঁরা পরম সত্য-তত্ত্বের সবিশেষ সাকার রূপের দর্শন লাভ করেন। **ভগবান হচ্ছেন পরম মহিমময় পূর্ণসৌন্দর্যশালী ললিত-ত্রিভঙ্গ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ (শ্যামসুন্দর)। পরমতত্ত্বের এই ভগবদ্-রূপের উপলব্ধির মধ্যে ভগবানের ব্রহ্ম ও পরমাত্মা বিভাব-এর উপলব্ধি নিহিত রয়েছে, ঠিক যেমন আপনি যদি একবার সূর্যকে মুখোমুখি দর্শন করেন, আপনি তখন অবগত হন যে এই সূর্যই হচ্ছে মহাবিস্তারশীল সূর্যালোক এবং আয়নায় প্রতিবিম্বিত সূর্যের ছবির মূল উৎস।**

বাইবেলের ইজিকিয়েল (১.২৬)-এ বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবানের রূপের সাথে "মানব-রূপের সাদৃশ্য" রয়েছে (*দি সেমব্লান্স্ অব্ হিউম্যান ফর্ম*)। বাইবেলের জেনেসিসে ১৮ ও ১৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ইজরায়েলের জাতির জনক আব্রাহামের সামনে ভগবান আবির্ভূত হন। এখানে তিনি তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন মানব-রূপে, যদিও বিশদভাবে ঐ মানব-রূপ বর্ণিত হয় নি। বাইবেলে আমরা এইসব বিবরণও পাঠ করি, "*তাঁর (ঈশ্বরের) পদতলে*" (এক্সোডাস ২৪.১০); "ঈশ্বরের আঙুল-দ্বারা খোদিত" (এক্সোডাস ৩১.১৮); "প্রভুর হস্ত" (এক্সোডাস ৯.৩); "প্রভুর চক্ষু" (জেনেসিস ৩৮.৭); "প্রভুর কর্ণ" (নাম্বারস্ ১১.১)। বাইবেলের আরেকটি প্রখ্যাত বাক্য — "মানবের সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের রূপ অনুসারে" (*ম্যান হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড ইন্ দ্য ইমেজ অব্ গড*)" দ্ব্যর্থহীনভাবে ভগবানের সাকার রূপের ইঙ্গিত দেয়। যীশু ভগবানকে এইসব সম্বোধনে সম্বোধিত করতেন — "আব্বা, পিতা", যা একান্তভাবেই সবিশেষ। ইসলামী সাধকগণও ঘোষণা করেন যে আল্লাহ্-এর রূপ রয়েছে। এমনকি বাইবেলে সাকার সবিশেষ ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে, আমরা উপরে যেমন দেখেছি। ঈশ্বর যদি নৈর্ব্যক্তিক হন, তাহলে কিভাবে তাঁর হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, আঙুল — ইত্যাদি থাকতে পারে?

বাইবেল ও কোরাণের বহু পূর্ব হতে অত্যন্ত উন্নত আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডিত ভারতের প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য সুনির্দিষ্টভাবে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা ও তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করেছে। অবশ্য, ভগবানের গুণ-বৈশিষ্ট্য অসীম, অন্তহীন শব্দসম্ভার কেবল তাঁর দুর্বিজ্ঞেয় অনন্ত মহিমার কিছু আভাস-মাত্র দান করতে পারে। এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে ভগবানের রূপ আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর কদর্য জড় দেহের মতো নয়,—যা রক্ত, মাংস ও মুত্র-বিষ্ঠার একটি থলি ছাড়া কিছুই নয়। পরমপুরুষ ভগবানের দেহাবয়ব সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় (অচিৎ—জড়-উপাদান রহিত), এবং জড় ইন্দ্রিয়ের আগোচর। কিন্তু তবুও, সেটি একটি শরীর।

'ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নম ঃ।'
'ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় ...।' (*গোপালতাপনী* উপনিষদ ১/১, ১/২)

"আমি সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি, যাঁর রূপ (দেহ) সৎ (নিত্য), চিৎ (জ্ঞানময়) ও আনন্দময়।"

ব্রহ্মসংহিতায় প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

"শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর শ্রীবিগ্রহ অর্থাৎ শ্রীদেহ সৎ-চিৎ-আনন্দ-ঘন, অর্থাৎ নিত্য শাশ্বত, চিন্ময় বা জ্ঞানময় এবং চিদানন্দময়। তাঁর কোনও আদি নেই। কারণ তিনিই অনাদির আদি, সব কিছুর উৎস। তিনিই সর্বকারণের আদি কারণ, সকল অস্তিত্বের পরম উৎস।"

'বিগ্রহ' শব্দটির অর্থ দেহাবয়ব, শরীর। এছাড়াও ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে (৫/৩১) ঃ

আলোলচন্দ্রক লসদ্বনমাল্যবংশী
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং
গোবিন্দং আদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

"দোলিত চন্দ্রক-শোভিত বনমালা যাঁর গলদেশে, বংশী ও রত্নাঙ্গদ যাঁর করদ্বয়ে, যিনি সর্বদা প্রেণয়কেলিবিলাসযুক্ত, ললিত-ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর রূপই যাঁর নিত্য প্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥"

অতএব তাঁর শরীর সম্পূর্ণতঃই একজন সাধারণ মরণশীল মানুষের নশ্বর দেহের থেকে পৃথক। আমাদের দেহ ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর, এবং আমাদের অজ্ঞানতা ও দুঃখদুর্দশার আকর, কারণ।

শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন শ্রীবিগ্রহের বা দেহের যথার্থ স্বরূপ যাতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, সেজন্য আমরা শ্রীমদ্ভাগবত থেকে একটি দৃষ্টান্ত নিতে পারি। একবার শ্রীকৃষ্ণের মাতা যশোদামায়ী শিশু-রূপী-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে তাকিয়েছিলেন — শ্রীকৃষ্ণ মাটি খেয়েছিলেন কিনা তা দেখার জন্য। একজন সাধারণ মরণশীল মানব শিশুর মুখের ভিতর তাকালে তিনি কি দেখতে পেতেন? মুখগহ্বর, যাতে দাঁত, জিভ, তালু রয়েছে। কিন্তু যখন তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে তাকিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর মুখবিবরে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছিলেন। কৃষ্ণের মুখগহ্বরে মা যশোদা এমনকি নিজেকেও দেখতে পেলেন — তিনি কৃষ্ণের মুখের মধ্যে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন, সেই দৃশ্যও তিনি অবিকল বাস্তবের মতো রূপে কৃষ্ণের মুখবিবরে দেখলেন। এই দৃষ্টান্তটি এটাই প্রমাণ করে যে কৃষ্ণ যদিও মা যশোদার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, একই সংগে, যুগপৎ তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে রয়েছেন।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, যিনি কৃষ্ণ-প্রেম রূপ মকরন্দ-সুধা ভরা পাত্রের ঢাকনাটি খুলে সারা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে তার দিব্য আস্বাদন লাভের সুযোগকে সুলভ করেছেন, তাঁর সমস্ত গ্রন্থাবলীতে ভগবানকে বোঝাতে কেবল "ভগবান" (গড্) শব্দটি ব্যবহারের পরিবর্তে এই শব্দগুলি ব্যবহার করতেন — 'পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান' (*'দি সুপ্রীম্ পার্সোন্যালিটি অব্ গডহেড'*)। যখন আপনি বলেন, 'পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান', তখন এই কথায় ভগবানের দেহাবয়ব ও ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে। পরমেশ্বর (Goodhead) শব্দের অর্থ হচ্ছে তিনি পরম ঈশ্বর (*Supreme God — ক্যাপিটাল 'G' সহ*), যিনি অন্য সকল নিয়ন্তা বা ঈশ্বরের (gods — স্মল 'g'-যুক্ত, অর্থাৎ সমস্ত দেবদেবী) পরিচালক ও নিয়ন্তা প্রভু (*' – head'*)।

শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরতার প্রমাণ

শ্রীকৃষ্ণ ঃ সবকিছুর উৎস

ভগবান এক, অদ্বিতীয় যাঁর থেকে সবকিছু নিঃসৃত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন ঃ

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজতে মাং বুধাভাবসমন্বিতাঃ॥

"আমি জড় এবং চেতন জগতের সবকিছুর উৎস। সব কিছুই আমার থেকে প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে যাঁরা শুদ্ধভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন, তাঁরাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী।" (ভ.গী. — ১০/৮)

এতদযোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

"আমার এই উভয় প্রকৃতি থেকে জড় ও চেতন সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে। অতএব আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ।" (ভ.গী. ৭/৬)

শ্রীকৃষ্ণ ঃ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের উৎস

বুদ্ধিঃ জ্ঞানং অসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভাবঃ অভাবঃ ভয়ং চ অভয়ং এব চ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ তপো দানং যশোঃ অযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ॥

(ভ.গী. ১০/৪-৫)

"বুদ্ধি, জ্ঞান, মোহমুক্তি, ক্ষমা, সত্য, বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের সংযম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু ভয়, অভয়, অহিংসা, সমচিত্ততা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, ধর্ম-নিমিত্ত কীর্তি ও অধর্ম-নিমিত্ত অকীর্তি — এই সবই আমার থেকেই উৎপন্ন হয়।"

ভীষ্মদেব (দ্বাদশ মহাজনের একজন) 'বিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্রে' শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করেছেন এইভাবে ঃ

ন ক্রোধ ন চ মাৎসর্য ন লোভো নাশুভ মতিম্।
ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে॥
ধ্যায়ুঃ সচন্দ্রক নক্ষত্রকং দিশো ভূর্মহোদধিঃ।
বাসুদেবস্য বীর্যেন বিধ্রুতানি মহাত্মনঃ॥
সসুরাসুর গন্ধর্বং স যক্ষোরগ রাক্ষসম্।
জগদ্বশে বর্ততেদং কৃষ্ণস্য সচরাচরম্॥

(*বিষ্ণু সহস্রনাম* — ১৩/১৫)

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যকীর্তি ভক্তবৃন্দের কোনো প্রকার ক্রোধ নেই, মাৎসর্য (পরশ্রীকাতরতা) নেই; তাদের লোভ নেই, এবং অপরের অমঙ্গল উৎপন্ন করার কোনো দুর্মতিও নেই। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, আকাশ, দিক্‌সমূহ,

পৃথিবী, মহাসাগর সবই কৃষ্ণের শক্তিতে স্থিত। সুরগণ (দেবদেবী), অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস এবং অন্য সকল সচর ও অচর অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গম জীব-সমাকুল এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিয়ন্ত্রণাধীন।"

শ্রীকৃষ্ণ ঃ সকল জীবের পিতা

চলমান ও স্থির গ্রহ-নক্ষত্র-জীব সমাকুল এই সমগ্র মহাবিশ্ব কৃষ্ণের বিভিন্ন শক্তিরাজির কার্যের দ্বারা প্রকাশিত বা অভিব্যক্ত হয়। জড় জগতে আমরা বিভিন্ন জীবের সংগে বিভিন্ন রকম সম্পর্ক গড়ে তুলি, যাঁরা কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি (*Marginal Energy*) ছাড়া অর কিছু নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি (External Potency) জড়া 'প্রকৃতি'র সৃষ্টির মাধ্যমে কিছু জীব সত্তা আমাদের পিতা, মাতা পিতামহ, তাদের স্রষ্টা — ইত্যাদি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেবল আমাদের পিতা-মাতাই শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ অংশ নন, তাঁদের স্রষ্টা — পিতামহ, পিতামহী ও মাতামহ এবং মাতামহী-ইত্যাদি,সকলেই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। শ্রীকৃষ্ণ বলেন ঃ ***পিতাহমস্য জগতঃ মাতা ধাতা পিতামহঃ*** (ভ. গী. ৯/১৭) — ***আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (ধারণকর্তা) এবং পিতামহ।*** এই ব্রহ্মাণ্ডের জীব সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বংশতত্ত্বগত ইতিহাস শ্রীকৃষ্ণ প্রদান করেছেন ভগবদ্গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকে ঃ

মহর্ষয়ঃসপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাংলোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ (ভ.গী. ১০/৬)

"সপ্ত মহর্ষি, তাঁদের পূর্বজাত সনকাদি চার কুমার এবং চতুর্দশ মনু, সকলেই আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এবং এই জগতের স্থাবর-জঙ্গম আদি সমস্ত প্রজা তাঁরাই সৃষ্টি করেছেন।"

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ (ভ.গী. ১৪/৪)

"হে কৌন্তেয়, সমস্ত যোনিতে যত মূর্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপ যোনিই তাদের জননী স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।"

শ্রীকৃষ্ণ ঃ সমস্ত অবতারগণের উৎস

ভগবান আমাদের মধ্যে অবতার-রূপে অবতীর্ণ হন। আর, তিনি অবতীর্ণ হবার পূর্বেই শাস্ত্রে সেই অবতারের উল্লেখ থাকে। **ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন শাস্ত্রে তার উল্লেখ ছিল। ঋগ্বেদে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীনন্দন কৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে এবং এমন আরো বহু শাস্ত্রে রয়েছে।** বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের আড়াই হাজার বছর পূর্বে **শ্রীমদ্ভাগবতে** ভবিষ্যদ্বাণী করা ছিল যে তিনি গয়া নামক প্রদেশে আবির্ভূত হবেন। তাঁর মাতার নাম এবং তাঁর কার্যাবলীর কথা আড়াই হাজার বছর পূর্বেই ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছিল (ভাঃ ১/৩/২৪)। **অথর্ববেদের চৈতন্য উপনিষদ অংশে তাঁর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল (পরিশিষ্ট দেখুন)।**

শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর ভগবানের ২২ জন অবতারের একটি তালিকা রয়েছে, কিন্তু সেখানে বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আদিপুরুষ, যাঁর থেকে অন্য সকল অবতার প্রকাশিত হয় ঃ

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ (ভাঃ ১/৩/২৮)

"পূর্বোল্লিখিত এই সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা কলা অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। যখন নাস্তিকদের অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন আস্তিকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন।"

ব্রহ্মসংহিতায় (শ্লোক.৪৬) বলা হয়েছে ঃ

দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতু সমানধর্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

"যখন একটি প্রদীপের জ্যোতি বিস্তৃত হয়ে অন্যত্র অবস্থিত আরেকটি প্রদীপের প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন দ্বিতীয় প্রদীপটি পৃথক্‌ভাবে জ্বলতে থাকে, আর এর জ্যোতি মূল প্রদীপটিরও মতোই সম-ঔজ্জ্বল্য-বিশিষ্ট হয়। ঠিক তেমনি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ (কৃষ্ণ) নিজেকে বিষ্ণুরূপে বিভিন্ন ভগবদ্‌-মূর্তিতে বিস্তৃত করেন, এবং ঐ ভগবদ্রূপ আদিরূপের বিস্তার হওয়ার জন্য ঐ আদিরূপের (কৃষ্ণের) মতোই জ্যোতির্ময়, শক্তিমন্ত এবং ঐশ্বর্যশালী। আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।"

<u>শ্রীকৃষ্ণ ঃ সকল দেবদেবীর উৎস</u>

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল দেবদেবী — শিব-ব্রহ্মা আদি সকলের উৎস। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ এই তথ্য সমর্থন করেছেন যে তিনিই সকল দেবদেবীর আদি উৎস ঃ

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীনাং চ সর্বশঃ॥ (ভ.গী. ১৪/৪)

"দেবতারা বা মহর্ষিরাও আমার উৎপত্তি অবগত হতে পারেন না। কারণ আমি দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ।"

সকল বৈদিক শাস্ত্রে এই তথ্য সমর্থিত হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব-আদি সকল দেবগণের উৎস। অথর্ব-বেদে বলা হয়েছে,

যো ব্রাহ্মণং বিদধাতিঃ পূর্বং যো বৈ
বেদংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ

"যিনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান উপদেশ করেছিলেন এবং পূর্বে বৈদিক জ্ঞান বিস্তার করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণই।" তারপর পুনরায় বলা হয়েছে,

অথ-পুরুষোঃ বৈ নারায়ণোঃ অকাম্যতা
প্রজাঃ সৃজেয়েতি উপক্রম্য।

"তখন পরমপুরুষ ভগবান শ্রীনারায়ণ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন।"

নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদ্ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে,
নারায়ণাদ্ ইন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদ্ অষ্টৌ বাসবো জায়ন্তে,
নারায়ণাদ্ একাদশ রুদ্র জায়ন্তে, নারায়ণাদ্ দ্বাদশাদিত্যাঃ॥

"নারায়ণ থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়, নারায়ণ থেকে সমস্ত প্রজা-সৃষ্টা প্রজাপতিগণেরও জন্ম হয়। নারায়ণ থেকে ইন্দ্রের জন্ম হয়, নারায়ণ হতে অষ্ট বসুর জন্ম হয়। নারায়ণ হতে একাদশ রুদ্রের জন্ম হয়, নারায়ণ থেকে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়।"

ব্রহ্মণ্যো দেবকী-পুত্রঃ।'

দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

একো বৈ নারায়ণ আসীন্ ন ব্রহ্মা না ঈশানো নাপো নাগ্নি
সমৌ নেমে দ্যবা পৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্যঃ স একাকী
ন রমতে তস্য ধ্যানন্তঃ স্থাস্য যত্র ছন্দোগৈঃ
ক্রিয়মানাষ্টকাদি-সংজ্ঞক স্তুতি-স্তোমঃ স্তোমম্ উচ্যতে।

'সৃষ্টির আদিতে কেবল পরম পুরুষ নারায়ণ ছিলেন। ব্রহ্মা ছিলেন না শিব ছিলেন না, অগ্নি ছিলেন না, আকাশে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ছিল না। কেবল শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, যিনি সব কিছু সৃজন করেন এবং রমণ করেন।"
(মহা উপনিষদ-১)

বরাহপুরাণে বলা হয়েছে,

নারায়ণঃ পরো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ।
তস্মাদ্ রুদ্রোঽভবদ্ দেবঃ স চ সর্বজ্ঞতাং গতঃ॥

'নারায়ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তাঁর থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়, তাঁর থেকে শিবের জন্ম হয়।'

কৃষ্ণ এবং বিষ্ণু ঃ কৃষ্ণ কি বিষ্ণুর অবতার?

কখনো কখনো অনেক অ-তত্ত্বজ্ঞ মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে দশাবতারের এক অবতার বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে কৃষ্ণ হচ্ছেন সকল পুরুষাবতার বা বিষ্ণুমূর্তিসমূহের উৎস — মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু — সকলের উৎস। সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ প্রকাশ। ২৪ জন লীলাবতার রয়েছেন — যেমন, মৎস, কূর্ম, নৃসিংহ ইত্যাদি। অনন্ত কাল ধরে অসীম, অগণিত জড় ব্রহ্মাণ্ড-সমূহে এইসব অবতারের প্রকাশ হয়, কিন্তু এঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ, কলা, শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ প্রকাশ-বিস্তার। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই সত্য ঘোষিত হয়েছে (ভাঃ ১/৩/২৮) ঃ

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

"পূর্বোল্লিখিত এই সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা কলা অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। যখন নাস্তিকদের অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন আস্তিকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন।"

বৈদিক সাহিত্যে নারায়ণ ও বিষ্ণুর নামই সাধারণতঃ বেশি লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ হচ্ছে সৃজন, পালন ও সংহার কার্যে শ্রীকৃষ্ণ কখনই প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন না। তিনি এ-সব হতে সর্বদাই দূরে অবস্থান করেন এবং তাঁর নিজ ধামে নিরন্তর লীলাবিলাস উপভোগ করেন, আনন্দ সম্ভোগ করেন। তিনি জড় ব্রহ্মাণ্ডের সকল কার্যাবলী সম্পাদন করেন তাঁর প্রকাশসমূহের মাধ্যমে, তাঁর পুরুষাবতার-সমূহের মাধ্যমে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপনি, ধরা যাক এক হাজার কোম্পানীর মালিক। কিন্তু আপনাকে এজন্য প্রত্যেক কোম্পানীতে ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে কোম্পানীর তত্ত্বাবধান করতে হয় না। প্রত্যেক কোম্পানীতে কোম্পানীর কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য আপনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগ করেছেন, তাঁরাই সবকিছুর তত্ত্বাবধান করছে, আর আপনি আপনার বাড়ীতে আরামকেদারায় হেলান দিয়ে আরাম করছেন, আনন্দ উপভোগ করছেন। কখনো আপনি এক হাজারের যে কোন একটি কোম্পানী পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সেজন্য আপনি একটি ফোন-কল করেন এবং সেখানে পৌছান। যখন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আপনাকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা করে আপনাকে ভিতরে নিয়ে যান, তখন সেখানকার কর্মচারীরা আপনাকে চিনতে নাও পারে। তারা হয়ত ভাববে যে আপনি একজন নিশ্চিত গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী কোন ব্যক্তি, হয়ত ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সহকারী। ঠিক তেমনি যখন শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের কোনো ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হন, তিনি বিষ্ণুর মাধ্যমে আসেন, এবং সেজন্য তাঁকে অনেক সময় ভুল করে বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করা হয়। এই জড় জগতে যত অবতার অবতীর্ণ হন, সকলেই অবতীর্ণ হন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর মাধ্যমে (তৃতীয় পুরুষাবতার)। কেন? কারণ এই পুরুষাবতার জীবের পালন-পোষণে সর্বক্ষণ নিয়োজিত।

একবার এই ধৈরিত্রী অত্যন্ত অসুর-ভারাক্রান্তা হলে ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবগণ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর নিকটে গিয়ে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে তাঁর স্তব করেন। তারপর ব্রহ্মা উপবিষ্ট হয়ে ধ্যান-নিমগ্ন হন, এবং তাঁর হৃদয়ে তিনি শ্রীবিষ্ণুর বাণী শ্রবণ করেন। ব্রহ্মা তখন সেই বাণী দেবতাগণকে জানান। এই হচ্ছে বৈদিক জ্ঞান লাভ করার যথাযথ পন্থা। ব্রহ্মাকে শ্রীবিষ্ণু যে বার্তা জ্ঞাপন করেন, তা ছিল এই রকম ঃ **পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই তাঁর স্বরূপ-শক্তিরাজি সহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন, এবং যতদিন তিনি ভক্তদের রক্ষা ও অসুরদের বিনাশ কার্যের জন্য পৃথিবীতে অবস্থান করবেন, দেবগণও যেন তাঁকে সহায়তা করার জন্য সেখানে উপস্থিত থাকেন। তাঁরা সকলেই যেন অবিলম্বে যদু বংশে জন্মগ্রহণ করে, যে-বংশে ভগবান যথাকালে আবির্ভূত হবেন।** ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর এই বাণীর দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সকল বিষ্ণুতত্ত্বসমূহের উৎস।

কৃষ্ণ যখন তাঁর স্ব-আবাসে তাঁর স্বাভাবিক নিত্য-স্বরূপে বিরাজ করেন, তখন তিনি ক্রীড়াকৌতুক করেন, সখাদের সংগে মল্লযুদ্ধ করেন, তাঁর শুদ্ধ ভক্ত-পরিকরগণের সংগে ভগবান কৃষ্ণ কত ধরণের আনন্দবিলাস করে বিহার করেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁর অংশাবতার মহাবিষ্ণু রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন তিনি এক অত্যন্ত গুরুতর কর্ম সম্পাদনে রত হন, কারণ সমুদ্রে শায়িত হয়ে কোটি কোটি জড় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি। সুতরাং কৃষ্ণের সংগে বিষ্ণুর পার্থক্য ঠিক একজন রাজসভার মহারাজার সংগে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগত মহারাজার মতো। যখন রাজা সভাগৃহে থাকেন, তখন তিনি তাঁর শাসনকর্তাদের সাহায্যে সমস্ত রাজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনায় ও নানাবিধ কর্তব্যকর্মে নিমগ্ন থাকেন। কিন্তু তিনি যখন প্রাসাদে বিরাজ করেন, তখন তিনি তাঁর নিজ পরিবার-পরিজনের সংগে আমোদ-প্রমোদ করেন, তখন তাঁর কোনো গুরুগম্ভীর কর্তব্য-ভার থাকে না। তিনি তাঁর শিশুকে পিঠে চাপাতে পারেন, প্রিয়ার ভর্ৎসনা-বাক্য শুনতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন পুনরায় রাজকার্যে নিয়োজিত হন, তখন তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয় — দুষ্কৃতীদের দণ্ডদান, প্রজাপালন, শত্রুবিনাশ ইত্যাদি। কৃষ্ণ ও বিষ্ণু অভিন্ন। কেবল ভক্তদের সংগে প্রীতিবিনিময়ের ক্ষেত্রে উভয়ের সম্বন্ধজাত রসের তারতম্য রয়েছে (এছাড়া, শাস্ত্রানুসারে অনন্ত গুণশালী বিষ্ণু বা নারায়ণের ৬০টি বিশেষ গুণ রয়েছে, আর শ্রীকৃষ্ণের ঐ ৬০টি ছাড়াও আরো ৪টি বিশেষ গুণ রয়েছে, যা কোনো বিষ্ণু-মূর্তিতেই নেই। এই গুণগুলী হচ্ছে ঃ কৃষ্ণের মহাবিস্ময়কর বেণুমাধুর্য, রূপমাধুর্য, লীলামাধুর্য এবং মহাপ্রেমপর ভক্ত পরিবৃত থাকা)।

জীবসত্তাসমূহের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ **১. শান্ত; ২. দাস্য; ৩. সখ্য; ৪. বাৎসল্য ৫. মাধুর্য।** যেখানে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম মিশ্রিত (ঐশ্বর্য-জ্ঞানযুক্ত), কৃষ্ণের প্রতি, প্রীতি ঐশ্বর্য-জ্ঞানলেশশূণ্য পরিপূর্ণ মাধুর্য-ভাব মণ্ডিত এবং পরম আস্বাদ্য।

তাঁর থেকে আর কেউ শ্রেষ্ঠতর নেই, সেই সত্য ঘোষণা করে ভগবদ্‌গীতায় দ্ব্যর্থহীনভাবে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ (ভ.গী. ৭/৭)

"হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। সূত্রে যেমন মণিসমূহ গাঁথা থাকে, তেমনই সমস্ত বিশ্বই আমাতে ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থান করে।"

ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণের পরম শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত

ভগবদ্গীতার ১০ম অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেন ঃ

শ্লোক ১২ ঃ
অর্জুন উবাচ
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥

শ্লোক ১৩ ঃ
আহুস্ত্বামৃষয় সর্বে দেবর্ষি নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥

শ্লোক ১৪ ঃ
সর্বমেতদ্ ঋতং মন্যে যস্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥

"অর্জুন বললেন — তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, পরম পুরুষ, নিত্য আদি দেব, অজ ও বিভু। দেবর্ষি নারদ অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরা সেইভাবে তোমাক বর্ণনা করেছেন, এবং তুমি নিজেও এখন আমাকে তা বলছ। হে কেশব, তুমি আমাকে যা বলেছ, তা আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবান, দেবতা অথবা দানবেরা কেউই তোমার তত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত নন।"

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিকট থেকে ভগবদ্গীতা শ্রবণের পর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পরম ব্রহ্ম বলে স্বীকার করেন। প্রত্যেক জীবসত্তাই ব্রহ্ম, কিন্তু পরম জীবসত্তা, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম। 'পরম ধাম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, ভগবান হচ্ছেন সবকিছুর পরম আশ্রয়, পরম নিবাস। 'পবিত্রম্' শব্দের অর্থ হচ্ছে, তিনি নিষ্কল, নির্মল — অর্থাৎ সম্পূর্ণ জড়কলুষ শূন্য শুদ্ধ, পবিত্র। 'পুরুষম্' — শব্দের অর্থ তিনি পরম ভোক্তা। 'দিব্যম্' — তিনি চিন্ময়, অ-জড়, 'আদি দেবম্' — তিনি সকল দেবগণের আদি উৎস, পরমেশ্বর, 'অজম্', — তিনি জন্মরহিত — তিনি জন্মগ্রহণ করেন না, আবির্ভূত হন মাত্র। 'বিভুম্' — যিনি মহত্তম, সর্বব্যাপী।

এখন কেউ হয়ত ভাবতে পারে, 'ও, শ্রীকৃষ্ণ তো অর্জুনের সখা, বন্ধু, আর — সেজন্যই প্রীতিবশতঃ অর্জুন তাঁর সম্বন্ধে এত কথা বলছেন।" কিন্তু ভগবদ্গীতার পাঠকবর্গের মন থেকে সন্দেহ নিরসন করার জন্য অর্জুন পরের শ্লোকেই তাঁর উক্তির সত্যতা প্রতিপাদন করেন, যখন তিনি বলেন যে কেবল তিনিই নন, শ্রীকৃষ্ণই যে পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান, সেই সত্য নারদ, অসিত-দেবল, ব্যাস-আদি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ও সর্বজনমান্য মহান ঋষিবর্গের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এঁরা হচ্ছেন সেই সব তত্ত্বদর্শী মহাত্মা যাঁরা বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করেছেন এবং সমস্ত প্রামাণিক আচার্যবর্গের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছেন (নারদ ও ব্যাসদেব দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম)। সেজন্য অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেন যে তিনি তাঁকে যা বলেছেন, তিনি তা সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করছেন ঃ *সর্বম্ এতদ্ ঋতং*

মনে — "তুমি যা বলছ তা সবই সত্য বলে আমি স্বীকার করছি।" অর্জুন আরো বলেন যে ভগবানকে উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুরুহ, এমনকি দেবগণও ভগবানকে অবগত নন। তাহলে একজন মানুষ কিভাবে তাঁকে জানতে সমর্থ হবে, যদি সে তাঁর ভক্ত না হয়?

সেইজন্য, ভগবদ্‌গীতাকে গ্রহণ করতে হবে ভক্তিপূর্ণ মনোভাবে। কারো এমন চিন্তা করা উচিত নয় সে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একজন সাধারণ মানুষ, অথবা এক অত্যন্ত মহান পুরুষ। ভগবদ্‌গীতা যিনি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছেন সেই অর্জুনের উক্তি অনুসারে, অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। **সুতরাং আমাদের উচিত, অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করা, এবং ঐরকম বিনয়পূর্ণ মনোভাবে পাঠ করলে** আমরা ভগবদ্‌গীতা উপলব্ধি করতে পারি। কেউ যদি শ্রদ্ধাবান ও বিনয়ী না হন, তাহলে তাঁর পক্ষে ভগবদ্‌গীতা উপলব্ধি করা খুবই কষ্টকর হবে, কারণ এটি একটি রহস্যময় তত্ত্ববিজ্ঞান (ভগবদ্‌গীতাতেও সেই তথ্য প্রকাশ করে বলা হয়েছে — *শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং* ... *সংশয়াত্মা বিনশ্যতি* ... ভ.গী. — ৪/৩৯, ৪০)।

এইভাবে, আমরা দেখতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান, সেই তথ্যের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য অসংখ্য তথ্য ভগবদ্‌গীতাতে দেওয়া হয়েছে। আর যখন আমরা তাঁকে ভগবান বলে অবগত হই, তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কিভাবে তাঁকে প্রেম ও ভক্তির সংগে সেবা করতে হয়, তা শেখা। সেটাই হচ্ছে জীবনের পূর্ণতা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও কার্যকলাপ

ভগবদ্‌গীতায় (৪/৯) ভগবান চিন্ময় জগতে তাঁর ধাম হতে এই জড়জগতে অবতরণের বিশেষত্ব প্রকাশ করেছেন ঃ

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।"

শ্রীকৃষ্ণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানেন

ভগবদ্‌গীতায় (৪/৬), ভগবান তাঁর জন্মের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন যে তাঁকে একজন সাধারণ মানুষের মতো মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি তাঁর অতীতের বহু বহু "জন্ম" (আবির্ভাব) সম্বন্ধে সবকিছুই স্মরণ করতে পারেন, পক্ষান্তরে একজন সাধারণ মানুষ এমন কি কয়েক ঘন্টা পূর্বেও কি করেছে, তা ভাল করে স্মরণ করতে পারে না। যদি কাউকে বলতে বলা হয় যে ঠিক এই সময়ে সে গত কাল সে কি করছিল, তাহলে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেওয়া একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। একদিন পূর্বে এই সময়ে সে কি করছিল তা স্মরণ করতে তাঁকে স্মৃতি-হাতড়াতে হবে। তবুও প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন মানুষ নিজেদেরকে ভগবান বা কৃষ্ণ বলে জাহির করার দুঃসাহস করছে। এইধরণের ভিত্তিহীন দাবীর দ্বারা বিপথে পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অতীতের সমস্ত আবির্ভাব ও অপ্রকট সম্বন্ধে সচেতন, পক্ষান্তরে একজন সাধারণ মানুষ যখন আরেকটি দেহলাভ করে, তখন সে তার বর্তমান দেহকেন্দ্রিক সমস্ত ঘটনার কথা ভুলে যায়।

শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর দেহ অভিন্ন

আমরা আমাদের দেহ থেকে ভিন্ন, পৃথক; স্বরূপতঃ আমরা চিন্ময় আত্মা, আর শরীরটি হচ্ছে কেবল একটি জড় আবরণ। **কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দেহটি জড় নয় — এমনকি এই জড়জগতে অবতরণ কালেও; শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপ-দেহে তাঁর সচ্চিদানন্দময় দেহে এই জড় জগতে আবির্ভূত হন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সংগে তাঁর দেহের কোনো পার্থক্য নেই; তাঁর সমগ্র শরীরটিই অ-জড়, নিত্য, চিন্ময় ও আনন্দঘন।** ভগবান বলেন যে তিনি তাঁর স্ব-দেহে অবতীর্ণ হন। সাধারণ একটি জীবসত্তাকে যেমন দেহ পরিবর্তন করে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হতে হয়, ভগবানকে ওইরকম দেহ পরিবর্তন করতে হয় না। বদ্ধজীবের দেহান্তর হয়। তাকে এক দেহ ত্যাগ করে আরেকটি জড় দেহ ধারণ করতে হয়। ভগবান এইরকম জড়া প্রকৃতির অধীনে দেহান্তরের উর্দ্ধে; তিনি জড়া প্রকৃতির 'অধ্যক্ষ' (ভ. গী. ৯/১০), তিনি পরিচালক, নিয়ন্তা। যখনই তিনি জড় জগতে অবতীর্ণ হন, তিনি তাঁর সেই অভিন্ন মূল-শরীরে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে জড় জগতে আবির্ভূত বা প্রকাশিত হন। অন্য কথায়, **শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতে তাঁর শাশ্বত চিন্ময় স্বরূপে — দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর-রূপে অবতীর্ণ হন, চিন্ময় জগতে যে-রূপ নিত্য বিরাজিত** (রূপস্য নিত্যং — ভ. গী. ১১/৫২)। **তিনি অবিকল তাঁর সেই নিত্য দেহে আবির্ভূত হন, যা সম্পূর্ণভাবে জড় কলুষহীন, নিষ্কল; জড় জগতের সংগে স্পর্শরহিত তাঁর শাশ্বত সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপে প্রকটিত হন।**

এটি যদিও সত্য যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নরলীলায় বাল্য থেকে কৈশোর, কৈশোর হতে যৌবনে বর্ধিত হন, কিন্তু বিস্ময়জনকভাবে এই যৌবনেই তাঁর বৃদ্ধি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় বহু পুত্র-পৌত্রাদি ছিল; অথবা, অন্য কথায়, জড় জাগতিক হিসাব অনুযায়ী তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল (প্রায় ১২৫ বছর)। কিন্তু তবুও সেখানে তিনি ২০-২৫ বছরের একজন যুবকের মতো যৌবনোদ্দীপ্ত রূপে প্রতিভাত হচ্ছিলেন। আমরা কখনও কোথাও শ্রীকৃষ্ণের বৃদ্ধাবস্থার কোনো ছবি দেখতে পাই না, কেননা তিনি কখনই আমাদের মতো বৃদ্ধ হন না, যদিও এই সমগ্র সৃষ্টিতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে তিনিই হচ্ছেন প্রাচীনতম পুরুষ। কালের প্রভাবে কখনোই শ্রীকৃষ্ণের দেহের বা তাঁর বুদ্ধির কোনো পবিবর্তন হয় না। ধ্বংসাত্মক শক্তিসম্পন্ন কাল শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি, ভগবদ্‌গীতায় তিনি ঘোষণা করেছেন (ভ. গী. ১১/৩২), তিনিই কালের নিয়ন্তা — তাই তাঁর উপর কালের ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রভাবের কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। তাছাড়া, কালের প্রভাবে কেবল জড় শরীরের উপর ক্রিয়াশীল হয়; শ্রীকৃষ্ণের দেহ সচ্চিদানন্দময়, অ-প্রাকৃত, সেজন্যই তাঁর দেহ জড়া প্রকৃতির নিয়মের বশীভূত নয়। *ব্রহ্মসংহিতাতে* (৫/৩৩) সেজন্য বলা হয়েছে যে যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের কারণ, সকলের আদি পুরাণপুরুষ (প্রাচীনতম ব্যক্তি), তবুও তিনি নিত্য নব যৌবনসম্পন্ন (আদ্যং পুরাণপুরুষং *নবযৌবনঞ্চ*)।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মও হয় না, মৃত্যুও হয় না — তিনি কেবল আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হন

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরার কারাগৃহে 'জন্মগ্রহণ' করেন, তখন তিনি শ্রীবিষ্ণু মূর্তিতে আবির্ভূত হন। বসুদেব সেই শিশুকে চতুর্ভুজ মূর্তিতে প্রকটিত হতে দেখেন — তিনি স্বর্ণোজ্জ্বল পীতবাস পরিহিত, পদ্মপলাশলোচন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ; তাঁর গলদেশে পদ্মফুলের মালা, শ্রীবক্ষ শ্রীবৎস-চিহ্ন ও কৌস্তুভ মণি-শোভিত, সুন্দর কেশদামযুক্ত তাঁর মস্তকে উজ্জ্বল বৈদুর্যমণি-খচিত কিরীটি (মুকুট) শোভা পাচ্ছে। তাঁর গাত্রবর্ণ নবোদিত মেঘমালার মতো উজ্জ্বল শ্যাম এবং তাঁর শ্রী-অঙ্গ কর্ণকুণ্ডল, বাজুবন্ধ প্রভৃতি নানা দিব্য আভরণে ভূষিত। ঐ-শিশুর ঐরকম অসাধারণ, অদ্ভুত রূপ-বৈশিষ্ট্য দর্শন করে বাসুদেব পরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন। একটি সদ্যোজাত শিশু কিভাবে এমন রত্নাভরণ-ভূষিত দিব্য মূর্তিতে প্রকাশিত হতে পারে? এই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান সূর্যের মতো। সূর্য আমাদের দৃষ্টিপথে উদিত হলে যেমন আমরা মনে করি সূর্যের উদয় হল। আকাশে সূর্যকে দেখে আমরা মনে করি, সূর্য এখন আকাশে রয়েছে, তারপর আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে যেমন আমরা মনে করি সূর্য এখন অস্ত গেল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য অবিচলভাবে সর্বক্ষণই আকাশে বিরাজ করছে, আমাদের বিকৃত ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে আমরা মনে করি যে সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তেমনি নিত্য। শ্রীকৃষ্ণ কখনো জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত্যুবরণও করেন না, তিনি কেবল ঠিক সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মতো সম্পূর্ণভাবে স্ব-ইচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে, পতিত জীবকুলকে উদ্ধার করার জন্য ও তাঁর ভক্তগণকে আনন্দ দানের জন্য এই জড় জগতে আবির্ভূত হন এবং যথাকালে লীলা সংবরণ করে অন্তর্হিত হন।

আকাশে মহাকিরণশালী সূর্যদেব সর্বদাই বিদ্যমান, যদিও আমরা এই গ্রহে আমাদের অবস্থান অনুসারে কখনো তাকে উদিত হতে দেখি কখনো দেখি অস্ত যেতে। ঠিক তেমনি, ভগবানের লীলাবিলাস নিরন্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পাদিত হয়ে চলেছে, যদিও এই বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডটিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর আমরা ঐ লীলা প্রকটিত হতে দেখি। **ভগবানের ধাম হচ্ছে এক পরম শ্রেষ্ঠ চিন্ময় গ্রহলোক,** গোলক-বৃন্দাবন, এবং তাঁর ইচ্ছায়, এই ব্রহ্মাণ্ডে এবং অন্যান্য কোটি কোটি জড় ব্রহ্মাণ্ড-সমূহে তাঁর পরম ধাম সেই গোলক বৃন্দাবন প্রকটিত হয়। এইভাবে ভগবান সর্বদাই তাঁর নিত্য অপ্রাকৃত পরম ধাম গোলক বৃন্দাবনে বিরাজমান; তাঁর পরম ইচ্ছায় তাঁর লীলা বা কার্যকলাপ এই ব্রহ্মাণ্ডে এবং অন্যান্য অগণিত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহে পর্যায়ক্রমিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন ধরণের অবতার ও প্রকাশগণ

'অবতার' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যিনি চিন্ময় জগত থেকে অবতরণ করেন' (নেমে আসেন)। এই অগণিত জড়ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ যে আকাশে ভাসমান, সেই জড় আকাশের পরপারে শুরু হয়েছে অন্তহীন চিজ্জগত — চিন্ময় জগত। সেখানে চিদাকাশে (চিন্ময় আকাশে) অসংখ্য অপ্রাকৃত, পরম দিব্য মহাবিভূতিময় বৈকুণ্ঠগ্রহলোক-সমূহ ভাসমান। ঐ সমস্ত গ্রহমণ্ডল হতে প্রয়োজনানুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডে পরম পুরুষ ভগবানের নানা প্রকাশ-বিগ্রহ জড়-ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বয়ং স্বরূপে নির্দিষ্ট কাল-পর্যায় অন্তর আবির্ভূত হন। ব্রহ্মার লোক ব্রহ্মালোকের একদিন সমান ৪৩২ কোটি সৌর বছর, এক রাতও সম পরিমাণ সময়। ব্রহ্মার একদিনকে বলা হয় এক **কল্প**। এইরকম এই কল্পে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চারটি যুগ বা **চতুর্যুগ** এক হাজার বার আবর্তিত হয়। এক কল্প আবার ১৪জন মনুর শাসনাধীনে থাকে। প্রতি মনু ৭১ চতুর্যুগ শাসন করেন। একজন মনুর শাসনকালীন সময়কে বলা হয় এক **মন্বন্তর**। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বয়ং রূপে প্রতি কল্পে সপ্তম মন্বন্তরের ২৮তম চতুর্যুগের দ্বাপরে আবির্ভূত হন।

ধর্মে গ্লানি দেখা দিলে ও অধর্মের অভ্যুত্থান হলে ভগবান অবতীর্ণ হন। কখনো তিনি স্বয়ং আসেন, কখনো তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ সেবক ভক্তদেরকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পাঠান — যেমন যীশু (পুত্র), বুদ্ধ, ইত্যাদি, আবার কখনো বা তিনি প্রচ্ছন্নভাবে (ছদ্মবেশে) স্বয়ং আসেন (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু)।

ছয় ধরণের অবতার রয়েছে ঃ

১। **পুরুষাবতার ঃ** যেমন, কারণোদকশায়ী বিষ্ণু
২। **গুণাবতার ঃ** ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব
৩। **লীলাবতার ঃ** রাম, নৃসিংহ, বামনদেব ইত্যাদি
৪। **মন্বন্তরাবতার ঃ** প্রতি মনুর শাসনকালে

৫। **যুগাবতার** ঃ পৃশ্নিগর্ভ, হয়গ্রীব।

৬। **শক্ত্যাবেশাবতার** ঃ বুদ্ধদেব, ব্যাসদেব ইত্যাদি।

এখানে সমস্ত ধরনের অবতার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেবার পরিসর নেই। তবে পুরূষাবতার সম্পর্কে জানাটা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে এখানে পুরুষাবতার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

পুরুষাবতারগণ

জড়াকাশে ও জড়ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে পুরুষাবতার রূপে নিজেকে বিস্তৃত করেন। এঁরা সকলেই তাঁর স্বাংশ প্রকাশ।

১। **প্রথম পুরুষাবতার** ঃ মহাবিষ্ণু বা কারণোদকশায়ী বিষ্ণু

২। **দ্বিতীয় পুরুষাবতার** ঃ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু

৩। **তৃতীয় পুরুষাবতার** ঃ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ সঙ্কর্ষণ হতে যে প্রথম পুরুষাবতার প্রকটিত হন, তাঁকে বলা হয় **মহাবিষ্ণু, কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু**। মহাকায় মহাবিষ্ণু চিন্ময় কারণ-জলের মহাসমুদ্রে শয়ন করে তাঁর থেকে ১৬ টি মৌল উপাদান ও শক্তি অভিব্যক্ত করেন ঃ কাল, প্রকৃতি, কার্য-কারণ, মন, অহঙ্কার, পঞ্চ মহাভূত, প্রকৃতির তিনটি গুণ, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং বিরাট রূপ। জড়াশক্তি-র অধিষ্ঠাত্রী জড়া প্রকৃতি হচ্ছেন একজন দেবী, যিনি ভগবানের আজ্ঞাধীনা, তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি। **মহাবিষ্ণু যখন জড়া প্রকৃতির প্রতি 'ঈক্ষণ' বা দৃষ্টিপাত করেন, তখন জড়া প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হয় এবং সমস্ত উপাদানরাজি-সমন্বিত হয়ে জড় ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ প্রকাশিত হয়। তিনি তখন ঐসব ব্রহ্মাণ্ডের জড় উপাদানসমূহের মধ্যে চিৎ-কণ জীবাত্মা-সমূহকে প্রোথিত করেন, অর্থাৎ প্রকৃতিতে গর্ভসঞ্চার করেন।** কেবল মহাবিষ্ণুর ইচ্ছাক্রমে জড় উপাদানের সারভূত মূল সূক্ষ্ম উপাদান মহত্তত্ত্বের মাধ্যমে চেতনার প্রকাশ হয়।

এই **মহত্তত্ত্ব** সমগ্র জড় জাগতিক অভিব্যক্তির অর্থাৎ অসীম মহবিশ্ব-প্রকাশের সমস্ত উপাদান সমূহের উৎস, সূক্ষ্ম জড় শক্তি বা উপাদান। এটি ঠিক পরিচ্ছন্ন নীলাকাশে এক খণ্ড মেঘের মতো। অপ্রাকৃত জগতের অসীম অন্তহীন চিদাকাশের এক ক্ষুদ্র অংশে **মহত্তত্ত্ব** পুঞ্জীভূত হয়ে আচ্ছাদিত করে — ঠিক একখণ্ড মেঘের মতো। চিদাকাশের যে অংশ মহত্তত্ত্বের দ্বারা এভাবে আচ্ছাদিত হয়, তাকেই বলা হয় জড় আকাশ। এই মহত্তত্ত্বের মধ্যে অগণিত সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে (বৈদিক জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড কোটি কোটি কিলোমিটার ব্যাস-যুক্ত এক একটি গোলক, যার অভ্যন্তরে রয়েছে একটি সূর্য, অসংখ্য নক্ষত্র, চাঁদ এবং চতুর্দশ ভুবন বা ১৪টি গ্রহলোক-স্তর — বা '*Planetory systems*')। কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তাঁর রোমকূপরাজি থেকে অগণিত ব্রহ্মাণ্ড নির্গত হয় (বীজাকারে), এবং যখন তিনি শ্বাস গ্রহণ করেন, তখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে মূলীভূত উপাদান-স্বরূপে আবার তাঁর দেহে প্রবেশ করে। এইভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে সৃষ্টি ও ধ্বংস চলতে থাকে। **ব্রহ্মসংহিতায়** (৫/৪৮) বলা হয়েছে যে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিদেবতা ব্রহ্মা কেবল বিষ্ণুর এক নিঃশ্বাস কাল পর্যন্ত জীবিত থাকেন। এই সময়কাল ব্রহ্মার লোক ব্রহ্মলোকের হিসাবে ১০০ বছর, কিন্তু এই গ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে, সৌর বছরের হিসাবে তা হচ্ছে ৩১১,০০০,০৪০,০০০,০০০ বছরের সমান। এই সময় অনন্ত বলে মনে হলেও চিজ্জগতের শাশ্বত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই সময় কেবল বিদ্যুৎ চমকের মতোই ক্ষণস্থায়ী।

ব্রহ্মাণ্ডসমূহ সৃষ্টির পর, কারণোদকশায়ী বিষ্ণু হতে প্রকাশিত বা বিস্তৃত হয়ে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটির অভ্যন্তরে এক একজন বিষ্ণুমূর্তি প্রবেশ করেন। সেই অন্ধকার ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে তিনি প্রথমে তাঁর দেহ-নিঃসৃত স্বেদ জল দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধভাগ বা 'গর্ভ' পূর্ণ করেন এবং সেই গর্ভোদকে (উদক = জল) তিনি শয়ন করেন।

সেজন্য এই দ্বিতীয় পুরুষাবতারকে বলা হয় **গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু**। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিকমল হতে একটি মহাবিশাল স্বর্ণকমল উত্থিত হয়। ঐ স্বর্ণকমল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের শীর্ষে পৌঁছায়, সেখানে একটি লোক তৈরী হয়, ব্রহ্মালোক (যা এই পৃথিবীগ্রহ হতে বহু বহু গুণ বড়), এবং সেখানে ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জীব ব্রহ্মার জন্ম হয়, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের জীব-প্রজাতিসমূহ-সৃজন ও অন্যান্য বহুবিধ কার্যকলাপের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক। সেই স্বর্ণবর্ণ পদ্মফুলের মৃণালটি (বোঁটা) এরপর বহুগুণে বিস্তৃত হয়, মৃণালের ব্যাস বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ব্রহ্মাণ্ডের গাত্র-স্পর্শ করে। সেই মৃণালের মধ্যে এরপর ব্রহ্মার তত্ত্বাবধানে ১৪টি গ্রহলোক-স্তর বা চতুর্দশ ভুবনের উদ্ভব হয়। এক একটি গ্রহলোক-স্তরে এক বা বহু সংখ্যক গ্রহ থাকে। যেমন অনেকগুলি গ্রহ নিয়ে স্বর্গীয় গ্রহলোক স্তর গঠিত। এই চতুর্দশ ভুবনের ঠিক মধ্যে ভূলোক বা পৃথিবী অবস্থিত। এর নীচে রয়েছে সপ্ত অধোলোক এবং উপরে রয়েছে উন্নততর সপ্ত উর্দ্ধলোক। সবচেয়ে শীর্ষে রয়েছে ব্রহ্মালোক বা সত্যলোক, যেখানে ব্রহ্মা রয়েছেন। মহাকিরণশালী জ্যোতিষ্ক, সূর্য সবগুলি গ্রহমণ্ডলকে আলোকিত করে, আর নক্ষত্রগুলি সেই সূর্যালোক প্রতিফলিত করে। এইভাবে, প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু রূপে বিরাজ করেন এবং ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন, তত্ত্বাবধান করেন। তিনি এভাবে প্রতিটি জড় ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করলেও, জড়াশক্তির প্রভাব তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ, বা ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা।

তৃতীয় পুরুষাবতার হচ্ছেন **ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু**, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীব-সত্তার সামগ্রিক পরমাত্মা। তাঁকে বলা হয় হরি, এবং তাঁর থেকে সকল অবতার প্রকাশিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে, পৃথিবীতে অভিব্যক্ত হয়। এই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু নিজেকে বিস্তৃত করে প্রতিটি জীব-হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে বিরাজ করেন, এবং প্রতিটি পরমাণুতেও তিনি প্রবেশ করেন।

সুতরাং পুরুষাবতার তিন রূপে প্রকাশিত হয়। **প্রথম কারণোদকশায়ী বিষ্ণু**, যিনি সামগ্রিক জড় উপাদানসমূহ সৃজন করেন এবং স্ব-দেহ হতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করেন। **দ্বিতীয় পুরুষাবতার** হচ্ছেন **গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু**, যিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং **তৃতীয় পুরুষাবতার** হচ্ছেন **ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু**, যিনি জৈব বা অজৈব সকল জড় পদার্থের পরমাত্মা। যিনি এভাবে পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর স্বাংশ প্রকাশসমূহ সম্বন্ধে জানেন, তিনিই যথাযথভাবে ভগবানকে জানেন, এবং এভাবে তিনি জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি জড় ক্লেশ হতে চিরতরে বিমুক্ত হন, *ভগবদ্গীতায়* যা ঘোষিত হয়েছে।

জীবতত্ত্ব

আজকাল অধিকাংশ মানুষই মনে করেন, "সব দেব দেবীই সমান", অথবা, "তুমি যে দেব-দেবীরই পূজা কর না কেন, একই গতি লাভ করবে"; কিংবা, "আমি ভগবান, তুমি ভগবান, প্রত্যেকেই ভগবান"। এইগুলি সবই সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত ধারণা, ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবানের উক্তি অনুসারে। দেবদেবী, বিষ্ণু ও কৃষ্ণ — এঁদের স্থিতি সম্বন্ধে অবশ্যই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রথমে দুটি বিষয় জানতে হবে ঃ বিষ্ণুতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব। বিষ্ণুতত্ত্ব হচ্ছেন ভগবান ও ভগবানের প্রকাশ, জীবতত্ত্ব হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্নাংশ, চিৎ-কণাসমূহ বা জীবাত্মাসমূহ। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বায়ু-প্রভৃতি দেবদেবী, মানুষ, পশু, পাখী, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য সব প্রজাতি সকলেই জীব-তত্ত্ব শ্রেণীভুক্ত। **ব্রহ্মাও অন্যান্য সব জীবের মতোই একজন সাধারণ জীব**, কিন্তু তিনি তাঁর ভক্তিযুক্ত সেবার ফলে ঐরকম শক্তিশালী হয়েছেন। **ব্রহ্মা হচ্ছে একটি পদ, কোনো বিশেষ জীবের নাম নয়, ঠিক যেমন ভারতের 'প্রধানমন্ত্রী' কোনো বিশেষ ব্যক্তির নাম নয়, এটি একটি পদের নাম।** গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর দ্বারা শক্তিলাভ করে ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ৮৪ লক্ষ প্রজাতির জীবদেহ সৃষ্টি করে থাকেন (তিনি চিৎকণ আত্মা সৃষ্টি করেন না, কেননা আত্মা নিত্য, সনাতন— কেবল বিভিন্ন প্রজাতি সৃষ্টি করেন, যেমন মানুষ, বাঘ, বটবৃক্ষ — ইত্যাদি; এগুলি সবই জড় আবরণ বা পোশাক-

মাত্র)। কোন সময়ে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর যদি কোনো ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা হবার উপযুক্ত জীব না পাওয়া যায়, তখন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু নিজেকে ব্রহ্মারূপে বিস্তৃত করেন এবং ব্রহ্মার কার্য সাধন করেন। ব্রহ্মার আয়ু সৌর বছরের হিসাবে অত্যন্ত দীর্ঘ (আয়ুষ্কাল পূর্ব পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

উদাহরণস্বরূপ, একটি খুব বড় উৎপাদন কেন্দ্র বা ফার্মে সুপারভাইজারদের নিয়ন্ত্রণে বহু শ্রমিক কাজ করে। বহু সুপারভাইজাদের আবার এক এক জন 'শপ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার' বা এস. এস. তত্ত্বাবধান করেন। এইরকম অনেক এস. এস. ইঞ্জিনীয়ারদেরকে তাঁদের কাজকর্মের রিপোর্ট করতে হয় ওয়ার্ক ম্যানেজারের কাছে। এইরকম বহু ওয়ার্ক ম্যানেজারদেরকে তাদের কার্যবিবরণী পেশ করতে হয় ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাজে। এইরকম কয়েকটি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরদেরকে আবার সেই সর্বময় অধিকর্তার কাছে লাভ-ক্ষতির সমস্ত হিসাব পেশ করতে হয়, যিনি ঐ সমস্ত কোম্পানী ও তাদের শাখাসমূহের মালিক বা কর্ণধার। মালিককে কোনো কোম্পানীর ম্যানেজিং বা তত্ত্বধানে কোনো অংশই নিতে হয় না। তিনি সব কিছু থেকে দূরে থাকেন, সমস্ত কাজ ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের অর্পণ করেন এবং সুখ উপভোগ করেন।

ঠিক তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য রয়েছেন কোটি কোটি দেবতা, যেমন — ইন্দ্রদেব বৃষ্টিপাতের তত্ত্বাবধায়ক, পবনদেব বায়ুর পরিচালক, বরুণদেব জলের — ইত্যাদি। ইন্দ্র হচ্ছেন সমস্ত দেবদেবীর রাজা। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন — 'এত দেবদেবী থাকার প্রয়োজন কি? প্রকৃতির সবকিছুই কি আপনা থেকে ঘটতে পারে না?' ঘটতে পারে না, কারণ ভৌত উপাদানগুলি জড় ও নিজেদের সুষ্ঠ পরিচালনায় অক্ষম। যেমন আমাদের গবেষণাগারে একটি সামান্য গবেষণা কার্য চালাতেও কত পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতির সব কিছুই আপনা থেকে ঘটছে এমন চিন্তা করাটা একটি শিশুসুলভ ব্যাপার। যেমন আমরা জানি বৃষ্টি কিভাবে হয়, সূর্য জলকে বাষ্পীভূত করে, মেঘ তৈরী হয়, বায়ু মেঘকে স্থলভাগে নিয়ে যায়, এরপর বৃষ্টিপাত ঘটে; জল নদী দিয়ে বাহিত হয়ে আবার মহাসাগরে ফিরে যায়। এটা আমরা জানি, কিন্তু আমরা জানি না **কেন** বৃষ্টি হয়। এমনকি যদি গবেষণাগারে বৃষ্টি ঘটাতে হয়, তাহলে কতই না বুদ্ধিমত্তা, পারদর্শিতার প্রয়োজন হয়। ঠিক তেমনি প্রকৃতিতে যা-কিছু ঘটছে, সেগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য দেব-দেবতা-রূপ ইঞ্জিনীয়াররা নিয়োজিত রয়েছেন।

ব্রহ্মা হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের ইঞ্জিনীয়ার; তিনি চতুর্দশ ভুবনের ও ৮৪ প্রজাতির সৃষ্টি করেন। সুতরাং ব্রহ্মা একজন বড় নিয়ন্তা। কিন্তু এই রকম কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, আর সেইসব ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে কোটি কোটি ব্রহ্মা। প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু এইসব অগণিত জড় ব্রহ্মাণ্ডের সবগুলির উৎস। **কিন্তু এমনকি এই মহাবিষ্ণুও যাঁর অংশের অংশ, তিনি হচ্ছেন সব কিছুর আদি কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যিনি তাঁর নিজ ধাম, পরম শ্রেষ্ঠ চিন্ময় ধাম গোলক বৃন্দাবনে নিত্যকাল আনন্দবিলাসরত। যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর প্রভু, ঈশ্বর, নিয়ন্তা, তিনি কখনই সরাসরি কোন কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন না। তিনি সকল কার্যাবলীর দায়িত্বভার তাঁর অংশ প্রকাশ প্রতিনিধিগণের উপর ন্যস্ত করেন, তার তিনি কেবল দিব্যানন্দময় লীলাবিলাসে মগ্ন থাকেন।**

শিব-তত্ত্ব

শিব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক অংশ প্রকাশ, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের অধীনস্থ। শিবের মাধ্যমে ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত করেন। মহাদেব শিব সরাসরি ভগবানও নন, সম্পূর্ণতঃ জীবতত্ত্বও নন — মধ্যবর্তী। তিনি জীবসমূহের প্রভু। সত্ত্ব-রজ-তম-এই ত্রিগুণের মধ্যে শিব তমো গুণের অধীশ্বর এবং সংহার কর্তা। শিব একজন পরম বৈষ্ণব, বিষ্ণুভক্ত, 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু'। তিনি সর্বদা শ্রীহরির ধ্যানে তন্ময় থাকেন। ভগবানের সংগে শিবশম্ভুর মূল পার্থক্য হচ্ছে, শিবের সংগে জড়া প্রকৃতি, মায়াশক্তির সংস্রব রয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবিষ্ণু সম্পূর্ণভাবে জড়া

প্রকৃতির সংস্রব-রহিত। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৫) বলা হয়েছে ঃ

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

"দুগ্ধ যেমন বিকার-বিশেষযোগে দধিতে পরিণত হয়, যা কারণরূপে দুগ্ধ হতে পৃথক্ নয়, তেমনি যিনি কার্যবশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন এবং সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

দুধ দইয়ে পরিণত হতে পারে, কিন্তু দইকে আর দুধে প্রত্যাবর্তিত করা যায় না, তেমনি শিব শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ, কিন্তু শিব কখনই বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সমস্থানীয় হতে পারেন না।

বিষ্ণু-তত্ত্ব

প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে সত্ত্বগুণের অধীশ্বর হচ্ছেন বিষ্ণু-অবতার, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোনো ভাবেই জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন না। **বিষ্ণু যদিও শ্রীকৃষ্ণ হতে অভিন্ন, ভগবান, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আদি উৎস।** বিষ্ণু হচ্ছেন অংশ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ। *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রদীপের দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টি পরিস্ফুট করা হয়েছে। একটি মূল প্রদীপ হতে যখন অপর একটি প্রদীপ জ্বালানো হয়, তখন দুটি দীপশিখাই সমানভাবে কিরণ দিতে থাকে — উভয়ের শক্তিই সমান কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথমটিকেই মূল প্রদীপ বলা হয়। অন্যটি দ্বিতীয়। তেমনি বিষ্ণু-প্রকাশ হচ্ছেন দ্বিতীয় প্রদীপের মতো। তিনি কৃষ্ণের মতোই শক্তিমান, কিন্তু তবুও আদি বিষ্ণু হচ্ছেন কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ হতে যত অবতার প্রকাশিত হয় — যেমন বিষ্ণু, রাম নৃসিংহ, বরাহ, মৎস্য — সকলেই বিষ্ণু-তত্ত্ব। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে (৫/৪৬) ঃ

দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতু সমানধর্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

"যখন একটি প্রদীপ থেকে অপর একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয় এবং পৃথক স্থানে রাখা হয়, তখন দ্বিতীয়টির শিখা বা প্রভা মূল প্রদীপের মতোই সমভাবে উজ্জ্বল হয়। ঠিক তেমনই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের থেকে অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তি প্রকটিত করেন, যাঁরা তাঁর মতোই জ্যোতির্ময়, শক্তিশালী, ঐশ্বর্যশালী। আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।"

সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অনুগত সেবক, আর ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ।

শ্রীকৃষ্ণের সংগে দেবদেবীগণের সম্পর্ক

জড়জগতের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের পরিচালনাধীন যে প্রশাসন-ব্যবস্থা বা 'সরকার' রয়েছে, দেবদেবীগণ হচ্ছেন সেই সরকারের বিভিন্ন পদস্থ কর্মাধ্যক্ষ (অফিসার) ও নির্দেশক বা তত্ত্বাবধায়ক (ডিরেক্টর)। এই সব দেবদেবীগণ প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য ভগবানের দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হন। ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবদেবীগণ সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা সর্বজনবিদিত যে যখনই কোন

মহাজাগতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ব্রহ্মাণ্ডে কোন এমন আকারের বিঘ্ন-বিপর্যয় ঘটে যা দেবদেবীগণের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার বাইরে, তখন ব্রহ্মার নেতৃত্বে সকল দেবদেবীগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন (যেমন দ্বাপরে ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-সহ সকল দেবগণ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর নিকটে গিয়ে পুরুষসূক্তে মন্ত্রে তাঁর আবাহন করেন, এবং তারপর শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন)।

সুতরাং, দেবদেবীগণকে একটি বৃক্ষের পত্র-পল্লব-শাখার সংগে তুলনা করা যায়, আর শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ঐ বৃক্ষটির মূল কাণ্ড। যদি কোনো গাছকে পুষ্ট করতে হয়, তাহলে ঐ গাছের গোড়ায়, মূলে জল ঢালতে হয়, তখন পত্র-পল্লব-শাখা সমন্বিত সমস্ত গাছটিই পরিপুষ্ট হয়। প্রতিটি পাতায়, পল্লবে পৃথকভাবে জল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, আর সেটা বাস্তবসম্মতও নয়। **শ্রীমদ্ভাগবতে** নারদমুনি প্রচেতাগণকে বলেন (৪/৩১/১৪) ঃ

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপোহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

"গাছের মূলে জল সেচন করলে যেমন সেই গাছের কাণ্ড, ডাল, উপশাখা প্রভৃতি সকলেই তৃপ্তি লাভ করে এবং উদরকে খাদ্যদ্রব্য দিলে যেমন শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট হয়, তেমনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলে সকলেরই পূজা হয়, সকলেই তৃপ্ত (পুষ্ট) হয়।"

জীবসত্তাসমূহ ও দেবদেবীগণ — সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছাধীন। সাধারণতঃ এই জড়জগতে যেসব ব্যক্তি বিভিন্নভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয় বা নানা কামনা-পূরণে আকুল হয়, তাঁরা দেবদেবীর শরণাপন্ন হয়। বিশেষ কামনা পূরণের জন্য বিশেষ বিশেষ দেবতার নিকটে যেতে হয়। *যেমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির 'সূর্য পূজা' করার বিধান রয়েছে, যিনি জড়বিদ্যা লাভ করতে চান, তাঁকে বিদ্যাদেবী সরস্বতীর আরাধনা করতে হয়; কেউ যদি ধনৈশ্বর্য চান, তাহলে তাঁকে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করতে হয়। কেউ যদি সুন্দর স্বামী চান, তিনি শিবের আরাধানা করেন, সুন্দরী স্ত্রী চাইলে শিবের স্ত্রী উমাদেবীর আরাধনা করতে হয়। এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য বিভিন্ন রকমের পূজার বিধান শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে।*

কিন্তু দেব-পূজার এই সুযোগ-সুবিধাগুলি তাঁদের প্রদত্ত হয়েছে, যারা স্বল্প মেধা-সম্পন্ন, এবং জড় কামনা-বাসনা যাঁদের চিত্ত অধিকার করেছে, প্রকৃত জ্ঞান হরণ করেছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, **"যাদের মন জড় কামনা বাসনার দ্বারা বিকৃত, তারা অন্য দেবদেবীর শরণাগত হয়"** (৭/২০); **"অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের (*অল্পমেধসাম্*) আরাধনা-লব্ধ সেই ফল ক্ষণস্থায়ী। দেবতাদের উপাসকেরা তাঁদের আরাধ্য দেবতাদের লোক প্রাপ্ত হন** (যা জড়, 'প্রাকৃত'), **কিন্তু আমার ভক্তরা আমার পরম ধর্মপ্রাপ্ত হন** (চিন্ময়, অপ্রাকৃত) (ভ.গী. — ৭/২৩)।

শ্রীকৃষ্ণ কেন দেবপূজকদের স্বল্প-মেধা বা স্বল্পবুদ্ধি (*অল্পমেধসাম্*) বলেছেন? (১) তাঁরা গাছের পাতায় জল দেওয়ার মতোই দেবদেবীদের আরাধনা করে, যা কখনো হৃদয়কে পূর্ণ পরিতৃপ্তি দেয় না, এমনকি দেবতারাও তাঁতে প্রকৃত সন্তুষ্ট হন না, ঠিক যেমন পাতায় জল দিলে পাতা পুষ্ট হয় না, অথবা হাতকে খাদ্য দিলে হাতের পুষ্টিবিধান হয় না। **শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পুষ্ট করতে হলে খাদ্য দিতে হবে উদরকে।**

দেবদেবীগণকে বলা যেতে পারে পরমেশ্বর ভগবানের পরিচালনাধীন সরকারের বিভিন্ন অফিসার বা ডিরেক্টর। রাষ্ট্রপতিকে সন্তুষ্ট করলে যেমন কিছুই অ-লভ্য থাকেনা, তেমনি ভগবানকে পরিতৃপ্ত করলে সবকিছু আপনা থেকেই সাধিত হয়। পক্ষান্তরে, অফিসার বা ডিরেক্টরদের ঘুষ দিয়ে কিছু লাভ করা যেমন শোভনীয় নয়, তেমনি দেবদেবীগণকে কিছু উপহার দিয়ে অস্থায়ী ফল লাভ করে মূল্যবান মানব-জীবনটি সমাপ্ত করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়।

কিভাবে দেব দেবীগণকে সম্মান জানাতে হয়

একজন কৃষ্ণভক্ত জানেন যে দেবদেবীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্তী সেবক-সেবিকা। এঁদের প্রত্যেককেই বিশেষ বিশেষ সেবাভার বা কার্যভার দেওয়া-হয়েছে।

কৃষ্ণভক্ত দেবদেবীগণকে কখনই অসম্মান করেন না, তিনি সকল দেবদেবীগণকে শ্রীকৃষ্ণের বিরাট-রূপের বা বিশ্বরূপের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে দর্শন করেন এবং তাঁদেরকে সম্মান করেন, প্রণাম করেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। অবশ্য, কৃষ্ণভক্ত তাঁদের কাছ থেকে কোন জড়-লাভ, প্রতিষ্ঠা কামনা করেন না। যখন একজন কৃষ্ণভক্ত শ্রীগণেশকে প্রণাম ও প্রার্থনা করেন, তিনি বলেন, *"হে প্রভু! কৃষ্ণের কাছে ফিরে যাওয়ার পথে যে সব বাধা-বিঘ্ন রয়েছে, কৃপাপূর্বক আপনি সেগুলি দূর করুন।"* যখন তিনি শিবের নিকট প্রার্থনা করেন, তিনি বলেন, *"আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। কৃপা করে আমাকেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রেমানুরক্ত ভক্ত হবার আশীর্বাদ করুন, যাতে আমি নিত্যকাল তাঁর সেবায় নিয়োজিত হতে পারি।"* তিনি সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা করেন, *"হে মাতা সরস্বতী। আমাকে কৃপাশীষ প্রদান করুন, যাতে আমি এই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে উপলব্ধি করতে পারি এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হতে পারি।"*

এই হচ্ছে দেবদেবীদের প্রতি ভক্তের মনোভাব। ভগবদ্ভক্ত সকল জড়-অভিপ্রায়-শূন্য হয়ে নিরন্তর কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে আগ্রহী। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর অনন্য ভক্তের সকল প্রয়োজন পূরণ করেন (*যোগক্ষেম বহামি অহম্* — ভ. গী. — ৯/২২)। **একজন কৃষ্ণভক্ত কোন জড় বাসনা পুরণের জন্য কোন দেব-দেবীর নিকটে যাবার কথা এমনকি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। বৃন্দাবনের গোপিকাগণ যখন কাত্যায়ণী ব্রত করে কাত্যায়ণী দেবীর (যোগমায়া) নিকট প্রার্থনা করতেন, তাদের প্রার্থনা ছিল এই যে কৃষ্ণকে যেন তাঁরা স্বামীরূপে লাভ করতে পারেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের একজন অননচিত্ত শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার জন্যই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত হওয়া উচিত।**

গীতা প্রতিযোগিতা ঃ তিন

এর জন্য

কিছু প্রাসঙ্গিক শ্লোক

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ গ্রন্থ থেকে
নীচের শ্লোক সমূহ, অনুবাদ ও তাৎপর্য ঃ

- ৪/৫, ৪/৭, ৪/৮, ৪/৯, ৭/৬, ৭/৭, ৭/২১-২৬, ৮/১৭, ৮/১৯, ৯/১, ৯/৪, ৯/৫
- ৯/১০-১৪, ৯/১৭, ৯/২০-২৪, ১০/৮, ১০/১২-১৪, ১২/১-৫, ১৪/৪, ১৪/২৭

পর্ব ৪ ঃ জড়াপ্রকৃতি, কর্ম, কাল



পর্ব ৪ ঃ জড়াপ্রকৃতি, কর্ম, কাল

জড়জগতে জড়দেহধারণ অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশাময়। এটি ঠিক তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরে একটি ছোট্ট নৌকায় ভেসে থাকার মতো। দেহ-নৌকার সলিল-সমাধি বা মৃত্যু এখানে এক অনিবার্য ভবিতব্য। বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানীও এই ভয়ংকর ভবিতব্য থেকে অব্যাহতি পান না। উচ্চ প্রযুক্তি ভেসে থাকাকে, অর্থাৎ কিছুদিন বেঁচে থাকাকে 'সুখপ্রদ' করতে পারে, দেহের বিনাশ প্রতিহত করতে পারে না। কেননা এটি জড়া প্রকৃতির আইন, নিয়ম। ভগবদ্গীতায় এই জড় জগতকে মৃত্যুর এক মহাসাগর বলা হয়েছে। এখানে প্রতেকেই তার জড়-অস্তিত্বের জন্য সবসময় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পীড়িত। এই দুঃখ-উৎকণ্ঠার যথার্থ কারণ জানা এবং জীবনের প্রকৃত গন্তব্য জানাই হচ্ছে যথার্থ অনুসন্ধানের বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার মাধ্যমে এইসব প্রশ্নের নিখুঁত উত্তর প্রদান করেছেন এবং এইভাবে ভগবদ্গীতার শ্রোতা অর্জুনকে তার যথার্থ স্বরূপ জানাবার মাধ্যমে তাঁর সমস্ত জড় দুঃখ-দুর্দশা প্রশমিত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত কিছুর পরম ভোক্তা, পরম নিয়ন্তা, এবং সকল জীবের সুহৃদ। প্রকৃতি হচ্ছে তাঁর শক্তি। জীবাত্মা তাঁর **তটস্থা শক্তি**; জীব তাঁর **চিৎ-শক্তির** (অন্তরঙ্গ) অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার — এই আটটি জড় উপাদান সমন্বিত জড়া প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণের **বহিরঙ্গা শক্তি**। প্রকৃতির ত্রিগুণের সমন্বয়ে কালের অধীনে (কাল — শ্রীকৃষ্ণের অপর একটি শক্তি) কর্ম ও তাঁর প্রতিক্রিয়া বা ফলের উদ্ভব হয়।

পুনর্জন্ম

পুনর্জন্ম কি

জড় বস্তু ও চেতন পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্র আমাদেরকে তথ্য প্রদান করে। প্রথম যে মৌলিক জ্ঞান আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তা হচ্ছে এই যে, আমরা এই জড়দেহগুলি নই, আমরা চেতন আত্মা। আত্মার শরীর সচ্চিদানন্দময়, জড়-উপাদান-বিহীন; তাঁকে বলা হয় স্বরূপ দেহ। পরিবর্তনশীল জড় দেহটি জড় পদার্থের নির্মিত। প্রকৃতপক্ষে, জড় শরীরের দুটি ভাগ রয়েছে ঃ স্থূল ও সূক্ষ্ম। মাটি (কঠিন পদার্থ), জল (তরল) অগ্নি (তাপ), বায়ু (গ্যাসীয়) এবং আকাশ, এই পাঁচটি উপাদানে তৈরী হয় **স্থূল শরীর**। মন, বুদ্ধি ও অহংকার — এই তিনটি উপাদানে তৈরী রহয় **সূক্ষ্ম শরীর**। এই দুটি শরীরই আত্মার জড় আবরণ বিশেষ। স্বরূপতঃ প্রতিটি জীবসত্তাই চিন্ময়, অজড় (সচ্চিদানন্দময়), কিন্তু যখন কোন জীব জড়জগৎকে উপভোগ করার বাসনা করে, তখন সে চিন্ময় জগত হতে জড়জগতে অধঃপতিত হয়। এভাবে যখন আত্মাকে জড় জগতে প্রেরণ করা হয়, তখন জড়জগতে তাকে জড় শরীরের আবরণে আচ্ছাদিত করা হয়, যাতে সে এই জড় পরিবেশের সংগে সামঞ্জস্যবিধান করে চলতে পারে, জড়জগতে বাস করতে পারে। ঠিক যেমন আপনি যখন বিদেশে যান, তখন সেই ঠান্ডা দেশের উপযোগী শীত বস্ত্র নিয়ে যান। জীবাত্মাকে প্রথমে মানব বা উচ্চতর কোনো প্রজাতির জন্ম দেওয়া হয়; কিন্তু সে যখন তার অপরাধ প্রবণতা সংশোধন না করে অধিকতর জড়-বিষয় সম্ভোগে আকাঙ্ক্ষিত হয়, তখন তাঁকে নিম্নতর প্রজাতিতে অধঃপতিত হতে হয়। তাঁর বিবর্তনের ধারায় ৮৪ লক্ষ প্রজাতির জীব শরীর — জলচর, উদ্ভিদ, পশু প্রভৃতি নানা জীব-শরীরে দেহধারণ করার পর তার মুল্যবান মানব-জন্ম লাভ হয়। তাকে বার বার দেহান্তরিত হওয়ার এই অন্তহীন চক্র হতে মুক্ত হবার আরেকটি সুযোগ প্রদান করা হয়। যে সরল প্রক্রিয়ায় জীব এক দেহ হতে অপর দেহে স্থানান্তরিত হয়, তাকে পুনর্জন্ম বলা হয়।

পুনর্জন্ম ঃ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের অভিমত

'পুনর্জন্ম' কোনো 'হিন্দু মতবাদ' বা 'বিশ্বাস' নয়, যদিও পৃথিবীর বহু মানুষ এমন মনে করেন। পুনর্জন্ম একটি বাস্তব ঘটনা, এবং বিশ্বজুড়ে বহু প্রথিতযশা দেশনায়ক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী এই সত্য স্বীকার করেছেন। *পারমার্থিক সত্যানুসন্ধান-সংক্রান্ত* ***'সিদ্ধার্থ'*** নামক তার ক্লাসিক উপন্যাসে **নোবেল-জয়ী সাহিত্যিক হারমান হেসে লিখেছেন,** *"তিনি দেখলেন যে শরীর ও মুখগুলি পরস্পরের প্রতি হাজার হাজার সম্পর্কে সম্বন্ধ যুক্ত ... ... । তাদের কারোরই মৃত্যু হয় নি, তারা কেবল শরীর পরিবর্তন করেছে, তারা নব নব দেহে আবির্ভূত হয়েছে, অবিরাম তাদের মুখগুলি বদলিয়ে নবজন্মের সাথে সাথে নূতন হয়েছে ঃ পুরানো ও নুতন দুটি মুখের মধ্যে রয়েছে কেবল সময়ের ব্যবধান ... ... ।"*

অগণিত বিজ্ঞানী ও মনোস্তত্ত্ববিদ্ পুনর্জন্মের সত্যতা স্বীকার করেছেন। সবচেয়ে প্রতিভাধর কয়েকজন আধুনিক **মনোবিদ্গণের অন্যতম, কার্ল জাঙ** তাঁর বইয়ে এক শাশ্বত স্বরূপ-সত্তার তত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন, যে-জীব-সত্তা তাঁর স্বরূপ ও চেতনার গূঢ়তম রহস্য উপলব্ধির এক উপায় হিসাবে এই জগতে বার বার নুতন নূতন শরীর ব্যবহার করে চলেছে। *"আমি ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারি যে বিগত শতাব্দীগুলিতেও আমি জীবন কাটিয়েছি, আর সেখানে আমি সেইসব মৌল প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হয়েছি, যার উত্তরদানে আমি সমর্থ ছিলাম না; আমাকে বার বার জন্মাতে হয়েছে, কেননা যে কাজ আমার উপর অর্পিত হয়েছিল, আমি তা সিদ্ধ করতে পারিনি, আমার উপলব্ধি-লাভ সম্পূণ হয়নি,"* কার্ল বলেন।

অপর এক **নোবেল জয়ী অইজাক ব্যাসেভিস্ সিংগার** প্রায়ই অতীত জন্ম, পুনর্জন্ম এবং আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে বলেন। তিনি বলেন, *'মৃত্যু বলে কিছু নেই। মৃত্যু ঘটবে কিভাবে, প্রতিটি জীবসত্তা যদি ভগবানের অংশ হয়? আত্মার কখনই মৃত্যু হয় না, আর দেহ কখনই জীবিত নয়।"*

সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, এ-বিষয়ে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করে লিখেছিলেন, *"নিজেকে এই জগতে অস্তিত্বশীল দেখে আমার এটা মনে হয় যে আমি সবসময়ই অস্তিত্বশীল — কোনো না কোন শরীরে আমি চিরকালই রয়েছি।"*

হার্ভার্ডের জৈব-পদার্থবিদ ডি. পি. দুবে লিখছেন, *"আমরা যাকে প্রকৃতির নিয়ম বলে জানি, কেবল সেই জড়, ভৌতিক নিয়মের সাহায্যেই জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে — মতান্ধের মতো এই ধারণা আশ্রয় করে আমরা নিজেদেরকে অজ্ঞতার অন্ধগলিতে পরিচালিত করতে পারি। পক্ষান্তরে, ভারতের বৈদিক সাহিত্যে যে তত্ত্বগুলি প্রতিমূর্ত হয়েছে, সেগুলির প্রতি উদার-মনস্ক হলে আধুনিক বিজ্ঞানীরা এক নূতন প্রেক্ষিত থেকে তাদের নিজেদের-সৃষ্ট ধারণা-মতবাদ গুলিকে দর্শন করতে পারবেন, এবং সেই সাথে তাঁরা সমীপবর্তী হতে পারবেন এইসব বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের মূল লক্ষ্যের ঃ প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটন"।*

১৮১৪ সালে, আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডাম্স্ আরেকজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট **টমাস জেফারসনকে** লিখেছিলেন, *"সেই পরমপুরুষের প্রতি বিদ্রোহ করার পর কিছু আত্মাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন এক অঞ্চলে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর তাদেরকে সেই কারাগার হতে মুক্ত করা হয় এবং পৃথিবীতে আসার অনুমোদন দেওয়া হয়। পৃথিবীতে এসে তারা সমস্ত ধরণের প্রজাতি-দেহে দেহান্তরিত হতে থাকে ঃ সরীসৃপ, পাখী, পশু, মানুষ প্রভৃতি তাদের নিজ নিজ যোগ্যাতা, গুণাবলী ও চরিত্র অনুসারে নানা ধরণের প্রজাতিতে এবং প্রত্যেক প্রজাতিতে — এমনকি শাকসব্জী বা জড়-প্রায় ব্যকটোরিয়া-দেহেও তাদের কার্যকলাপ, চরিত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়। কেনো অভিযোগ ছাড়াই বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যথেষ্ট উন্নত হলে তাদেরকে গরু বা মানব প্রজাতি-দেহে জন্মাতে দেওয়া হয়। যদি মানব*

জন্ম লাভ করে তারা সুন্দরভাবে আচরণ করে, তাহলে তাদেরকে আবার স্বমহিমায় স্বর্গীয় আনন্দলোকে পুনরায় অধিষ্ঠিত করা হয়।" **(টমাসকে লেখা জেফারসনের নিকট চিঠি, মার্চ, ১৮১৪; 'করেসপণ্ডেন্স অব্ জন অ্যাডামস্' বই** থেকে।)

পাশ্চাত্যের সবচেয়ে **প্রভাবশালী শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম, পল গাওগুইন** তাহিতি দ্বীপমালায় তাঁর জীবনের অন্তিম বছরগুলি কাটানোর সময়ে লিখেছিলেন যে, যখন ভৌতিক শরীর-কাঠামোটি ভেঙে যায়, তখন, *"আত্মা বেঁচে থাকে। এটি তখন তাঁর চেতনার উচ্চ বা নিম্ন অবস্থা, তাঁর যোগ্যতা অনুসারে একটি উচ্চতর বা নিম্নতর অপর একটি দেহ ধারণ করে।"*

বর্তমানে পুনর্জন্ম তত্ত্ব পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবিদের ও সাধারণ মানুষদের মনকে আকৃষ্ট করছে। সেখানকার চলচ্চিত্রে, উপন্যাসে, জনপ্রিয় গানে, টিভি চ্যানেলে এবং পত্রিকাগুলিতে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে পুনর্জন্ম-প্রসঙ্গটি উঠে আসছে এবং লক্ষ লক্ষ পাশ্চাত্যবাসী দ্রুতপদবিক্ষেপে সেই প্রায় দেড়শো কোটিরও বেশি জনসংখ্যা-যুক্ত জনগোষ্ঠীর সংগে নিজেদেরকে যুক্ত করছে, যাদের মধ্যে রয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ, তাওবাদী ও অন্যান্য মতাবলম্বী, যাঁরা যুগযুগান্তর ধরে জেনে এসেছে যে জন্মের সাথে সাথে জীবনের শুরু হয় না, আর মৃত্যুর সাথে সাথেও ঘটেনা বহুবর্ণচিত্রিত এক একটি জীবনের পরিসমাপ্তি।

বিভিন্ন ধর্মে পুনর্জন্মের ধারণা

প্রাচীন গ্রীস

সক্রেটিস, পিথাগোরাস এবং প্লেটো হচ্ছেন সেই সব প্রাচীন গ্রীকবাসীদের মধ্যে কয়েকজন, যাঁরা পুনর্জন্ম-তত্ত্বকে তাঁদের শিক্ষা-উপদেশের এক অন্যতম অঙ্গ করেছিলেন। পিথাগোরাস দাবী করেছিলেন যে তিনি তাঁর পূর্ব পূর্ব জীবনের কথা স্মরণ করতে পারেন। দার্শনিক প্লেটো তাঁর প্রধান প্রধান রচনাকর্মে পুনর্জন্মবাদের বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর মতবাদের সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, শুদ্ধ আত্মা পরম সত্যের স্তর হতে তার ইন্দ্রিয়ভোগলালসার জন্য এই জড়জগতে অধঃপতিত হয়, এবং এখানে সে একটি জড় শরীর ধারণ করে। পতিত জীবাত্মা প্রথমে, তাঁর মতে, একটি মানব শরীর গ্রহণ করে। বহুবিধ মানব-প্রজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছেন দার্শনিকেরা, যাঁরা উচ্চতর জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়াস করেন। যদি তাঁর জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহলে তিনি সেই শাশ্বত অস্তিত্বের স্তরে ফিরে যেতে পারেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি জড় ভোগ-বাসনায় অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে পশু প্রজাতিতে অধঃপতিত হতে হয়। প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে অতিরিক্ত ভোজনপ্রিয় মাদকাসক্তরা তাদের ভবিষ্যত জন্মগুলোতে গাধা-শরীর লাভ করতে পারে, হিংস্র ও কুচক্রী লোকেরা হতে পারে নেকড়ে ও শকুন, এবং যারা সামাজিক প্রথার অন্ধ অনুগামী, তারা হতে পারে মৌমাছি কিংবা পিঁপড়ে। কিছু কাল পরে ঐসব জীবদের পুনরায় মানব জন্ম দেওয়া হয়; এইভাবে তাদের মুক্তিলাভের আর একটি সুযোগ দেওয়া হয়। প্লেটোর এই ব্যাখ্যায় সনাতন ধর্মের নীতিসূত্রের খুবই মিল রয়েছে।

ইহুদী-ধর্ম

ইহুদী-ধর্ম ও আদি খ্রীষ্টান ধর্মে পুনর্জন্মবাদ রয়েছে। **'কাবালা'** হচ্ছে এমন একটি আকর-গ্রন্থ যা বহু হিব্রু পন্ডিতগণের মতানুসারে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থের জ্ঞানের গোপন উৎস। সমগ্র 'কাবালা'-র মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ জন্মের, পুনর্জন্মের বহু বিবরণ রয়েছে। **মূল কাবালার পাঠ্যাংশের একটি যোহার-এ** বলা হয়েছে, *"আত্মা-সমূহকে অবশ্যই সেই পরম বস্তুতত্ত্বে ফিরে যেতে হবে, যেখান থেকে তাঁর উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সেটি করতে হলে, তাদেরকে সকল সদ্গুণাবলী বিকশিত করে পূর্ণতা লাভ করতে হবে, যে-গুণাবলী তাদের সকলের মধ্যেই প্রোথিত রয়েছে; যদি তারা এক জন্মের মধ্যে এই শর্ত পূরণ করতে না পারে, তাহলে তাদেরকে অপর একটি, আর একটি, এই রকম আরও*

শরীরে জন্ম গ্রহণ করতে দেওয়া হবে, যতদিন না তাঁরা সেই যোগ্যতার মানে উন্নীত হচ্ছে যা ভগবানের সংগে পুনর্মিলনের জন্য উপযোগী"। **ইউনিভার্সাল জিউইস্ এন-সাইক্লোপিডিয়া** অনুসারে হেসেডিক ইহুদীরা একই বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন।

খ্রীষ্টান ধর্ম

খ্রীষ্ট-পরবর্তী তৃতীয় শতাব্দীতে প্রারম্ভিক **খ্রীষ্টান চার্চের ফাদারদের অন্যতম এবং এর সবচেয়ে বিজ্ঞ বাইবেলীয় বিশারদ ধর্মতত্ত্ববিদ্ ওরিজেন** লিখেছিলেন, "মন্দের প্রতি কিছু প্রবণতার ফলে কিছু জীবাত্মাকে জড় শরীরে আসতে হয়। প্রথমে মানব-দেহে; মানবদেহের নির্দিষ্ট সময় সীমা অতিবাহিত করার পর অযৌক্তিক, অপরাধজনক প্রবেগগুলির জন্য তাদের বিভিন্ন পশু শরীর লাভ হয়, তারপর তাদেরকে উদ্ভিদ-প্রজাতিতে অধঃপতিত হতে হয়। এই অবস্থা হতে ঐ একই স্তরগুলির মধ্য দিয়ে তারা পুনরায় উন্নীত হতে হতে পরিশেষে তাঁরা স্বর্গীয় লোকে প্রত্যাবর্তন করে।"

খোদ বাইবেলেই এমন বহু অনুচ্ছেদ রয়েছে, যাতে নির্দেশিত হয়েছে যে যীশু ও তাঁর অনুগামীগণ এই পুনর্জন্মের তত্ত্বটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। যেমন একবার যীশুর শিষ্যগণ ওল্ড টেষ্টামেন্টের সেই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যাতে বলা হয়েছিল যে এলিয়াস্ পৃথিবীতে পুনরায় আবির্ভূত হবেন। বাইবেলের 'গসপেল অব্ **সেন্ট ম্যাথুস্**' এ রয়েছে, *"যীশু উত্তরে তাঁদের বলিলেন, এলিয়াস সত্যিই প্রথমে আসিবে এবং সবকিছুই পুনারায় ঠিক করিবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি, এলিয়াস ইতিমধ্যেই আসিয়াছিল, কিন্তু উহারা তাহাকে চিনিতে পারে নাই। তখন শিষ্যগণ বুঝিতে পারিল যে যীশু তাহাদের কাছে জন দি বাপটিষ্ট সম্বন্ধে বলিতেছেন।"* (ম্যাথিউস্-৭ ঃ ৯-১৩) অন্য কথায়, যীশু তাঁর আগ্রহী শিষ্যগণের কাছে ঘোষণা করলেন যে প্রফেট এলিয়াসই জন দি বাপটিষ্ট রূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তাঁকে কেউ চিনতে পারে নি; রাজা হেরড জন দি বাপটিষ্ট-এর শিরশ্ছেদ করে। জন দি বাপটিষ্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যীশু আরো বলেন, "ইনিই সেই এলিয়াস, যাহার আবার আসিবার কথা (ভবিষ্যদ্বাণী) ছিল। যাহাদের শ্রবণ করিবার মতো কর্ণ (যোগ্যতা) আছে, তাহারা শ্রবণ করুক"। (ম্যাথিউস, ১১:১৪-১৫)

ইসলাম

কোরানে বলা হয়েছে, *"তোমরা ছিলে মৃত, তিনিই তোমাদিগকে জীবনদান করিয়াছেন। তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন, এবং পুনরায় তোমাদিগকে জীবনদান করিবেন, এবং প্ররিশেষে তিনি তোমাদিগকে তাঁর নিজের নিকটে গ্রহণ করিবেন।'* (সুরাহ্ ২-২৮) ইসলাম ধর্মের অনুগামীগণের মধ্যে বিশেষতঃ সুফী সাধকরো বিশ্বাস করেন যে মৃত্যু কোনো ক্ষতিই নয়, কেননা চির অমর আত্মা অবিরাম বিভিন্ন দেহের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে থাকে। প্রসিদ্ধ সুফী কবি **জালালউদ্দিন রুমি** লিখেছেন,

"খনিজ, জীবাণু-দেহে হইল মোর মৃত্যু একদিন,
নব প্রভাতের পুণ্যালোকে নিজেরে দেখিলাম উদ্ভিদে,
কত দেহে জীবনভোগ শেষে বৃক্ষরূপও হইল বিলীন,
লভিলাম পশুদেহ; কত রূপে ভ্রমি চতুষ্পদে,
ছাড়িনু সে পশু-রূপ, মৃত্যুর প্রবল আঘাতে ...।
তারপর, কি সৌভাগ্য মোর! লভিনু মানব-তনু
সুন্দর, দুর্লভ, যোগ্য ঈশ্বর সাক্ষাতে!
মৃত্যু! কেনই বা হইব ভীত ... মৃত্যু যেন

জরাজীর্ণ, ভগ্ন গৃহ ছাড়ি — এক নতুন ভবনে
প্রবেশের আবাহন! ছেদ নেই অমর এ জীবনে॥

[আর . এ. নিকলসন, রুমি, পোয়েট অ্যাণ্ড মিষ্টিক, লণ্ডন : অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন, ১৯৫০]

সনাতন ধর্ম

ভারতের সুপ্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে জড়াপ্রকৃতির সংগে সংশ্লিষ্টতার জন্য আত্মা ৮৪ লক্ষ প্রজাতির জীবদেহে নিরন্তর ভ্রমণ করতে থাকে। আত্মা সর্বদাই নিম্ন প্রজাতি দেহ হতে উচ্চ প্রজাতির-দেহে জন্ম লাভ করতে থাকে। পরিশেষে জীবাত্মা মানবদেহ প্রাপ্ত হয়। বৈদিক শাস্ত্রের তথ্যানুযায়ী চার লক্ষ প্রজাতির মানুষ পৃথিবীতে রয়েছে — নানা বর্ণ, নানা জাতিগোষ্ঠী, নানা মানসিকতার। চেতনার প্রকাশমানতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবাত্মা অনুন্নত থেকে নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত মানব প্রজাতিতে শরীর ধারণ করে; পাশবিক-ভাবাপন্ন হয়ে গেলে অবশ্য পুনরায় মনুষ্যেতর, অর্থাৎ মানুষ হতে নিম্নতর প্রজাতিতে জন্মাতে হয়। পুনর্জন্ম-তত্ত্ব সনাতন ধর্মের শাস্ত্রসমূহের একটি অন্যতম মূল তত্ত্বজ্ঞান ও অধ্যয়নের বিষয়।

এইভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম — ইহুদী, খ্রীষ্টান, ইসলাম — বাহ্যিকভাবে অগ্রাহ্য করলেও এই সব ধর্মের মূল শাস্ত্রসমূহে, প্রখ্যাত ধর্মপ্রবক্তা, সাধকবর্গের শিক্ষায় — সর্বত্রই পুনর্জন্মতত্ত্বের সুনিশ্চিত উপস্থিতি রয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মের আদিতে পুনর্জন্মতত্ত্ব বহুল প্রচলিত ছিল। ৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাইজানটাইন সম্রাট জাষ্টিনিয়ান রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে আত্মার পূর্ব-অস্তিত্বের তত্ত্ব-সম্পর্কিত শিক্ষাদান নিষিদ্ধ করেন। ঐ সময় চার্চের বহুসংখ্যক রচনা-কর্ম রাজাদেশে ধ্বংস করে ফেলা হয়, এবং বর্তমানে বহু গবেষক মনে করেন যে ঐসময়ে পুনর্জন্ম বিষয়ক সমস্ত প্রসঙ্গগুলো গ্রন্থ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এদের মধ্যে 'নোষ্টিক' (Gnostic-তত্ত্ববাদী) সম্প্রদায় চরম নিপীড়ন সত্ত্বেও জন্মান্তর তত্ত্বালোচনা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয় (নোষ্টিক শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'নোসিস্' থেকে, যার অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞান')।

রেনেসাঁ বা ইউরোপের সংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের সময় পুনর্জন্ম-তত্ত্বের প্রতি জনগণের আকর্ষণ পুনরায় নবরূপে পুষ্পিত হয়ে ওঠে। পুনর্জাগরণের অন্যতম মুখ্য অগ্রদূত ছিলেন **ইতালীর শীর্ষস্থানীয় কবি ও দার্শনিক জিওর্দানো ব্রুনো**, জন্মান্তরবাদ শিক্ষা দেবার জন্য খোটায় বেঁধে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের শেষ উত্তরদানের সময় ব্রুনো সকল ভীতি অগ্রাহ্য করে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, *"আত্মা এই দেহটি নয়,"* এবং তিনি আরো বল্লেন, *"এইদেহে না থাকলেও আমি অপর কোনো দেহে থাকব, এক দেহে থেকে অন্য দেহে অন্য দেহে দেহান্তরিত হব"*। শাসক ও চার্চের এইভাবে অত্যাচার নিপীড়িনের ফলে পুনর্জন্ম-সংক্রান্ত শিক্ষা অত্যন্ত সংগুপ্ত হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী ইউরোপে নানা গোপন ধর্মীয় গোষ্ঠির মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হয় — যেমন রোসিক্রুশিয়ান, ফ্রিম্যাসন্স্, ক্যাবালিষ্টস্ — ইত্যাদি।

আত্মার দেহান্তরের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ

অনেকে আপনাদের প্রশ্ন করতে পারে, *"তোমাদের এই কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করে হবেটা কি? মৃত্যুর পর কি হবে তা কি কেউ জানে? মৃত্যুর পর আবারও জন্ম হয় — সেটা কে দেখেছে? এসব ডাহা কল্পনা, অবাস্তব। ওইসব কল্প কথা ভুলে যাও, আর এই বর্তমান জীবনটা ভাল করে উপভোগ কর!"* আমাদের জানা উচিত যে এই ধরণের মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে দুর্ভাগা, কারণ তারা সেই মহত্তম, সত্যিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত, যা হচ্ছে ভগবদ্বিশ্বাস, শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানে বিশ্বাস। ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে এসমস্ত মানুষ এ-জীবনেও সুখী হতে পারে না, পরবর্তী জীবনেও

নয়। আমরা অবশ্য বিশ্ববিশ্রুত আরো অনেক বিজ্ঞানীদের পুনর্জন্মে বিশ্বাস-সংক্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত করতে পারি, কিন্তু প্রগাঢ় মতান্ধতা ও মেধাহীনতার জন্য এইসব মানুষদের সে-সব বোধগম্য হবে না। পুনর্জন্মের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হচ্ছে এ বিষয়ে কৃত গবেষণা-কর্ম। এইসব গবেষণা কর্মের ফলে জন্মান্তর-তত্ত্ব অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হয়।

অবশ্য, বিজ্ঞানে এমন কোন পন্থা বা উপায় (মেথডোলজি) এখনো নেই যাতে পুনর্জন্মের বাস্তবতা "প্রমাণ" করা যায়।। প্রকৃতপক্ষে, জড়বিজ্ঞান কেবল ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষণের মধ্যে, বস্তুজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেজন্য দেহাতিরিক্ত *সত্তা সম্বন্ধে বিজ্ঞান তথ্য দিতে পারে না। বিজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত অর্থে কোনো কিছুকেই চূড়ান্তভাবে 'প্রমাণ' করা যায়* না', বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা সতর্কতার সংগে তথ্য সংগ্রহ করি; তারপর সেগুলি পর্যবেক্ষণ করে যতদূর সম্ভব যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দান করে থাকি। তথ্য-সম্ভার যত বৃদ্ধি পায়, ব্যাখ্যার গভীরতাও তত বর্ধিত হয়। বিজ্ঞানে এইটিই অনুসরণ করা হয়, এবং ঐ একই পন্থা আমরা এই জন্মান্তরবাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারি।

ইউনিভার্সিটি অব্ ভার্জিনিয়ার সাইকিয়াট্রির প্রফেসর ডঃ ইয়ান স্টিভেনসন এবং আরো অনেক প্রথিতযশা গবেষক যেমন এস. প্যারিশ্চা, **গ্যাব্রিয়েল ডেলানে (১৯২৪), শির্লি (১৯৩২), বি. এল. আত্রেয় (১৯৫৭), পরিগুার (১৯৭৬), ম্যাক টেগার্ট (১৯১৫), ডুকাস (১৯৬২) এবং ব্রড (১৯৬২, ১৯৭৯)** — সকলেই পুনর্জন্ম বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন এবং এবিষয়ে বিস্তর গবেষণা করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে পুনর্জন্ম তত্ত্বকে সমর্থন করেছেন। বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে এতদবধি পুনর্জন্মের বাস্তবতা প্রমাণ করে পৃথিবীতে প্রায় শতাধিক বই লেখা হয়েছে, বহু গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

বিগত দুই দশককে, ডঃ স্টিভেনসন সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জন্মান্তরের প্রায় ২০০০-এরও বেশী বিভিন্ন বয়সের মানুষের কেস-হিস্ট্রি লিপিবদ্ধ করেছেন, যারা তাঁদের পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করতে পারে, এবং তার অভ্রান্ত প্রমাণও তারা রেখেছে। ডঃ স্টিভেনসন প্রায় ১৩০০টি কেস নিজে অনুসন্ধান করেছেন। যখন তাঁর কাছে বিশ্বের কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংবাদ আসে যে কেউ একজন তার গত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারছে ও ঘটনাটি সত্যি, স্টিভেনসন নিজে গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নেন, তার পরিপার্শ্বিক মানুষদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং সম্ভব হলে যেসব লোকেদের কথা সে স্মরণ করছে তাদেরও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তিনি সবসময়ই সাধারণ বাস্তবতায় এইভাবে বলা যায় কিনা, সতর্কভাবে তার সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেন, মিথ্যা বা প্রতারণার সমস্ত দিকগুলির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তিনি ঐসব বক্তব্যের মধ্যে অসংলগ্নতা আছে কিনা যাচাই করেন, সতর্কভাবে সবকিছুর সত্যতা পরীক্ষা করেন, নির্ভরযোগ্যতা বিচার করেন। এইভাবে যে প্রতিবেদনগুলি অবশেষে তৈরী হয়, তা জন্মান্তর তত্ত্বের খুবই জোরাল প্রমাণ।

বাংলাতেই সংগৃহীত পুনর্জন্মের এক বাস্তব কেস-হিস্ট্রি ঃ

ডঃ স্টিভেনসন-এর সংগৃহীত ২০০০ কেস-হিস্ট্রির একটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের একটি ছোট্ট মেয়ে শুক্লার। শুক্লার বয়স যখন মাত্র দেড় বছর, কথা বলতে শিখেছে কি শেখেনি, তখন থেকেই সে একটি বালিশ নিয়ে দোলনায় দোল দিত, আর বলত যে এটি

একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঃ

শুঁয়ো পোকা থেকে প্রজাপতি ঃ শুঁয়োপোকা সকলের কাছেই অপাংক্তেয় — তার বিদ্‌ঘুটে চেহারা, ততোধিক বিদ্‌ঘুটে চলাফেরা আর অ্যাসিড-ভর্তি শুঁয়ো বা রোমের জন্য — ছোঁয়া লাগলেই বিপত্তি। কিন্তু সেই শুঁয়োপোকা যখন বড় হয়, তখন সে নিজের মুখের লালা দিয়ে সুপুরির খোলসের মতো দেখতে একটি গুটি তৈরি করে। ঐ গুটির মধ্যে থেকে সে পুরো মুখটি আটকে দেয়। পরে গুটি ভেঙে বেরিয়ে আসে ঝলমলে, রঙীণ পূর্ণাঙ্গ এক প্রজাপতি — শিল্পের এক অনবদ্য সৃষ্টি, যার কাজ শুধু আনন্দে ওড়া আর ফুলের মধু খাওয়া। গুটির মধ্যে পড়ে থাকে শুঁয়োপোকার অস্পৃশ্য মৃতদেহটি। শুঁয়োপোকার দেহের মালিকটিই এখন প্রজাপতি দেহে, যে জীবন-কণা শুঁয়োপোকার দেহে ছিল, সেই জীবন-কণা এখন বিরাজ করছে প্রজাপতি দেহে ; দেহের সাথে সাথে তার বদলে গিয়েছে খাদ্যাভাস, চলন-গমন — সব কিছু।

হচ্ছে 'মিনু'। সে বলত সে মিনু হচ্ছে তাঁর মেয়ে। পরবর্তী তিন বছরে শুক্লা তার পূর্ব জন্মের অনেক ঘটনাই স্মরণ করতে পারল, যাতে বোঝা গেল যে মিনু সত্যিই গত জন্মে তাঁর মেয়ে ছিল।

শুক্লা ছিল পশ্চিমবঙ্গের কম্পা গ্রামের এক রেলকর্মীর মেয়ে। সে কেবল তার মেয়ে মিনুর কথাই বলত না, 'মিনুর বাবা', অর্থাৎ তার স্বামীর কথাও বলত, (অবশ্য তার নাম সে বলেনি — হিন্দু স্ত্রী তাঁর স্বামীর নামোচ্চারণ করে না)। সে তার গত জন্মের দুটি ভাইয়ের কথাও বলত — খেতু এবং কানাই। সে বলেছিল যে এরা সবাই ভাটপাড়ার রথতলাতে থাকত।

শুক্লার পরিবার — গুপ্তরা ভাটপাড়া অল্প চিনতেন; এটা ছিল প্রায় ১১ মাইল দূরের একটা বাজার, কিন্তু তাঁরা কখনো রথতলার কথা শোনেননি, বা যেসব লোকদের শিশু শুক্লা নাম করেছিল, তাঁদেরকেও তাঁরা চিনতেন না। শুক্লা সেখানে যাওয়ার জন্য জিদ করতে থাকে এবং বলে যে তারা না নিয়ে গেলে সে একাই ওখানে যাবে।

শুক্লার বাবা, শ্রী কে. এন. গুপ্ত বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর বন্ধুবান্ধবদেরকে বললেন। তিনি তাঁর একজন রেলের সহকর্মী, অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাষ্টার শ্রী এস. সি. পালকেও ঘটনাটি বলেন। শ্রীপাল ভাটপাড়ার কাছাকাছি অঞ্চলে থাকতেন, আর ভাটপাড়ায় তাঁর দুই ভাইপো থাকত। তাঁর ভাইপোদের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে সত্যিই ভাটপাড়ার কাছে রথতলা বলে একটি জায়গা রয়েছে। সেখানে খেতু বলে একজন ব্যক্তির খবরও পাওয়া গেল। খেতুর একটি শ্যালিকা ছিল, নাম মান্না। সে কয়েক বছর আগে (১৯৪৮) মিনু নামের একটি ছোট শিশু কন্যাকে রেখে মারা যায়। শ্রীসেনগুপ্ত বিষয়টি আরো অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিলেন। পরিবারের সম্মতি গ্রহণ করে তিনি একদিন রথতলায় যাবার জন্য তৈরী রহলেন। শুক্লা বলল যে সে পথ দেখিয়ে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারবে।

সুতরাং একদিন ১৯৫৯ সালে, শুক্লার বয়স যখন পাঁচ, শ্রীসেনগুপ্ত পরিবারের আরো পাঁচ জনকে ও শুক্লাকে নিয়ে ভাটপাড়ার দিকে রওনা হলেন। সেখানে পৌছাঁনোর পর শুক্লাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। বিভিন্ন মোড় অতিক্রম করে, ভুল রাস্তায় না গিয়ে সে সরাসরি সে তাঁর পূর্বজন্মের শ্বশুর অমৃতলাল চক্রবর্তীর গৃহে সবাইকে নিয়ে উপস্থিত হলে। ঘটনাক্রমে, ঐ বাড়ীর শ্রীচক্রবর্তী তখন বাড়ির বাহিরে রাস্তাতে ছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে শুক্লা সলজ্জভাবে তাঁর দিকে তাকাতে লাগল, ঠিক যেমন একজন বাঙ্গালী গৃহবধূ পরিবারের বয়স্ক পুরুষকে দেখে লজ্জা অনুভব করে থাকে। কিন্তু শুক্লা বাড়ীতে প্রবেশ করতে গিয়ে হতচকিত হলো। মনে হলো সে বাড়ীর প্রবেশ পথটি চিনতে পারছে না। পরে জানা গেল কেন এমন হয়েছে — মনার (শুক্লার পূর্ব জীবনের নাম) মৃত্যুর পর বাড়ীর প্রধান প্রবেশ পথ বড় রাস্তা থেকে সরিয়ে গলিতে করা হয়েছে।

গুপ্ত পরিবার অবিলম্বে দেখলেন, শুক্লা কেবল বাড়ীটিকেই সনাক্ত করে নি, বাড়ীর লোকজনকেও সে যথাযথভাবে চিনিয়ে ছিল — তাঁর (মনার) শ্বাশুড়ী মা, ঠাকুরপো, তাঁর স্বামী, এবং তাঁর মেয়েকে। সেসময় শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে শুক্লাকে ঘিরে ঐ ঘরটিতে প্রায় ২০ থেকে ৩০ জন লোক ছিল। যখন শিশু শুক্লাকে জিজ্ঞাসা করা হল, "তুমি কি এর মধ্য থেকে তোমার স্বামীকে দেখাতে পারো?" উত্তরে শুক্লা ঠিকঠিক ভাবে শ্রীহরিধন চক্রবর্তীকে চিনিয়ে দিল, সে-ই ছিল মনার স্বামী।

শুক্লা ও হরিধন চক্রবর্তীর এরপর বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, শুক্লা এজন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করত। যখন হরিধন চক্রবর্তী একবার শুক্লাদের বাড়ীতে এলেন, শুক্লা তাঁর পরিবারকে গলদা চিংড়ি রান্না করতে বলল; সে বলেছিল যে এটাই তাঁর পূর্ব-স্বামীর প্রিয় খাবার। তাঁর কথামত তাঁর পরিবার ঐ খাবারই তৈরি করলেন, এবং পরে তাঁরা দেখলেন যে শুক্লা ঠিক কথাই বলেছে। হরিধন চক্রবর্তীর সংগে ছোট্ট শুক্লা একজন যথার্থ হিন্দু স্ত্রীর মতোই আচরণ করত। শ্রীচক্রবর্তীর খাওয়া হলে সেই থালার অবশিষ্ট খাবার শুক্লা সযত্নে খেত, ঠিক যেমন একজন হিন্দু গৃহিণী করে থাকেন। কিন্তু শুক্লা কখনো অন্য কারো থালা থেকে তাদের উচ্ছিষ্ট খেত না।

আমাদের জীবনে পূর্বজন্মের প্রাসংগিকতা

উপরে উল্লেখিত ঘটনাটির মতো একইরকম ঘটনার সংগে পরিচিতি বহু মানুষের রয়েছে। তবুও অনেকেই মৃত্যুর পর জীবনের অস্তিত্বের কথা ভেবে ভীত হয়ে পড়েন, তাঁরা শীঘ্রই সবকিছু ভুলে গিয়ে দৈনন্দিন জীবনের বাঁধাধরা কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে পড়েন। বর্তমান যুগে মানুষ তাদের নিজস্ব কেরিয়ার, পরিকল্পনা নিয়ে এতই ব্যস্ত যে তাদের এর বাইরে ভাবনা-চিন্তা করার সময় বা ইচ্ছা, কোনটাই নেই। সবকিছুকেই তারা ব্যক্তিগত, ঐহিক লাভালাভের ভিত্তিতে বিচার করে থাকে ঃ *"বেশ, পুনর্জন্ম সত্যি। কিন্তু তা জেনে আমার লাভ কোথায়? এইসব নিরর্থক আলোচনার প্রয়োজন কি? আমার জীবনে পুনর্জন্মের কি উপযোগিতা আছে?"* নিঃসন্দেহে, আমাদের জীবনে পুনর্জন্মের অত্যন্ত অর্থপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। **যখন আমরা জন্মান্তর তত্ত্ব উপলব্ধি করি, তাকে সত্যি বলে স্বীকার করি, তখন স্বভাবতঃই এটি সুস্পষ্ট**

হয়ে ওঠে যে আমরা এই দেহ নই, আমরা চিন্ময় আত্মা। কিন্তু ঘুম থেকে সকালে জেগে ওঠার পর থেকে সারা দিনে-রাত্রে, শোবার সময় পর্যন্ত আমরা যা-কিছু করে থাকি — অফিসে যাওয়া, অর্থ রোজগার করা, খাওয়া, ঘুমানো, সন্তান উৎপাদন করা, আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করা, আমোদ-প্রমোদ করা — এ সবই আমরা করে থাকি দেহের জন্য, যেটি কেবল একটি পোশাক ছাড়া আর কিছুই নয়! আসল ট্র্যাজেডি আসে তখন, যখন দেহ-পোশাকটি জীর্ণ-হয়ে যায় আমাদের সঞ্চিত অর্থ, সম্পদ-সম্পত্তি, আত্মীয়স্বজন, পুত্র-পরিজন — এমনকি সকল কর্মাবর্তের কেন্দ্রবিন্দুস্বরূপ অতিপ্রিয় এই দেহটিকেও মৃত্যু নিষ্ঠুরভাবে ছিনিয়ে নেয়। আত্মাকে দেহ থেকে বের করে দেওয়া হয়, তারপর আত্মা পূর্ব দেহকৃত কর্মফল অনুসারে অন্যত্র কোনো একটি শরীর গ্রহণ করে থাকে।

অবশ্য, দেহান্তরিত হবার সময়, একটি-দেহ ত্যাগ করার সময় আত্মা পুরোপুরি জড়-আবরণ বা শরীর-পোশাক হতে মুক্ত হয় না। স্থূল শরীরটি চলে গেলেও মন-বুদ্ধি-ও অহঙ্কার (মিথ্যা 'আমি'-বোধ), এই তিনটি সূক্ষ্ম, অদৃশ্য জড় উপাদানে নির্মিত শরীরটি থাকে। যতদিন জড়বাসনা, ভোগপ্রবৃত্তি নির্মূল হয়ে শুদ্ধ ভক্তির উন্মেষ না হয়, ততদিন আত্মা জড়দেহ হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয় না।

এই সব বাসনা, কর্মফল, সূক্ষ্ম শরীরের সাহায্যে এক স্থূলদেহ হতে অন্য স্থূলদেহে বাহিত হয়। আত্মা তার সূক্ষ্ম শরীরে কি কি বহন করে নিয়ে যায়? (১) পুণ্য কর্মফল, (২) পাপ কর্মফল, (৩) ত্রিগুণের প্রভাব, (৪) জড় বাসনা, (৫) ভক্তিমূলক সুকৃতি। এগুলির মধ্যে প্রথম দুটির ফলে ভাল ও খারাপ ফল ভোগ করতে হয়, তৃতীয়টি অর্থাৎ বিভিন্ন মাত্রার ত্রিগুণের প্রভাবে বিশেষ ধরণের শরীর ও স্বভাব লাভ হয়, চতুর্থটি — অর্থাৎ জড়বাসনা জড়শরীর লাভকে সুনিশ্চিত করে (জড়জগৎরূপ কারাগারের মেয়াদ বৃদ্ধি করে) এবং পঞ্চম অর্থাৎ ভক্তিমূলক সুকৃতি বা সেবা-কর্ম আত্মাকে সমস্ত কর্মফল, গুণ-প্রভাব, জড়বন্ধন থেকে মুক্ত করে ভগবদ্ধামে নীত করে, যেখানে তিনি সরাসরি ভগবানের সংগে নিত্য লীলাবিলাসে অংশগ্রহণ করতে পারেন, যা দিব্যমধুর, পরমানন্দময়!

আপনি কি কসাইখানায় একটির পর একটি ছাগলের শিরশ্ছেদ হতে দেখেছেন? ছাগলের বুদ্ধির কথা একটু ভাবুন। একটি কসাইখানায় যদি দুটি ছাগল দেখেন, তাহলে দেখবেন যে একটি ছাগলকে যখন মুন্ড কেটে তাঁর চর্ম ছাড়িয়ে কেটে কেটে বিক্রি করা হচ্ছে, অন্য ছাগলটি তখন সামনে ফেলে দেওয়া কিছু কচি ঘাস পরম নিশ্চিন্ত মনে আধ বোজা চোখে চিবোচ্ছে! আপনি যদি তাকে গিয়ে বলেন, *'ওহে, দেখছ না এরপরই তোমার পালা আসছে? তোমারও এখনই মুন্ড কাটা হবে! ঘাসের লোভে এখানে পড়ে থেকো না, এখনি পালাও!'* সে আপনার কথায় আদপেই কর্ণপাত করবে না। সে তার অর্ধ-নিমীলিত চোখে সুখের আবেশে কেবল মাথাটি নাড়াবে, চিবোতে থাকবে কচি ঘাস। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ... ... অকস্মাৎ তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, এক ধারাল খড়্গ মাথার উপর নামে বিদ্যুৎগতিতে, আলাদা হয়ে যায় ধড় থেকে মুন্ডটি মুহূর্তেই, ভেঙে যায় সুখ-তৃপ্তির মুধর দিবাস্বপ্ন!

ঠিক তেমনিভাবে এই জড়জগতে আমাদেরকে খুবই সামান্য একটু ইন্দ্রিয়ভোগের সুযোগ দেওয়া হয়, আমরা তাতে গভীর ভাবে আসক্ত হয়ে পড়ি, তারপর একদিন সুন্দর এক সকালে পদাঘাতে দেহ থেকে আমাদের বার করে দেওয়া হয়, আমাদের সুখস্বপ্ন ভেঙে দেওয়া হয়। অতএব, আমরা যদি জীবনের এই মৌল প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধান না করি, তাহলে আমাদের জীবনটি হবে কেবল সময় ও কঠোর শ্রমের বৃথা অপচয়। **জন্মান্তর কি, কেন এটি ঘটে — এর কারণ কি? কোন বস্তু, বা কোন সত্তা দেহান্তরিত হয়? শরীর ত্যাগ ও শরীর গ্রহণের মধ্যে কতটা সময় অতিবাহিত হয়? জন্মান্তর কি প্রত্যেকেরই হয়, না কি কেবল কারো কারো হয়?** বৈদিক শাস্ত্রে এইসব প্রশ্নের অত্যন্ত সুস্পষ্ট, উত্তর দেওয়া হয়েছে।

সম্ভবতঃ যথাযথ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান একদিন এইসব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আসবে। ডঃ স্টিভেনসন ও অন্যান্য গবেষকগণের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে আমরা যথেষ্ট তথ্যসম্ভার হাতে পাচ্ছি, যা ইঙ্গিত করে যে জন্মান্তর একটি

বাস্তব সত্য। ব্যাপক ও গভীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান একদিন এবিষয়ে সত্য উদ্ঘাটিত করবে। অবশ্য ইতিমধ্যে আপনার অনেকবার, সম্ভবতঃ অগণিতবার পুনর্জন্ম হয়ে যেতে পারে।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যগণ অবশ্য এইধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর নির্ভরশীল নন — তাঁদের উপলব্ধির পন্থা ভিন্ন। আপনি আগে না দেখা একটি জটিল যন্ত্র দেখে তার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে কিভাবে সেটি কাজ করছে তা বোঝার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু ঐ যন্ত্রটিকে জানার সর্বোত্তম পথ হচ্ছে, যে-ব্যক্তি ঐ যন্ত্রটি ডিজাইন করেছেন, তাঁর কাছ থেকে জানা। ঠিক তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম-রীতি গুলি, অত্যন্ত সূক্ষ্ম পুনর্জন্মের জটিল ব্যবস্থা-সহ **জগৎ ও জীবনের নানা রহস্যময় প্রহেলিকার প্রকৃত উত্তর আমরা সেই ব্যক্তির নিকট থেকে পেতে পারি, যিনি এই সব কিছুর উদ্ভাবক, নির্মাতা।** সেজন্য, স্বয়ং ভগবানই এ-সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান প্রদান করতে পারেন, এবং বিশ্বমানবের কল্যাণার্থে তিনি বৈদিক শাস্ত্রের নির্যাস **ভগবদ্গীতা** ও **শ্রীমদ্ভাগবতে** এ-সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করেছেন। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে গুরু পরম্পরা ধারায় যথার্থ সদগুরুর আনুগত্যে ঐ জ্ঞান-সম্ভার অধীত করতে প্রয়াসী হওয়া।

পারমার্থিক বিবর্তন

দেহের রূপান্তর

জড়জগতে প্রতিটি জীব সত্তার দেহটি একটি জড়-উপাদানে গঠিত যন্ত্র, এবং প্রতিটি দেহেরই ছয়টি রূপান্তর বা পরিবর্তন ঘটে থাকে ঃ জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, উপজাতসৃষ্টি, ক্ষয়, মৃত্যু (সন্তান)। এই ছয়টি রূপান্তর সমস্ত জীবদেহেরই হয়ে থাকে — উদ্ভিদ, পশু, মানুষ, সকলেরই। মানুষের ক্ষেত্রে, শিশুর জন্ম হয়, তার দেহের বৃদ্ধি হয়ে যুবক হয়, কিছু কাল সেই অবস্থায় থাকে, সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি হয়, দেহ জরাগ্রস্ত হয়, তারপর মৃত্যুর মাধ্যমে দেহটি ধ্বংস হয়ে যায়। আমাদের তথাকথিত জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এই প্রক্রিয়াটিকে স্তব্ধ করে দিতে পারি না। কখনো কখনো মানুষ মূর্খামি করে ভেবে থাকে যে বিজ্ঞানের প্রগতির মাধ্যমে মানুষ একদিন অমরত্ব লাভ করবে! **আমরা যদি এমনকি দেহের এই অনিবার্য ছয়টি পরিবর্তনের একটিকেও থামিয়ে দিতে না পারি, তাহলে মৃত্যুকে প্রতিহত করার প্রশ্ন কোথায়?**

জড় দেহ ঃ আত্মার পরিবর্তনশীল পোশাক

জড়দেহটি সর্বদা পরিবর্তনশীল। কোষগুলি সদা-সর্বদা রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। সাত বছর অন্তর দেহের সমস্ত কোষগুলিই যায় বদলে। আপনি সাত বছর বা চোদ্দ বছর পূর্বে যে দেহটি ব্যবহার করতেন, এখন আপনার সেই দেহটি নেই। ঠিক যেমন আপনার কয়েক বছর আগের পোশাকটি এখন আর পূর্বের মতো নেই। একটি নধর কোমল শিশুদেহ এভাবে ৮০ বছরে এক জরা-জীর্ণ দেহে রূপান্তরিত হয়।

কিন্তু অস্থায়ী জড়দেহ-রূপ পোশাকটির এতসব রূপান্তর ঘটলেও দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে — আত্মার কোনো পরিবর্তন বা বিকার হয় না (*অবিকারী, ভ.গী - ২/২৫*)। আত্মার এমনকি জন্ম বা মৃত্যুও নেই, কেননা আত্মা শাশ্বত। সেজন্য শরীর পরিবর্তিত হলেও আত্মা থাকে অপরিবর্তিত। অমবস্যায় চাঁদ থাকে অদৃশ্য ; তারপর "প্রথমা", "দ্বিতীয়া" তারপর "তৃতীয়া" — এইভাবে তিথির সংগে চন্দ্রকলা বাড়তে থাকে, অবশেষে "চতুর্দশী"-র পর আসে পূর্ণিমা। তারপর চন্দ্রকলা হ্রাস পেতে থাকে। ১৪দিন পর আসে অমাবস্যা — চাঁদকে আর দেখাই যায় না। এইভাবে হ্রাস-বৃদ্ধির এই চক্র ক্রমাগত চলতেই থাকে। কিন্তু স্বয়ং চাঁদের কি কোনো পরিবর্তন হয়? আদপেই নয়। আমাদের আপেক্ষিক অবস্থানের জন্য আমাদের কাছে চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি প্রতীয়মান হয়,-আমরা একে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া বলে থাকি। আমাদের অবস্থানের ভিত্তিতে আমরা এমন মনে করে থাকি — চাঁদের কোনো পরিবর্তন হয় না। ঠিক তেমনি, আমরা পরিবর্তনশীল দেহের সংগে নিজেদের আত্মপরিচয় মিশ্রিত, একীভূত করে ফেলি, অর্থাৎ শরীরের সংগে

নিজেদেরকে সম্পৃক্ত ফেলি। আমরা অবিরাম বিভিন্ন ধরণের শরীরের অভিজ্ঞতা পেতে থাকি — শিশুদেহ, কৈশোর, বার্ধক্য, মৃত্যু, কখনো উদ্ভিদ দেহ, কখনো পশু-দেহ। আমরা জড়-অস্তিত্বের এইসব নানা অবস্থার সংগে নিজেদেরকে এক করে ফেলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা স্বরূপতঃ অপরিবর্তনীয় শাশ্বত আত্মা, ঐ সব অবস্থার সংগে আমাদের কোনো শাশ্বত সম্পর্ক নেই। বাহ্যিক স্থূল দেহটি আসলে এই জড়জগতে চলবার উপযোগী আত্মার একটি কোটের মতো। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেন, **"মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন।"**

বিবর্তন-এর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান

বিভিন্ন প্রজাতির শরীরের মধ্য দিয়ে আত্মার অভিযাত্রাকে বলা হয় পারমার্থিক বিবর্তন। কিভাবে তা ঘটে? প্রজাতির দেহ-গুলির বিবর্তন ঘটে না ; ৮৪ লক্ষ জীব-প্রজাতি ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহগুলি সৃষ্ট হবার পর উচ্চতর কর্তৃপক্ষের (ব্রহ্মার) অধ্যক্ষতায় যুগপৎ প্রকশিত হয়। নিম্নতর হতে উচ্চতর জীব-শরীরের মধ্য দিয়ে জীব-সত্তাগুলি ভ্রমণ করতে থাকে, তারা চেতনা বিকাশের সাথে সাথে উচ্চতর দেহ প্রাপ্ত হয়। এটিই হচ্ছে পারমার্থিক বিবর্তন।

শাস্ত্রের মাধ্যমে জীবাত্মার এই পারমার্থিক বিবর্তন যথাযথভাবে উপলব্ধি করা কর্তব্য। স্বরূপতঃ জীবসত্তা হচ্ছে একজন জড়াপ্রকৃতির সংস্রবরহিত চিন্ময় জীব, কিন্তু যখন সে জড়জগৎ ভোগে উন্মুখ হয়, তখন সে জড়জগতে অধঃপতিত হয়। এরপর সে জলচর, উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, পাখী, পশু প্রভৃতির লক্ষ লক্ষ প্রজাতি শরীরে জন্ম-মৃত্যু ভোগ করতে করতে মানব দেহ লাভ করে ও শাশ্বত জগতে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে আপন নিত্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়। এই সুযোগের অপচয় করলে পুনরায় নিম্নতর প্রজাতি-দেহে অধঃপতিত হতে হয়। অর্থাৎ, চেতনার বিবর্তন অনুসারে জীবাত্মা উন্নততর শরীর লাভ করতে থাকে। মানব শরীর কেবল ভগবদুপলব্ধির জন্য, আত্মজ্ঞান লাভের জন্য — পশুদের অনুকরণের জন্য নয় ;তাহলে বিবর্তনের বিপরীত পথে আবার পশুদেহ কিংবা উদ্ভিদ দেহে আবর্তিত হতে হয় (শ্রীমদ্ভাগবত — ৪/২২, ৯/৪)।

বিভিন্ন জীব-প্রজাতির মধ্যে মানব-প্রজাতিতে দেহলাভ এক দুর্লভ সুযোগ। ভগবৎচেতনা লাভের দ্বারা এই সুযোগের সর্বোত্তম সদ্‌ব্যবহার হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে ঃ

অশিতিং চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তাঞ্জীবজাতিষু
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্যং মনুষ্যং জন্মপর্যায়াৎ।
তদপ্যাফলতাং জাতঃ তেষামাত্মাভিমানিনাম্
বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্॥

"ক্রমবিকাশের ক্রমিক পর্যায়ে চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করার পর জীব মনুষ্য দেহ লাভ করে। এত দুর্লভ এই মনুষ্য জন্ম পেয়েও গণ্ডমুর্খ ব্যক্তিরা শ্রীগোবিন্দের চরণকমল-যুগলের আশ্রয় গ্রহণ না করে তা হেলায় নষ্ট করে।"

পদ্মপুরাণেও বলা হয়েছে ঃ

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতি।
ক্রিময় রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষাণি।
পশবঃ ত্রিংশ লক্ষাণি চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ॥

" নয় লক্ষ প্রকার জলজ প্রাণী রয়েছে। বৃক্ষ-লতা রূপে কুড়ি লক্ষ স্থাবর প্রাণী রয়েছে। কীটপতঙ্গ ও সরীসৃপ রয়েছে এগারো লক্ষ । পাখি হচ্ছে দশ লক্ষ। ত্রিশ লক্ষ পশু এবং চার লক্ষ প্রজাতির মানুষ রয়েছে।"

জীববিজ্ঞানীরা "প্রজাতি" বলতে যা ধারণা করেন, তার সংগে শাস্ত্রোক্ত যোনি বা প্রজাতির পার্থক্য রয়েছে। **বিজ্ঞানীরা "প্রজাতি" শব্দের দ্বারা কেবল কোনো নির্দিষ্ট ধরণের জীব-শরীরের বাহ্যিক চেহারা বা কেবল স্থূল অঙ্গ-কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যকে বোঝান। বৈদিক শাস্ত্রে এই বিষয়টি নির্ধারণ করা হয় জীবের চেতনার স্তরের ভিত্তিতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জীববিজ্ঞানীদের মতানুসারে মানুষ কেবল একটি প্রজাতি, পক্ষান্তরে বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে চার লক্ষ প্রজাতির মানুষ রয়েছে।**

অন্য কথায়, চেতনার বিভিন্ন স্তর অনুসারে চার লক্ষ পর্যায়-ক্রমের মানুষ রয়েছে। চেতনার নিম্নতর অবস্থায় একটি জীবসত্তা মানবদেহে অবস্থান করেও প্রায় পশুদের মতো আচরণ করে। আরেকটু উন্নত স্তরে, তার চেতনা কিছুটা বিকশিত হলে সে হয়ত তার নিজ স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে এসে তার পরিবারের স্বার্থের কথা ভাবতে থাকে, পরিবারের সদস্যদের সুখের জন্য ত্যাগ-স্বীকার করে। আরো উচ্চতর স্তরে সে তাঁর গোষ্ঠীর মানুষের কথা, তারপর তার রাজ্য ও দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে। তারপর চেতনার উন্নততর অবস্থায় সে হতে পারে একজন মানবতাবাদী — বিশ্বমানবের কল্যাণব্রতী। তারপর, বহু জন্ম ধরে চেতনার উপযুক্ত বিকাশের পর সে উপলব্ধি করতে পারে যে সকল জীবসত্তার উৎস, আশ্রয়, পরমগতি হচ্ছেন ভগবান, এবং তাঁকে ভালবাসাই পরম স্বার্থ, জীবনের পরম সার্থকতা। এরপরও বহু জন্ম ধরে দেবদেবী ও ভগবান সম্বন্ধে ধারণার ক্রমবিবর্তন চলতে থাকে। এই বিকাশ-ক্রিয়া তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন সে জানতে পারে যে ভগবান হচ্ছেন বাসুদেব, কৃষ্ণ; তিনি সর্বকারণের কারণ।

চেতনা যতদিন না পূর্ণবিকশিত না হয়, ততদিন বিভিন্ন শরীরে জন্মান্তর চলতেই থাকে। জন্ম-মৃত্যুর এই অন্তহীন পুনরাবৃত্তি স্তব্ধ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই জড়া প্রকৃতির গুণময়ী আবরণ হতে বিমুক্ত হয়ে নির্মল, শুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত হতে হবে। সেজন্য যদি আমরা মানব শরীর লাভ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের অপ্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা না করি, তাহলে মৃত্যুর পর অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদের অন্য আরেকটি জীব-শরীরে দেহান্তরিত হতে হবে — বর্তমানের থেকে ভাল বা মন্দ যেকোন শরীরে।

বিভিন্ন ধরণের জীব-শরীরের উদ্ভব হয় জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ — সত্ত্ব, রজ, ও তমোর বিভিন্ন মাত্রার সমন্বয় ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে। বিভিন্ন ধরণের জীব-শরীর ঠিক বিভিন্ন আকার-আয়তনের, বিভিন্ন রঙের অস্থায়ী বাড়ী বা ঘরের মতো, যার মধ্যে শাশ্বত সত্তা, জীবাত্মা কিছুকালের জন্য বাস করে থাকে। একটি শহরে যেমন বিভিন্ন ধরণের বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়, ভাড়া দেবার ক্ষমতা অনুসারে কোনো মানুষ ভাল বা মন্দ কোন একটি বাড়ীতে প্রবেশ করে, তেমনি চেতনার অবস্থা, কর্মফল অনুসারে জীব-সত্তা কোন এক নির্দিষ্ট জীব-শরীরে প্রবেশ করে থাকে। সমস্ত প্রজাতির জীব-শরীর যুগপৎ সবসময়ই বিদ্যমান; ঠিক যেমন বিভিন্ন ধরণের বাড়ী সবসময়ই রয়েছে। জীবসত্তাসমূহ তাদের চেতনা-বিকাশের প্রয়োজন অনুসারে জীব-শরীরগুলি ব্যবহার করে থাকে। বাড়ী ভাড়া নেবার মূল্যের মতো জীবসত্তার জন্য উচ্চ-নিম্ন শরীরের কোনো একটি লাভের মূল্য হচ্ছে কর্ম। পুণ্য-কর্ম-প্রভাবে উন্নত শরীর লাভ হয়, পুণ্যকর্মের অভাবে অনুন্নত শরীর লাভ হয়। কর্মফল অবশ্য কেবল মানবদেহেই সঞ্চিত হয়, পশুদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয় না।

ত্রিগুণ দ্বারা পরিচালিত জৈব শরীরগুলি জীবসত্তার চেতনার গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এর ফলে একটি বাঘের শরীরে অবস্থান-রত জীবাত্মা বাঘের মতোই গর্জন করতে চাইবে এবং খাদ্যের জন্য পশুদের হত্যা করবে; তেমনি শুভ্র রাজহংসের দেহে অবস্থানরত জীবসত্তা শান্ত স্নিগ্ধ জলাশয়ে সাঁতার কাটতে আর উড়তে পছন্দ করবে। যদিও সমস্ত পশুরাই তমোগুণে আচ্ছন্ন, তবুও কিছু পরিমাণে সত্ত্ব ও রজোগুণের প্রভাবও বিভিন্ন মাত্রায় তাদের মধ্যে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, গরু খুব সরল নিরীহ প্রাণী, তাদের আচরণও কোমল, তারা কিছু পরিমাণে সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত। পক্ষান্তরে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র পশুদের স্বভাব রজোগুণাত্মক। সবসময় ঘুমাতে ভালবাসে

ও অলস প্রকৃতির প্রাণী শ্লথ অত্যন্ত তমোভাবাপন্ন। এইভাবে ত্রিগুণের বিভিন্ন মাত্রার মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা অনুশাসিত লক্ষ লক্ষ জীব-প্রজাতির শরীর রয়েছে; জীবসত্তা যেমন চেতনা সম্পন্ন, তাকে জড়া প্রকৃতি সেইরকম একটি উপযোগী দেহে প্রেরণ করে থাকে। চেতনার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরবর্তী জন্মগুলিতে দেহেরও পরিবর্তন হতে থাকে। এইভাবে চেতনা যতদিন জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা সম্পৃক্ত থাকে, ততদিন ত্রিগুণাত্মক জীবশরীর, জড়ীয় পোশাক পরিগ্রহ করতে হয়।

জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ

জড়া প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা — তিনটি গুণে গঠিত; এগুলি হচ্ছে (১) সত্ত্ব গুণ (২) রজো গুণ এবং (৩) তমো গুণ।

'গুণ' শব্দের অপর একটি অর্থ হচ্ছে 'রজ্জু' বা দড়ি। তিন 'তন্তু' (সূত্র) পাকিয়ে দড়ি তৈরী করা হয়। প্রথমে তন্তু পাকিয়ে তিনটি সূত্র করা হয়। তারপর এগুলি পাকিয়ে একটি মোটা সূত্র হয়। এইরকম তিনটি করে সূত্র পাকিয়ে অপেক্ষাকৃত মোটা সূত্র বানানো হয় এবং এইরকম আরো তিনটি সূত্র অসংখ্যবার পাকিয়ে খুব শক্ত দড়ি তৈরি করা হয়। এইভাবে তিনটি গুণ পারস্পরিক মিশ্রণে প্রথমে নয় রকমের হয়, ঐগুলির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া থেকে ৯ × ৯ = ৮১টি মিশ্রণ হয়; এইভাবে তিনটি গুণের মিথস্ক্রিয়ায় অসংখ্য 'রঞ্জক' বা মিশ্রণ উৎপন্ন হয়, ঠিক যেমন লাল, হলুদ ও সবুজ — এই তিনটি রঙের বিভিন্ন মাত্রার মিশ্রণে বহুরকমের রঞ্জক সৃষ্টি করা যায়।

এই 'গুণ' বা দড়ির দ্বারা জড়া শক্তি জীবাত্মাকে জড় জগতে আবদ্ধ করে রাখে। চেতনায় জড় গুণের প্রভাব যত বর্ধিত হয়, জড়বন্ধন ততই তীব্র হয়, জড় আসক্তি ততই প্রবল হতে থাকে। আমাদের নিজেদের চেষ্টায় আমরা এই গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারি না।

জীবাত্মার এই জড়বন্ধনে আবদ্ধ থাকাকে শাস্ত্রে **'প-বর্গ'** বলে অভিহিত করা হয়েছে, আর বন্ধনমুক্তিকে বলা হয় **'অপবর্গ'**। ব্যকরণের বর্ণমালা পাঁচটি বর্গে বিভক্ত; এর মধ্যে পঞ্চম বর্গটি হচ্ছে প; এই বর্গে পাঁচটি বর্ণ রয়েছে ঃ প, ফ, ব, ভ, ম। জড়বন্ধনকালীন দুর্দশাকে পাঁচটি অক্ষরের প্রতীকে ব্যক্ত করা হয়েছে ; তা এইরকম ঃ

প = পরিশ্রম ঃ এই জগতে প্রত্যেক জীব সত্তাকে 'বেঁচে' থাকার জন্য অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। একে বলা হয় 'জীবন সংগ্রাম', অস্তিত্ব রক্ষার কঠোর লড়াই।

ফ = ফেনা ঃ যখন একটি ঘোড়াকে কঠোর পরিশ্রম করানো হয়, যেমন একটি ভারী মালবোঝাই গাড়ী টানানো — তখন তার মুখের দু'পাশ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসে। ঠিক তেমনি আমাদেরকেও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়; সরাসরি দেখা না গেলেও ঐ একইভাবে যেন মুখে ফেনা বেরিয়ে আসে — অর্থাৎ শেষ শক্তি ব্যয় করে পরিশ্রম করে যেতে হয়। প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রাত-দিন জ্ঞান না করে পরিশ্রম করে চলে।

ব = ব্যর্থতা ঃ আমাদের কঠোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই জগতে আমাদের সকল আশা ব্যর্থ হয়, সকল প্রয়াস বিফল হয়।

ভ = ভয় ঃ জড় জাগতিক জীবনে আমরা সর্বদাই নানা ভয়, উৎকণ্ঠা, শঙ্কার দাবানলে দগ্ধীভূত হতে থাকি।

ম = মৃত্যু ঃ আমাদের সমস্ত আশা, মমত্বলালিত সুখস্বপ্নের অন্তিম সমাধি রচনা করে অপ্রতিরোধ্য, অনিবার্য মৃত্যু। জন্মের পর জন্ম — অন্তহীন কাল ধরে জড় অস্তিত্বের দুর্দশাভোগ থেকে, এই 'প-বর্গ' থেকে বেরিয়ে আসার নিশ্চিত উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন। অন্য কথায়, কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করলে আমরা 'অপবর্গ' লাভ করি,

যার অর্থ হচ্ছে এই প-বর্গ হতে অব্যাহতি, অর্থাৎ আমরা এমন স্তরে উন্নীত হই, সেখানে এই জড় অস্তিত্ব-জাত কঠোর সংগ্রাম, ব্যর্থতা, ভয় বা মৃত্যু — কোনটিরই অস্তিত্ব নেই।

সত্ত্ব, রজো, ও তমোগুণে প্রভাবিত মানুষের লক্ষণ

সত্ত্ব গুণ ঃ

সত্ত্ব গুণসম্পন্ন মানুষ অন্যদের থেকে জ্ঞানী হন। যেহেতু তিনি শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করেন, সেজন্য তিনি জড় দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হন না। তিনি নিজেকে জ্ঞানী মনে করেন। নিজেকে জড়-বিষয়ক জ্ঞানে অন্যদের থেকে তিনি সুখী ভাবেন, কেননা তিনি পাপকর্মের কু-ফল থেকে অনেকটা মুক্ত থাকেন। সত্ত্বগুণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছেন একজন যথার্থ ব্রাহ্মণ

যখন কোন জীবসত্তা সত্ত্বগুণে প্রভাবিত হয়ে মানব শরীর ধারণ করে, তখন তিনি নিজেকে অন্যদের তুলনায় বেশী জ্ঞানী ও সুখী বলে অভিমান করেন এবং এইভাবে জ্ঞানাসক্তি ও সুখাসক্তি দ্বারা আবদ্ধ হন। এর প্রকৃষ্টতম উদারহণ হচ্ছে বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ। এঁদের প্রত্যেকেই তাঁর নিজের জ্ঞানের জন্য খুবই গর্বিত, এবং যেহেতু তারা ধীরে ধীরে তাঁদের জীবনের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে থাকেন, সেজন্য তাঁরা এক ধরণের জড় সুখ অনুভব করতে থাকেন। উন্নত সুখের এই ধারণার ফলে তাঁরা জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণের দ্বারা আবদ্ধ হন। যতদিন তাঁরা এইভাবে কর্ম সম্পাদনে আগ্রহী থাকবেন, জ্ঞানাসক্তি (জড় জ্ঞান) ও সুখাসক্তি দ্বারা আবদ্ধ থাকবেন, ততদিন তাঁদেরকে একের পর এক এইরকম জড় শরীর ধারণ করতে হবে। এইভাবে মুক্তিলাভ করে চিন্ময় জগতে ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা তাদের থাকে না। এইভাবে বার বার একজনকে বিজ্ঞানী হয়ে জন্মাতে হয়, কাউকে বা বার বার দার্শনিকের জন্ম গ্রহণ করতে হয়, এবং প্রত্যেক জন্মে জন্ম, জরা, মৃত্যু-রূপ ভয়ঙ্কর অসুবিধাগুলি তাঁদের সহ্য করতে হয়। কিন্তু মায়াময় জড়াশক্তির দ্বারা মোহিত হবার ফলে প্রত্যেক জীবনকেই তাঁরা অত্যন্ত সুখময় বলে মনে করেন। সেইজন্য, ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, **"হে নিস্পাপ, এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত নির্মল, প্রকাশক এবং পাপশূন্য। এই সত্ত্বগুণ 'আমি সুখী' এই প্রকার সুখাসক্তি এবং 'আমি জ্ঞানী' এই প্রকার জ্ঞানাসক্তির দ্বারা আত্মাকে আবদ্ধ করে।"** (ভ. গী. ১৪/৬)

সত্ত্বগুণে প্রভাবিত হবার দৃষ্টান্ত ঃ

ডঃ ব্রাইট ও তাঁর স্ত্রী মিসেস ব্রাইট তাঁদের দুটি সন্তান সহ একটি শান্ত গ্রাম্য শহরে একটি ছোটখাট কিন্তু সুন্দর একটি গৃহে থাকেন। ডঃ ব্রাইট একজন স্থানীয় এম. ডি; তিনি খুব চিন্তাশীল, গুণবান মানুষ এবং তাঁর দায়িত্ব সততার সংগে নিঃস্বার্থভাবে পালন করার জন্য তিনি তাঁর অঞ্চলে অত্যন্ত সম্মানিত। তাঁর সখ হচ্ছে দর্শন, কাব্য ও বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বই পড়া। ছেলেমেয়েরা যখন বাড়িতে থাকে, তখন মিসেস ব্রাইট তাদেরকে নিয়ে বাড়ীর চারপাশের বাগান দেখাশোনা করেন, শাক-সব্জী চাষ করেন এবং তাঁদের গরুটির যত্ন নেন। এই ব্রাইটেরা বেশ সচ্ছল, সম্পন্ন পরিবার; এবং ঈশ্বর তাঁদের যা দিয়েছেন সেজন্য তাঁরা তাঁকে ধন্যবাদ জানান, এবং ধর্ম আচরণকে এক অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। যে কেউ-ই তাঁদেরকে অত্যন্ত পুণ্যবান বলে নিঃসন্দেহে অভিহিত করবেন। তাঁরা জুয়া বা লটারী খেলেন না, সবরকম নেশা তাঁরা কঠোরভাবে বর্জন করেছেন; মদ্যপান বা ধূমপান দূরে থাকুক, তাঁরা চা কিংবা কফিও পান করেন না। চিকিৎসক ব্রাইট তাঁর অনেক রুগীদেরকে তাদের অবৈধ যৌন সংসর্গের জন্য নানা রোগে ভুগতে দেখেছেন; তাঁদের পরিবার সম্পূর্ণভাবে অবৈধ সংসর্গ থেকে মুক্ত। তিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত, তাঁর স্ত্রীও তাঁর প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত। বহু পূর্বেই ব্রাইট ও তাঁর স্ত্রী স্থির করেছিলেন যে, যেহেতু পশুহত্যা সংগঠিত পাপকর্ম, সেজন্য তাঁরা পশুদের দেহ ভক্ষণ

করবেন না। সুতরাং তাঁরা নিরামিষ আহার করেন — মাছ-মাংস কখনই গ্রহণ করেন না। এইভাবে, ব্রাইটেরা খুব পরিচ্ছন্ন, সরল ও সুখী জীবন যাপন করেন। কিন্তু ব্রাইট সম্পত্তি সুখ ও জ্ঞানের অভিমানের দ্বারা প্রভাবিত; তাঁরা তাঁদের স্বপ্নিল সুখময় জগতের প্রতি আসক্ত; সেজন্য তাঁরা সত্ত্বগুণের দ্বারা জড়াপ্রকৃতিতে আবদ্ধ রয়েছেন।

রজোগুণ

নর-নারীর পারস্পারিক আকর্ষণের সৃষ্টি হয় রজোগুণের ক্রিয়ার ফলে। নারী পুরুষের প্রতি আসক্ত, পুরুষ নারীর প্রতি আকৃষ্ট। এই আকর্ষণ রজোগুণের প্রভাব সৃষ্ট। যখন এই রজোগুণ কোন মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পায়, তখন **প্রবল জড়বিষয়ভোগের বাসনা** উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগের জন্য তাঁর হৃদয় অত্যন্ত লুব্ধ হয়। ইন্দ্রিয়সম্ভোগের জন্য মানুষ সমাজের মধ্যে বা জাতির মধ্যে সম্মানিত হতে চায়, এবং একটি সুন্দর বাড়ী, সুন্দরী স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি সুখী পরিবারে নিজেকে দেখবার জন্য সে অত্যন্ত আকুল হয়ে ওঠে। সে ধনী, যশস্বী হতে চায়, উচ্চপদ লাভ করতে চায়, প্রভাবশালী রজোগুণের এই ক্রিয়ার ফল তার মধ্যে প্রকাশিত হয়। যতক্ষণ হৃদয়ে রজোগুণজাত আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ **তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়**। স্ত্রী, সন্তান ও সমাজকে পরিতুষ্ট করার জন্য তাঁকে তার সমগ্র জীবনীশক্তি প্রয়োগ করে পরিশ্রম করতে হয়। রজোগুণসম্পন্ন মানুষ সকাম কর্মে নিয়োজিত হয়; তাঁর মধ্যে প্রবল কর্মোদ্যম দেখা দেয়। সে যতটা সম্ভব জড় সম্পদের অধিকারী হবার চেষ্টা করে, এবং কখনো কখনো সৎকাজে তা ব্যয়ও করে থাকে। সমাজে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সে হাসপাতাল খোলা, বিভিন্ন দাতব্য সংস্থায় অর্থদান ইত্যাদি করে। বাড়ী করতে চাইলে সে প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরী করতে চায়, সকলের উপর প্রভুত্ব করতে চায়, সবকিছুই তার ইচ্ছায় পরিচালিত হোক — এইরকম সে আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে, এবং এইসব আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সে চেষ্টার ত্রুটি করে না। এইভাবে রজোগুণের প্রভাবে তার মন সর্বদাই নানা দুষ্পূরণীয় বাসনায় অধীর থাকে। আধুনিক মানব সভ্যতা বিশেষভাবে রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত; গগনচুম্বী অট্টালিকা, বিশাল বিশাল শহর, অতিকায় সব কলকারখানা, অতি দ্রুতগতি যানবাহন, রকেট, অতি ভয়ংকর বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র — সবই রজোগুণের প্রকাশ। এই সভ্যতা রজোগুণের পরিপ্রেক্ষিতে 'উন্নত', সত্ত্বগুণের ভিত্তিতে বিচার করেল এই সভ্যতা কেবল উৎকট কামনার প্রকাশ মাত্র। সমগ্র জড়জগত কম-বেশি রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত এবং আধুনিক জড়সভ্যতা বিশেষভাবে রজোগুণের দ্বারা আশ্লিষ্ট। প্রাচীন বৈদিক সভ্যতা ছিল সত্ত্বগুণভিত্তিক।

রজোগুণের প্রভাবের দৃষ্টান্ত ঃ

শহরতলীর একটি অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধাযুক্ত বাড়ীতে বাস করেন স্মিথ পরিবার। প্রতিদিন সকালে ল্যারি স্মিথ অতি দ্রুত প্রাতরাশ গলাধঃকরণ করে ছোটেন যানবাহন ধরে যথাসময়ে অফিসে পৌছাতে। সেখানে সারাদিন তাঁকে বিস্তর ঝক্কি ঝামেলায় ব্যস্ত থাকতে হয়। তাঁর কাজটা বেশ কঠিন, কিন্তু তিনি এটাকে মেনে নেন এজন্য যে এই চাকরি তাঁকে এমন রোজগার দেয় যা দিয়ে তিনি বিলাসিতার সংগে কাটাতে পারেন, এবং তারপরও কিছু টাকা থাকে যা দিয়ে তিনি স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করেন এবং পাশাপাশি রহস্যময় কিছু ব্যবসাও করে থাকেন। "মুদ্রাই মধু" (*মানি ইজ হানি*), ল্যারির দর্শন। তাঁর স্ত্রী গ্লোরিয়া সকালে উঠে তার ছেলেমেয়েদের সাজগোজ করিয়ে স্কুলে পাঠান (পারিবারিক সম্মান স্মিথদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ), গ্লোরিয়ার সারা দিনের সঙ্গী তাঁর শিশুটি (*"যাকে আমরা চাইনি"*, ল্যারী বলেন)। গ্লোরিয়া বাড়ীতে থাকার সময় টিভি চলতে থাকে; তিনি খেলার মাঠে অন্যান্য গৃহবধু ও ছেলেমেয়েদের সংগে সময় কাটান, বিউটি পার্লারে যান, কিংবা শপিং বা কেনাকাটা করতে বেরোন (কখনো মনে হয় যে এটির কোনো শেষ নেই)। সারা দিনটা এভাবে স্মিথেরা কর্মমুখর, ব্যস্ত থাকেন, রাত্রে তাঁরা বিশ্রাম নেন; কিন্তু দিনের ধকল খুব বেশি হওয়ার জন্য প্রায়ই রাত্রে তাঁদের সুনিদ্রা হয় না। কখনো তাঁরা অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে কথা কাটাকাটি করতে

থাকেন। তবে মি. ল্যারি এবিষয়ে বিজ্ঞের অভিমত প্রকাশ করে বলেন, *"এমন কোনো সমস্যা নেই, রতিক্রিয়ায় যার সমাধান হয় না!"* সপ্তাহ শেষে রবিবার তাঁরা নিজেদেরকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করতে গীর্জায় যান, কিন্তু এটা আসলে একটি সামাজিক ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়, কেননা তাঁরা সচরাচর ধর্মগ্রন্থের নির্দেশের পরিপন্থী আচরণ করে থাকেন। এই পরিবারটি আদর্শ রজোগুণ সম্পন্ন পরিবার।

তমোগুণ ঃ

তমোগুণ হচ্ছে সত্ত্বগুণের ঠিক বিপরীত। তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হলে মানুষ অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়, কোন কিছু সম্বন্ধে সে যথার্থভাবে অবগত হতে পারে না। তমোগুণে আচ্ছাদিত মানুষ **অত্যন্ত অলস** এবং **তাদের পারমার্থিক জীবনের প্রতি, আধ্যাত্মিকতার প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকে না।** রজোগুণ-সম্পন্ন মানুষের মতো তামাসিক মানুষেরা অত সক্রিয়ও নয়। **প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ঘুমানো তাদের অভ্যাস।** ৬ ঘন্টা ঘুমালেই যথেষ্ট, অথচ তমোভাবাপন্ন মানুষেরা দশ-বারো ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকে। বিশেষতঃ এরা কখনই ভোরে শয্যা ত্যাগ করতে পারে না — সকাল ৮/৯টা অবধি ঘুমায়। তমো-আচ্ছন্ন মানুষকে **হতাশ ও বিষণ্ণ** মনে হয়, এবং **সাধারণতঃ এঁরা মাদকাসক্ত হয়ে থাকে।** চা - কফি, ধুমপান থেকে শুরু করে নানাবিধ নেশায় এরা আসক্ত থাকে, নেশার দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসার মানসিক বল তারা হারিয়ে ফেলে। এঁরা পচা, বাসী, দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য আহার করতে ভালবাসে। তমোভাবাপন্ন মানুষ যা-কিছুই করুক তাতে তাঁর নিজের বা অপরের-কারোর কোনো কল্যাণ হয় না।

তমোগুণের প্রভাবের দৃষ্টান্ত ঃ

জন ডাল ও বেটি গ্রাম্বেলের জীবনধারা তমোগুণে প্রভাবিত হবার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এরাঁ বিবাহ না করেও নিউইয়র্ক শহরের একটি সস্তা অপরিচ্ছন্ন কামরায় একসংগে থাকে। জন নেশার দ্রব্য ফেরি করে বিক্রি করে। ধর্ম সম্বন্ধে তারা বহু পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে — এর কোনো উপযোগিতা তাদের জীবনে নেই। তারা প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘন্টা ঘুমিয়ে সময় কাটায়, নতুবা কড়া নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে কামরায় পড়ে থাকে। খিদে পেলে রসুন মেশানো সসেজ খেয়ে আর মদ্যপান করে তাদের উদর পূর্তি করে। বহু বছর ধরে তারা স্পেনে গিয়ে একটি কমিউন (সমভাবাপন্ন কিছু মানুষকে নিয়ে তৈরী একটি ছোট গোষ্ঠী, যারা একসংগে থাকে) শুরু করার স্বপ্ন দেখে, অবশ্য তা রূপায়িত করার জন্য তারা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে না, কেবল স্বপ্নিল আশাতেই তৃপ্ত থাকে।

আমাদের বিশেষ বিশেষ ধরণের স্বভাব, আচরণ কেন?

আমরা সাধারণতঃ ভেবে থাকি যে আমরাই আমাদের কার্যকলাপের নিয়ামক এবং আমরাই আমাদের চলা-ফেরা কাজকর্মের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন যে বিষয়টি আদৌ তা নয়। তিনি বলেন যে আমরা সম্পূর্ণভাবে তাঁর অপরা প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আমরা প্রকৃতির ক্রীড়নক (পুতুল) মাত্র। তারের দ্বারা যেমন উপর থেকে পুতুল নাচানো হয়, তেমনি প্রকৃতির ত্রিগুণ-রূপ রজ্জু বা দড়ির দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত হই; আমাদের আচার-আচরণ, কাজকর্ম জড়গুণগুলির দ্বারা উদ্রিক্ত হয়, সেজন্য বিভিন্ন মাত্রার বিভিন্ন গুণে আচ্ছাদিত থাকায় বিভিন্ন মানুষের — সকল বদ্ধজীবের স্বভাব, আচারণের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, **"সকলেই অসহায়ভাবে মায়াজাত গুণসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করতে বাধ্য হয়। তাই কর্ম না করে কেউই ক্ষণকালও থাকতে পারে না।"** (ভ.গী.) - ৩/৫)। কেবল আপনি আমি নই, শ্রীকৃষ্ণ বলেন ঃ **"এই পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে অথবা স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে এমন কোন জীব নেই, যে প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত"।**

পূর্বে প্রদত্ত সত্ত্বগুণের দৃষ্টান্তে ফিরে আসা যাক। আমাদের বিজ্ঞ চিকিৎসক ডঃ ব্রাইট নিজেকে খুব জ্ঞানী বলে

জানেন এবং তাঁর সুন্দর ঘরে, তাঁর লাইব্রেরীতে জীবন অতিবাহিত করে তিনি জড়জাগতিকভাবে সুখী মনে করেন। যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁর জীবন আনন্দময় মনে হয়, তাঁর ধারণা সত্যি মনে হয়, কিন্তু বাস্তব চিত্রটি সম্পূর্ণ অন্য। তিনি দেহাত্মবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন, জড়জাগতিক ভ্রান্ত ধারণায় প্রভাবিত; নিজের নশ্বর, অস্থায়ী দেহটিকে তিনি 'আমি' মনে করেন, অথচ সেটি কিছু জড় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত জড়াপ্রকৃতির তৈরী একটি যন্ত্র মাত্র, যা অচিরেই বিশ্লিষ্ট হয়ে প্রকৃতির ভৌত উপাদানে মিশে যাবে। দেহাত্মবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন থাকায় তিনি মোহগ্রস্ত, অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। তিনি নিজেকে ভাবছেন তিনি হচ্ছেন "ডঃ ব্রাইট", একজন 'আমেরিকান', 'মধ্য বয়স্ক', 'স্বামী', 'পিতা', 'সুশিক্ষিত', 'ভদ্রলোক'। তিনি এখনো এই উপলব্ধি লাভ করতে পারেন নি যে বাস্তবে তাঁর ক্ষণস্থায়ী দেহটিও নন, মনও নন; তিনি শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা, জীবাত্মা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। **যেহেতু তিনি নিজেকে তাঁর দেহের সংগে সম্পৃক্ত করে ফেলেন, এক, অভিন্ন বলে ভাবেন, সেজন্য তিনি অবশ্যই ঐ শরীরের নিয়ামক প্রকৃতির আইন বা নিয়মগুলির প্রভাবাধীন, বদ্ধ।** সেজন্য তিনি অবশ্যই জড় শরীরের সমস্যাগুলি — জন্ম-জরা-ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হতে থাকবেন, এগুলি থেকে তিনি অব্যাহতি পাবেন না।

সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত, আবদ্ধ হলে যদি এই পরিণতি হয়, তাহলে যারা নিম্নতর গুণগুলির দ্বারা আবদ্ধ, তাদের কথা আর বলার কি আছে? স্মিথদের মতো যাঁরা রজোগুণে আচ্ছাদিত, তাঁরা তাঁদের অন্তহীন বিষয়বাসনা, জড় ভোগ-তৃষ্ণা আর কর্ম-প্রবণতার দ্বারা আবদ্ধ হন। আর মিঃ ডাল ও মিস গ্রাম্বেলের মতো যারা তমোভাবচ্ছন্ন, তারা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ থাকে ও নিরন্তর জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দ্বারা ভঙ্গুর জড় শরীরে নিষ্পেষিত হতে থাকে।

আমাদের প্রকৃত জীবন হচ্ছে চিন্ময়, এবং সেজন্য তা শাশ্বত, দিব্যজ্ঞানময় ও আনন্দময়। সত্ত্বগুণে প্রভাবিত হলে আমরা ঐ শাশ্বত পারমার্থিক বাস্তবতার আভাস আমাদের জড় জ্ঞান ও জড় সুখের মধ্যে আস্বাদন করার চেষ্টা করি; রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হলে আমরা কাম ও ধন-সম্পদের মাধ্যমে তা পেতে চাই (ঐ চিন্ময় বাস্তবতাকে প্রতিফলিত দেখতে চাই), আর তমোগুণে প্রভাবিত হলে আমরা নিদ্রা ও মাদকাসক্তির মাধ্যমে তা আস্বাদন করি। এইভাবে আমাদের জড়াপ্রকৃতির গুণগুলির প্রভাবে উৎপন্ন দূষিত বাসনাগুলির প্রভাবে আমাদের শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপ এই জড় জগতে বিকৃতভাবে প্রতিভাত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন 'স্বরাট', অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন। তিনি তাঁর যা ইচ্ছা, তাই-ই করতে পারেন। আর আমরা যেহেতু ভগবানের ক্ষুদ্র অংশ, সেজন্য আমাদের মধ্যেও স্বতন্ত্রতা-বোধ, স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে — তবে তা অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে। সেজন্য আমাদের বাসনা অনুসারে আমাদের দেহ সত্ত্ব, রজো বা তমো গুণে, অথবা এইসব গুণের মিশ্রণের প্রভাবে ক্রিয়া-আচরণ করতে থাকে, কেননা এই বাসনাগুলি জড়। এই বাসনাগুলির উদ্ভব হয় দেহাত্মবুদ্ধি থেকে, এবং সেইজন্য এগুলি জড় গুণের দ্বারা প্রভাবান্বিত। আর যেভাবে আমরা সেই বাসনাগুলি পূরণের চেষ্টা করি তাও জড়।

কর্ম ও কর্মফলের নিয়ম ঃ অভ্রান্ত বিচার

পুনর্জন্মের নীতি-নিয়ম ঃ

জীবাত্মা দুই ধরণের শরীরে আবদ্ধ থাকে — স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীর। এই শরীরগুলি কেবল আত্মার উপস্থিতির প্রভাবেই কাজ করে থাকে। তাছাড়া এই শরীরগুলি প্রকৃতপক্ষে শাশ্বত আত্মার ক্ষণস্থায়ী জড় আবরণ; এই শরীরগুলির শুরু ও অন্ত রয়েছে এবং এগুলি সর্বদাই জড়প্রকৃতির দুরতিক্রম্য নীতি-নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে, যা পরমাত্মার

কঠোর অধ্যক্ষতায় বা তত্ত্বাবধানে ক্রিয়া করে। যখন স্থূল শরীরটি জরাগ্রস্ত, জীর্ণ হয়ে যায় — আর বাসোপযোগী থাকে না, তখন আত্মা সূক্ষ্মদেহ-সহ ঐ স্থূল আবরণ বা শরীরটি ত্যাগ করে। *একেই আমরা বলি "মৃত্যু"। এখন, মৃত্যু* থেকে পুনরায় নূতন স্থূল শরীরে প্রবেশ করার মধ্যবর্তী সময়ে জীবসত্তার সমস্ত চিন্তাভাবনা, কার্যকলাপ ও বাসনাসমূহ সূক্ষ্ম শরীরে বিরাজ করে। প্রকৃতপক্ষে স্থূল দেহে থাকবার সময়েও ঐগুলি সূক্ষ্ম শরীরে বিদ্যমান থাকে। যেমন নিদ্রিত থাকবার সময় আমরা সূক্ষ্ম শরীরের স্বপ্ন দেখি, স্মৃতি রোমন্থন করি, নানা দৃশ্যপাটে নিজেদের প্রত্যক্ষ করি। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীরে বিদ্যমান সেই চিন্তা, কর্ম, বাসনার পূর্ব স্মৃতি, বিশেষতঃ মৃত্যুর সময়ে প্রকটিত সবচেয়ে প্রবল জড়বাসনা ও কর্মফল ঐ আত্মা কেমন শরীর লাভ করবে, তা নির্ধারণ করে। এইভাবে পরমাত্মার নির্দেশনায় কর্মের নিয়ম অনুসারে জীবসত্তা তার মানসিকতা, চেতনার উপযোগী আরেকটি নূতন স্থূল শরীর লাভ করে থাকে, যাকে আমরা বলি "জন্ম"।

সুতরাং, মৃত্যুর সময় সূক্ষ্ম শরীর জীবাত্মাকে অপর একটি শরীরে বহন করে নিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াটি ঠিক বায়ুর ফুলের গন্ধ বহন করার মতো (ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত দৃষ্টান্ত)। যখন অকস্মাৎ আমরা গোলাপ ফুলের সৌরভ আঘ্রাণ করি, তখন আমরা কেউ দেখতে পাই না ঐ গন্ধ কোথা থেকে আসছে; কিন্তু আমরা এইটি জানি যে বায়ু ঐ সুরভিভার বহন করে নিয়ে আসছে। ঠিক তেমনি আত্মার দেহান্তর খুবই সূক্ষ্ম। মৃত্যুকালে মনের অবস্থা অনুসারে ক্ষুদ্র জীবাত্মা এক বিশেষ জীব-মাতার গর্ভে পিতার বীর্যের মাধ্যমে প্রবেশ করে, আর সেখানে মাতৃ-দত্ত একটি বিশেষ শরীর লাভ করে। কর্ম ও চেতনা অনুসারে সেই শরীরটি কুকুর, বিড়াল মানুষ বা যেকোন কিছু হতে পারে। মূলতঃ এই হচ্ছে দেহান্তরের প্রক্রিয়া।

পূর্বে যে দেহাতিরিক্ত অভিজ্ঞতা (ও. বি. ই.) এবং মৃত্যুকালীন অভিজ্ঞতা (এন. ডি. ই.)-র আলোচনা করা হয়েছে, উপরোক্ত দেহান্তর প্রক্রিয়া তার যুক্তি গ্রাহ্য ব্যাখ্যা দান করে। এটি জাতিস্মর ও যোগীদের পূর্বজন্মের স্মৃতিচারণ বা অন্যান্যভাবে পূর্বজন্মের স্মৃতি স্মরণেরও ব্যাখ্যা দান করে ঃ স্থূল দেহ ত্যাগ করলেও বদ্ধ জীব যেহেতু তার বাসনাগুলির আধার সূক্ষ্ম দেহটি ত্যাগ করে না (যা মন, বুদ্ধি ও মিথ্যা অহঙ্কার — প্রকৃতির এই তিনটি অতি সূক্ষ্ম জড় উপাদানে নির্মিত), সেজন্য পরবর্তী স্থূল দেহেও সেই স্মৃতি সঞ্চিত থাকে। তবে নূতন দেহ লাভের ফলে ঐ দেহকেন্দ্রিক নূতন মিথ্যা অহঙ্কারকে আশ্রয় করে জীবসত্তা তার আত্মপরিচয় নির্ধারণ করে, সেজন্য পূর্বস্মৃতি চলে যায় বিস্মৃতির অতলে, ঠিক যেমন যৌবনে উপনীত হলে ম্লান হয়ে আসে শৈশব-স্মৃতি। এইভাবে জীবাত্মা যতদিন ভগবৎ-চেতনা লাভ না করে প্রকৃতির গুণ-প্রভাব ও জড়বাসনা-কলুষ থেকে বিমুক্ত না হয়, ততদিন ঘটতে থাকে তার দেহান্তর।

শরীরগুলি 'ডিজাইন' করা হয় জীবাত্মার বাসনা অনুসারে

আপনি যখন কোনো বড় বস্ত্র-বিপণিতে যান, তখন সেখানে নানা ধরণের পোশাক দেখেন — জামা, স্যুট, কুর্তা-পাজামা, ধুতি-পাঞ্জাবী, শাড়ী, সালোয়ার, জিনস্ ইত্যাদি। সেই রকম প্রকৃতির মহাবিপণিতে আমাদের পছন্দের জন্য ৮৪ লক্ষ রকমের প্রজাতি বা দেহ রয়েছে। এর যেকোন একটি গ্রহণ করে আমরা আমাদের বাসনা পূরণ করতে পারি। এমনকি মানব জাতির মধ্যেও কত বৈচিত্র্য রয়েছে — অসুর, আর্য বা সভ্য, অনার্য (অসভ্য), উপজাতি, দেব-স্বভাব, কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ ইত্যাদি। আপনি যদি এইসব পোশাক গ্রহণ করে তাতে জীবন উপভোগ করতে চান, তাহলে সেখানে কত বৈচিত্র্য রয়েছে! শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক জীবসত্তার বাসনা পূরণে সমর্থ ও সেজন্য তিনিই এইসব পোশাক, নানা ধরণের শরীরের ব্যবস্থা রেখেছেন, তাঁর জড়া প্রকৃতির দ্বারা।

সূক্ষ্ম জড় উপাদানের মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা, কার্যকলাপ বাহিত হয় — এই সত্য অত্যাধুনিক বিজ্ঞানেও প্রতিপন্ন হয়েছে — যেমন টেলিভিশনের সমস্ত শব্দ ও রূপ সূক্ষ্ম উপাদানের তরঙ্গ দ্বারা বাহিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে

ভবিষ্যতের গবেষণার এক মূল্যবান আকর গ্রন্থ; এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে 'আকাশ' নামক অদৃশ্য উপাদান থেকে ক্রমান্বয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থ, যেমন বায়ু, আলোক (তেজ), জল (তরল), মাটি (কঠিন পদার্থ) অভিব্যক্ত হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মাত্রা অনুসারে এই পাঁচটি পদার্থ বা পঞ্চ মহাভূত পাঁচটি স্তরে রয়েছে। যেমন মাটির মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ — পাঁচটি ইন্দ্রিয় অনুভবযোগ্য; মাটি হতে জল এক মাত্রা সূক্ষ্ম, এখানে গন্ধ অনুপস্থিত। এর থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় এক মাত্রা কম তেজ বা আলোক রশ্মি, এতে রস ও গন্ধ নেই; তেমনি বায়ুতে রস, গন্ধ ও রূপ নেই, আকাশে, স্পর্শ রূপ, রস গন্ধ নেই। আকাশ থেকে মাটি, পাঁচটিই স্থূল উপাদান, তবু পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ্য পঞ্চ তন্মাত্রের একটি করে কমতে থাকে — যত সূক্ষ্মতর উপাদানে যাওয়া হয়। আকাশের পর সূক্ষ্ম উপাদানের শুরু মন, তার চেয়ে সূক্ষ্ম বুদ্ধি, তার চেয়ে সূক্ষ্ম মিথ্যা অহঙ্কার। এই তিনটি উপাদানে নির্মিত সূক্ষ্ম শরীরের বাসনাসমূহ পাঁচটি স্থূল উপাদানে নির্মিত জড় শরীরে অভিব্যক্ত হয়। চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভব — এইসব মানসিক কার্যকলাপগুলি সূক্ষ্ম স্তরের ক্রিয়া। এই মানসিক প্রবেগগুলি সুযোগ তৈরী হওয়া মাত্রই স্থূল দেহ-রূপ গ্রহণের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়।

অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের বাসনা অনুসারে স্থূল শরীর লাভ হয়, ঠিক যেমন মনের চাহিদা অনুসারে পোশাকের দোকান থেকে আমরা পোশাক পছন্দ করি। জীবাত্মাকে এই পোশাক গ্রহণ করতে হয় তার অভিলষিত প্রজাতির মাতৃগর্ভে অবস্থান করে। মনের সূক্ষ্ম বাসনা অনুসারে যে স্থূল শরীর হয়, এটির চাক্ষুষ প্রমাণ হচ্ছে, বর্তমান স্থূলশরীরেও মনের বাসনাগুলির ছাপ পড়ে। মুখ দেখেই আমরা সচরাচর বুঝে নিতে পারি কেউ ক্রুদ্ধ, উৎফুল্ল, হতাশ, প্রাণোচ্ছল কি না। সেজন্যই এই প্রবাদ বাক্যটি রয়েছে ঃ "মুখ হচ্ছে মনের আয়না"।

জীবসত্তার বাসনা অনুসারে প্রকৃতি শরীর প্রদান করে

যেকোন বাসনার কথা ভাবুন ঃ

বেশি ঘুমানোর ইচ্ছা ঃ

প্রকৃতিতে এইরকম সুযোগ রয়েছে। মেরুতে বছরের ছয় মাস রাত্রি, আর সেখানে মেরুভালুকেরা সুনিদ্রার কি অপূর্ব সুবিধা পায়, তা সহজেই অনুমেয়। আর সাপ, ব্যাঙ-সহ বেশ কয়েক প্রজাতির সরীসৃপ বেশ কয়েক মাস একটানা শীত ঘুমে কাটায়। শ্লথেরাও দিনের অধিকাংশ সময় ঘুমে বুঁদ হয়ে থাকার জন্য বিশ্ব-প্রসিদ্ধ। যারা অলস ও বেশি ঘুমায়, তাদের জন্য প্রকৃতি এই সব শরীর নির্দিষ্ট রেখেছে। কারো কোনো ভৎর্সনা ছাড়াই মাসের পর মাস একটানা ঘুম!

অপরের শরীরের রক্ত ও মাংস খাবার ইচ্ছা ঃ

যারা মাছ-মাংসের প্রতি প্রলুব্ধ হয়, তাদের জন্য বাঘ, সিংহ, শেয়াল প্রভৃতি বহু মাংসাশী প্রজাতি রয়েছে। কারো মাংসাহারের বাসনা থাকলে প্রকৃতি তাকে আমন্ত্রণ জানায়, "হ্যাঁ, এসো! সিংহের দেহ গ্রহণ করো আর আজীবন মাংস ভক্ষণ করো!"

বেশিক্ষণ জলে থাকা আর সাঁতারের ইচ্ছা ঃ

আজকাল অনেককেই সাঁতারে অত্যন্ত অনুরক্ত দেখা যায়। একটা প্রাইজ পাবার আশায় তাঁরা পাগলের মতো দিনে ৭-৮ ঘন্টাই জলে পড়ে থাকে, দম শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পরিশ্রম করতে থাকে। কেউ কেউ তো আবার ইংলিশ চ্যানেলটাই সাঁতার কেটে পার হয়ে লোককে তাদের ক্ষমতা দেখায়। অন্য অনেকে আবার সমুদ্রের ঢেউয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সার্ফিং করে থাকে। এরকম সাঁতারবাজদের প্রকৃতি আমন্ত্রণ জানায়ঃ *'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলে এসো, এই হাঙর, তিমি, কিংবা মাছের দেহ নাও, আর বিনা অসুবিধাতেই জলে পড়ে থাকো, সাঁতার কাটো!'*

নীলাকাশে ওড়ার শখ হলে ঃ

পৃথিবী জুড়ে ওড়ার ক্লাব রয়েছে। আর ওড়ার কতরকম ফন্দিও বেরিয়েছে ঃ প্যারাসুট নিয়ে প্যরা গ্লাইডিং, অতিকায় ডানা যুক্ত গ্লাইডার, বেলুন, হেলিকপ্টার, প্লেন, রকেট — কত কি! কত লোক রয়েছে, ওড়াই যাদের জীবন, জীবনের কেন্দ্রবিন্দু! প্রকৃতি তাদেরকে পাখীদের শরীর দেয়, যাতে যথেষ্ট ওড়ার সুযোগ পায় তারা!

নিরাবরণ থাকার প্রবণতা ঃ

কিছু মানুষ রয়েছে যারা উপযুক্ত পোশাক পরতে চায় না — শরীরের বেশির ভাগ অংশ উন্মুক্ত রেখে তা বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। এইভাবে সভ্য মানবসমাজে তারা প্রতিনিয়ত ঘটায় ছন্দপতন। পরজন্মে প্রকৃতি তাদের আমন্ত্রণ জানায়, *"এসো, একটি গাছের দেহ গ্রহণ করো। এখানে এই বৃক্ষদেহে নগ্ন, নিরাবরণ হয়ে মনের সন্তোষে দাঁড়িয়ে থাকো কয়েকশো বছর, আর শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা — সমস্ত ঋতু উপভোগ কর!"*

সুতরাং এইভাবে জীবজগতের প্রজাতির জীব-শরীরগুলি বিভিন্ন ধরণের সুখোপভোগের সুবিধা প্রদান করে। আর বিভিন্ন জীবসত্তাদের বিভিন্ন রকম বাসনা অনুসারে তাদের এইসব শরীরগুলি প্রদান করা হয়।

প্রতিটি জীবসত্তার আদি বাসস্থান, নিত্য আলয় হচ্ছে শাশ্বত আনন্দময় চিন্ময় জগতে। সেখানে বাসোপযোগী তার একটি সুন্দর চিন্ময় আনন্দঘন নিত্য শরীর রয়েছে, যাকে বলা হয় **'স্বরূপ'**। নানা শরীরে জীবাত্মার এইভাবে ভ্রমণের সময়েও স্বরূপ-দেহ নষ্ট হয় না। উদাহরণস্বরূপ, আপনাকে হয়ত কোন অস্ত্রোপচার করার জন্য বা কোন বৈদ্যুতিন যন্ত্র সারাই করতে, শীতের জন্য, কিংবা অন্যান্য নানা কাজের জন্য আপনার হাতকে ব্যবহার করতে হয়। এজন্য আপনি হাতে নানা ধরণের দস্তানা পরেন, বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে আপনি বিভিন্ন ধরণের দস্তানা ব্যবহার করেন, কিন্তু এতে আপনার হাতের কোনো পরিবর্তন হয় না। ঠিক তেমনি জড় জগতে আত্মা একের পর এক জড় দেহ ধারণ করে চললেও আত্মার চিন্ময় শরীরটি, মূল শাশ্বত স্বরূপ সবসময়ই অবিকৃত থাকে।

বিভিন্ন শরীর লাভের ক্ষেত্রে কর্মের ভূমিকা ঃ

সূক্ষ্ম শরীরটি তৈরী মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দিয়ে। আভ্যন্তরিক বা বাহ্যিক যেকোন ধরণের পুনর্জন্মের ক্ষেত্রে আত্মা সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা বাহিত হয় **কর্মের নিয়ম** অনুসারে। কর্মের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে এইভাবে ঃ "কর্ম হচ্ছে ত্রিগুণের প্রভাবে নির্দিষ্ট কাল সীমার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা কৃত একটি জীবসত্তার কার্যকলাপ।"

জীবাত্মা তার জড় শরীর, জড় ইন্দ্রিয় দিয়ে যে কর্মই সম্পাদন করুক, তাকে তার ফল ভোগ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি খুব অনুরাগী হন ও অনেক দান-ধ্যান করে থাকেন, তাহলে পরবর্তী জন্মে তিনি ধনী হয়ে জন্মাতে পারেন এবং সুশিক্ষা লাভ করতে পারেন। পক্ষান্তরে, কেউ যদি ভ্রূণহত্যা করে, তাহলে পরের জন্মে তাকে ঐরকম ফল (গর্ভের মধ্যে নিহত হওয়া) ভোগ করতে হতে পারে। ফল ভোগ করতেই হবে, কেবল অন্যান্য কর্মেরও ফল যেহেতু নানা সময়ে প্রকাশিত হয়, সেজন্য কোনো নির্দিষ্ট কর্মের ফল লাভ শীঘ্র বা বিলম্বে হতে পারে। কিন্তু ভাল বা মন্দ যেমনই হোক, কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। এজন্য, যখন একটি শরীরে কোন জীবাত্মা কর্ম করে, তখন সেই কর্মের ফল ভোগ করার জন্য তাকে অবশ্যই পুনরায় আরেকটি দেহ গ্রহণ করতে হয়। এইভাবে পুনর্জন্মের শৃঙ্খল নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে, যাকে বলা হয় **'কর্মবন্ধন'**। কর্মের নিয়মে মানব দেহ লাভ হলেও পুনরায় নিম্নতর প্রজাতিতেও জন্মাতে হতে পারে; কেননা যখন স্থূল দেহটি ধ্বংস হয়ে যায়, তখন জীবাত্মার সমস্ত বাসনা ও পরিকল্পনাগুলি সূক্ষ্মদেহে সঞ্চিত থাকে, এবং কর্মের নিয়মের নিয়ামক বা নিয়ন্ত্রক উচ্চতর কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় তাকে তার একটি শরীর লাভ হয়, যার দ্বারা সে তার বাসনা ও পরিকল্পনা গুলিকে রূপায়িত করতে পারে

(যেমন ওড়ার উদ্দাম ইচ্ছার জন্য বিশেষ ওড়ার দেহ)। চেতনার নানা স্তরে এত অসংখ্য বৈচিত্র্যময় জৈবশরীরের অস্তিত্ব কেন রয়েছে, এইটিই হচ্ছে তার প্রকৃত কারণ।

সৎকর্ম ও কুকর্ম ঃ

দুটি শিশুর একই দিনে একই সময়ে জন্ম হল। প্রথম শিশুটির পিতা-মাতা অত্যন্ত ধনী ও সুশিক্ষিত; তাঁরা তাদের প্রথম সন্তানটির জন্য কয়েকবছর উৎকণ্ঠার সংগে প্রতীক্ষা করেছেন। অবশেষে এই সন্তান তাঁরা লাভ করেছেন — সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট, উজ্জ্বলবর্ণের আকর্ষণীয় একটি ছেলে, যার মধ্যে উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সুস্পষ্ট। সত্যিই ভাগ্য এই পিতার প্রতি অত্যন্ত সদয় হাসি হেসেছে। দ্বিতীয় শিশুটির আবির্ভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে। সে এমন এক হতভাগিনী মায়ের গর্ভে জন্মিয়েছে, যে গর্ভবতী অবস্থাতেই স্বামী-পরিত্যক্তা হয়েছে। চরম দারিদ্র্যের জন্য সেই মায়ের তাঁর নবজাতক সন্তানটিকে লালন-পালনের আগ্রহ হারিয়ে গিয়েছে। তাঁর সামনের পথ অত্যন্ত অমসৃণ, দুঃখ-কষ্টে ভরা, আর সেগুলি পার হওয়া খুব সহজ হবে না মোটেই। সমগ্র জগত এই ধরণের বিসদৃশতায়, কঠোর বৈষম্যে পূর্ণ, যা প্রায়ই এই প্রশ্ন জাগায় ঃ *"বিধাতা কেমন করে এত নির্দয় হতে পারেন? জর্জ আর মেরী কি এমন করেছে যে তাদের সন্তানটি অন্ধ হয়ে জন্মাল? তাঁরা তো সৎ মানুষ। ভগবান এত নির্দয় কেন?"*

পুনর্জন্মের নীতিনিয়ম সম্বন্ধে অবগত হলে আমরা জীবনকে আরো অনেক বড় পটভূমিকা থেকে — প্রায় শাশ্বত কালের প্রেক্ষিতে দেখতে সমর্থ হই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একটি ছোট্ট জীবন আসলে আমাদের অস্তিত্বের শুরু নয়, কেবল কালের প্রেক্ষিতে জীবনের এক ক্ষণিক ঝলক মাত্র। একটি জীবনের পিছনে রয়েছে কত লক্ষ লক্ষ জন্মের ইতিবৃত্ত, অনাদি কালের বিস্মৃত অতীতের কতশত ঘটনার, কর্মের, বাসনার অভিঘাতের সমাহার! তাই একটি সীমিত জীবনের লাভ-ক্ষতি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ব্যাখ্যা কেবল সেই জীবনের কাল-সীমার মধ্যে অনুসন্ধান এক অর্থহীন প্রয়াস। সেজন্য কোন পুণ্যবান, সৎ মানুষকেও দুঃখ দুর্দশায় কষ্ট পেতে দেখলে আমাদের বুঝতে হবে যে এটি তাঁর এই জন্ম বা বিগত জন্মসমূহে কৃত কর্মের ফলভোগ। এইভাবে, প্রতিটি মানুষই তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে, ঠিক যেমন বিভিন্ন চাষী তাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম বীজ চাষ করার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ফসল লাভ করে থাকে (*"যেমন বীজ বুনবে, তেমন ফসল পাবে"* — প্রবাদ)। বিশ্বজনীন বিচারের এই প্রশস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে প্রত্যেক জীবাত্মা তার আত্মকৃত কর্মের ফল ভোগের জন্য দায়ী থাকে। পুনর্জন্মের নিয়ম নিরপেক্ষভাবে ক্রিয়া করে, এইভাবে প্রত্যেক জীবাত্মাকে তার পূর্ব-সঞ্চিত কার্যানুসারে নানা রকমের ভাগ্য প্রদান করে থাকে।

ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি ব্যক্তি বহু রকমের গাড়ীর মধ্যে নিজেদের ক্রয়ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত শখ বা প্রয়োজন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট গাড়ী কিনে থাকে, তেমনি আমাদের বাসনা ও কর্মানুসারে জড়াপ্রকৃতি আমাদেকে বিশেষ একটি শরীর প্রদান করে। পশু ও মানব জীবনের পার্থক্য হচ্ছে পশুর উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, কিন্তু মানব জীবনের উদ্দেশ্য আত্মোপলব্ধি লাভ; অথচ কেউ যদি দৈহিক পরিতৃপ্তি — আহার-নিদ্রা-মৈথুনের পাশবিক প্রবৃত্তিগুলির দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়, ঐগুলি সম্ভোগে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়, তাহলে ভগবান তাকে এমন একটি দেহে থাকার অনুমোদন দান করবেন, যেখানে ঐ ধরণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে — কিন্তু সেখানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কোনো বিধি-নিষেধ নেই, কোনো দায়িত্ব-কর্তব্যের ভার নেই — যা মানব জীবনে রয়েছে। পুরস্কার ও তিরস্কারের এই উদার প্রক্রিয়াকে প্রথমে অত্যন্ত রূঢ়, কঠোর মনে হতে পারে, কিন্তু পূর্ণকরুণাময়, অত্যন্ত সদয় হিসাবে ভগবান সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা রয়েছে তার সঙ্গে এটি সুসমঞ্জস, সঙ্গতিপূর্ণ; তাই যে যা অন্তরে কামনা করে, সেটি পুরণ করার সুযোগ তিনি প্রদান করে থাকেন। বিভিন্ন ধরণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সম্ভোগের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরণের শরীরের প্রয়োজন হয়; আর এইজন্যই প্রকৃতপক্ষে এত বিচিত্র, লক্ষ লক্ষ রকমের জীব-শরীর রয়েছে। জীবাত্মার বাসনা পরিপূরণের জন্য তাকে তার বাসনার উপযোগী শরীরে রাখাই জড়া প্রকৃতির কাজ, যা অত্যন্ত নিখুঁত, নির্ভুলভাবে সম্পাদিত হয়।

ভ্রান্ত তত্ত্ব ঃ একটি পাপময় জীবনের বিনিময়ে অনন্তকাল নরক বাস?

পৃথিবীর কিছু কিছু ধর্ম-সম্প্রদায়ে এই মত প্রচলিত রয়েছে যে জীবন একটিই, এবং এই জীবন সৎকর্ম করে অতিবাহিত করলে অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ-বাস লাভ হয়, আর পাপকর্মে অতিবাহিত করলে অনন্ত কালের জন্য নরকের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হতে হয়, যেখান থেকে ফিরে আসার আর কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু এটি কেবল ধর্মীয় মতান্ধতা ছাড়া কিছুই নয়, কেননা জীবন একটি নয়; জীবন একটি হলে পৃথিবীতে বিভিন্ন জীবনের যে অসাম্য রয়েছে, তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, বিধাতা পক্ষপাত-দুষ্ট হয়ে পড়েন; তাছাড়া কেউ সম্পূর্ণভাবে পাপী নয়, আবার পরিপূর্ণভাবে সৎকর্মকারীও খুবই বিরল; সুতরাং তাদের পুণ্য ও পাপের ফল লাভ ঘটবে কিভাবে? স্পষ্টতঃই, সংবেদনশীল, ভগবৎ-সচেতন মানুষের কাছে এই ধরণের চরম বিচারের ব্যবস্থাটিকে ঈশ্বরীয়র থেকে বরং আসুরিক ধরণের মনে হয়। এটা কি সম্ভব যে মানুষও যখন অন্যদের প্রতি করুণা, দয়া প্রদর্শন করে থাকে, তখন ভগবানের মধ্যে এইরকম অনুভূতি নেই, তিনি নিষ্করুণ? ভগবান ও তাঁর নিজ অবিচ্ছেদ্য অংশ জীবসমূহের মধ্যে যে শাশ্বত প্রেমের বন্ধন রয়েছে, ঐসব অযৌক্তিক ধর্মীয় শিক্ষা তার পরিপন্থী। সংজ্ঞানুসারে (*মানুষ ঈশ্বরের অনুরূপে তৈরী — 'ম্যান ইজ মেড ইন দ্য ইমেজ অব্ গড*), সমস্ত গুণাবলী ভগবানের মধ্যে পূর্ণতার পরম মাত্রা পর্যন্ত থাকতে হবে। এর মধ্যে একটি গুণ হচ্ছে করুণা। একটি সংক্ষিপ্ত মানব জীবনের শেষে অনন্ত কাল নরকে দগ্ধ হওয়ার এই ধারণা অনন্ত করুণার অধিকারী একজন পরম পুরুষের ধারণার সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এমনকি একজন সাধারণ পিতাও তার পুত্রের জীবনকে সুন্দর করার জন্য ঐ পুত্রের অনেক ভুল ক্ষমা করেন, একাধিক সুযোগ তাকে দিয়ে থাকেন।

ভগবান পূর্ণ, সুতরাং তাঁর গুণাবলীও পূর্ণ। এরকম একটি গুণ হচ্ছে তাঁর করুণা। ভগবান পরম করুণাময়, সেজন্য কোনো জীবকে তিনি অনন্ত নরকবাসের শাস্তি দিতে পারেন না। বৈদিক শাস্ত্রে বার বার ভগবানের করুণাপরতার কথা বলা হয়েছে। ভগবান প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে অবস্থান করেন, এবং তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার কথা জানেন; সেজন্য তাদের উপলব্ধির বিকাশের জন্য তিনি তাদের ঐসব আকাঙ্ক্ষাগুলি চরিতার্থ করার সুযোগ দেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবানের করুণার কোনো অবধি নেই, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সুহৃদ, প্রত্যেক জীবাত্মাকে তিনি ভালবাসেন, তাই তিনি অসীম করুণাময়। আমাদের যোগ্যতা না থাকলেও তিনি আমাদের বার বার সুযোগ দান করেন যাতে আমরা আত্মোপলব্ধির স্তরে উপনীত হই, জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে অব্যাহতি লাভ করি।

পুনর্জন্মের তত্ত্ব অনুসারে, এমনকি একজন কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিও যদি সামান্য একটুও সৎকর্ম করেন, শ্রীকৃষ্ণ তা বিস্মৃত হন না, তিনি তা সঞ্চিত রাখেন। কেউই সম্পূর্ণতঃ, একশো ভাগ পাপী নয়। তেমনি কোন জীবাত্মা যদি সামান্য একটুও পারমার্থিক উন্নতি করে, সেটি ধ্বংস হয় না; পরজন্মে তাকে আরো পারমার্থিক উন্নতি করার জন্য অধিকতর উন্নত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, যাতে করে সে তার অন্তর্নিহিত চিন্ময় গুণাবলী বিকশিত করার সুযোগ পায়। এভাবে ভগবৎচেতনা লাভ করলে তার আর জড় দেহের প্রয়োজন হয় না, সে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার চিন্ময় জগতে তার নিত্য আলয়ে ফিরে যায়।

জড়-অস্তিত্বজাত দুঃখ-দুর্দশা

কেউ যদি কেবল সৎকর্মও (ভগবৎ-প্রদত্ত আইন, শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন না করে কৃত কর্ম) করে চলে, সেই সৎকর্ম-জাত ফল ভোগ করার জন্য তাকে বার বার দেহ ধারণ করতে হয়। পুণ্যকর্মের ফলে কেউ যদি স্বর্গলোকেও উন্নীত হয় আর অবিমিশ্র সুখ উপভোগের সুযোগ পায়, তবুও সে নিরাপদ হতে পারে না — কেননা স্বর্গীয় জীবনও শাশ্বত নয়, সেখান থেকে আবার ফিরে আসতে হয়। স্বর্গীয় সুখভোগেরও শুরু রয়েছে, শেষ রয়েছে। আর একটি দেহ গ্রহণের অর্থ হচ্ছে পুনরায় আর একবার জন্ম। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির অসহনীয় এই কষ্টগুলি কেমন, আমরা আলোচনা করে দেখতে পারি।

বাইরে থেকে দেখলে খুবই সহজ মনে হলেও, এই জড়জগতে একটি জড়দেহে জন্মগ্রহণ করা জীবাত্মার জন্য মোটেই এক প্রমোদ ভ্রমণ কিংবা বনভোজনের যাত্রার মতো নয়। মাসের পর মাস ভ্রূণটি মাতৃজঠরে সামান্য একটু জায়গার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে; ঐ ছোট থলির মধ্যে মাসের মাস তাঁকে অবিরাম চাপ সহ্য করতে হয়; এই চাপ তাঁকে ধনুকের মতো বাঁকা করে রাখে। ঐ সময় জরায়ু বা তার বাইরের গাত্রের সংলগ্ন কৃমির উপদ্রবে ঐ শিশুর সারা শরীর চুলকায়, কিন্তু কিছুই তার করার থাকে না; সে কাঁদতেও পারে না (কেননা তখন শ্বাসক্রিয়া বন্ধ থাকে)। মাতা যখন খুব তিক্ত, ঝাল কটু খাবার খায়, সেই খাদ্যের ঝাঁঝে তাঁর গায়ে প্রদাহ হয়। বেদের বর্ণনা অনুযায়ী, মাতৃগর্ভে দশ মাস ধরে এতই কষ্ট তাকে পেতে হয় যে তার পূর্বজন্মের স্মৃতি তখনো কিছু যদি তার থাকে, তা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তার গত জন্মের নাম-ঠিকানা, পরিচয় সে সম্পূর্ণ ভুলে যায়।

মৃত্যুকালে মানুষ কেমন যন্ত্রণা অনুভব করে, মহামুনি কপিল তাঁর মাতৃদেবী দেবহুতির কাছে তা বর্ণনা করেছেন ঃ ***"সেই রুগ্ন অবস্থায়, ভিতরের বায়ুর চাপে, তার চক্ষু ঠিকরে বেরিয়ে আসে, এবং কফের দ্বারা তার শ্বাসনালী রুদ্ধ হয়ে যায়। তার নিঃশ্বাস নিতে তখন খুব কষ্ট হয় এবং তার গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বের হয়। ... ... এইভাবে, অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কুটুম্ব-ভরণে ব্যাপৃত ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজনদের এইভাবে ক্রন্দন করতে দেখে গভীর দুঃখে তার প্রাণ ত্যাগ করে। সে অসহ্য বেদনায় অচেতন হয়ে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে'*** (ভাঃ ৩/৩০, ১৬, ১৮)। জীবাত্মা তার জড়দেহটিতে বাস করায় এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে সে ঐ দেহ জীর্ণ হয়ে গেলেও ত্যাগ করতে চায় না; সে জন্য জড়া প্রকৃতির নিয়ম তাকে জোর করে ঐ দেহে থেকে বের করে দেয়। ঠিক যেমন কেউই তার নিজগৃহ হতে বিতাড়িত হতে চায় না, তেমনি জীবাত্মা জড়দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে চায় না — বিতাড়নের চেষ্টা হলে জীবাত্মা অসহায় ভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। এই জগতে দেখা যায় যে এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গও তাদের জীবন বিপদাপন্ন হলে মৃত্যু এড়ানোর জন্য বিস্ময়কর সব কলা-কৌশল প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু এই জগতে দেহধারী প্রতিটি জীবের জন্য মৃত্যু অমোঘ — কেউই মৃত্যুকে রোধ করতে পারে না, মৃত্যুকালীন অসহনীয় যন্ত্রণার অনুভূতিকেও এড়ানো যায় না।

কর্মবন্ধন-শূন্য কর্ম করা যায় কিভাবে?

তাহলে, কুকর্ম করলে দুঃখভোগ করতে হবে, আবার সৎকর্ম করলেও ফলভোগের বন্ধনে, কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জন্ম-মৃত্যু-প্রভৃতি দুর্দশাভোগ করতে হবে, তাহলে কেমন ধরণের কর্ম করা উচিত আমাদের? উত্তর হচ্ছে, কর্ম সম্পাদিত হওয়া উচিত জড়ীয় ত্রিগুণের প্রভাবহীন, **অ-প্রাকৃত, চিন্ময় স্তরে**। যখন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য কোনো কর্ম সম্পাদিত হয়, কার্যকলাপ যখন কৃষ্ণ-সম্বন্ধযুক্ত হয়, তা তখন প্রকৃতির গুণের স্পর্শ-লেশশূন্য, চিন্ময় হয়ে ওঠে। এইভাবে কৃতকর্মের ফলভোগে কর্মকর্তা বাধ্য থাকেন না; এই কর্মে কর্মবন্ধন হয় না, বরং জড়বন্ধন স্তব্ধ হয়। এজন্য, এই ফলবন্ধন-রহিত কর্মকে বলা হয় **অ-কর্ম**। কর্ম করেও 'কর্ম' না করা, অর্থাৎ কর্মফলে বিজড়িত না হবার একমাত্র উপায় এইটি, শ্রীকৃষ্ণ যা শিক্ষা দিয়েছেন। সম্পাদনকারী জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে, জড়া প্রকৃতির ভঙ্গুর আবরণ — জড়দেহ হতে বিমুক্ত হয়ে চিন্ময় জগতে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করেন, সেখানে নিত্য — শাশ্বত আনন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

উদাহরণস্বরূপ, ক্লাসে কোনো দুজন ছাত্রের একজন ভক্ত, অন্য জন জড়-বিষয়াসক্ত সকাম কর্মী। ভক্ত ছাত্রটি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পড়াশুনা করে। কেমন করে তা সম্ভব? ক্লাসে যে-সমস্ত বিষয় সে অধ্যয়ন করে, তা সবই জড় বস্তু সম্বন্ধীয়; তাহলে এই পড়াশুনা কিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম হবে? ভক্ত ছাত্রটি উপলব্ধি করতে পারে যে তার এই কলেজের শিক্ষা অবশেষে তাকে একটি কাজ বা চাকরী দেবে, যার সাহায্যে সে তার পরিবারের সদস্যদের, তার উপর যারা নির্ভরশীল তাদের ভরণ-পোষণের সংস্থান করতে পারবে; কিন্তু প্রকৃত জীবন, প্রকৃত বাস্তব ও শাশ্বত সম্পর্ক হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে, জাগতিক সমস্ত সম্পর্কই অস্থায়ী। সুতরাং সে প্রতিদিন যে নির্দিষ্ট সংখ্যায় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে, চারটি বিধিনিষেধ পালন করে, শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ অধ্যয়ন

করে, সাপ্তাহিক গীতা বা ভাগবত ক্লাসে যোগদান করে — এইভাবে সে চেতনার পবিত্রতা রক্ষা করে। এছাড়াও, কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্তব্য পালনের জন্য সে তাঁর কলেজের শিক্ষা গ্রহণ করে। সে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য জানে ঃ শুদ্ধ কৃষ্ণচেতনা, শুদ্ধ ভগবভক্তি লাভ করে শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত ধামে ফিরে যাওয়া।

অপর ছাত্রটিও জানে যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান; কিন্তু প্রবলভাবে সে জড়জগতের ভোগবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট। সে তার ভোগ বাসনাগুলি পূরণের উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন করে — কঠোর প্রচেষ্টা করে। বিধিনিয়মগুলি সে পালন করে না, এবং সবসময়ই ভবিষ্যতের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুযোগ সৃষ্টির পরিকল্পনায় — নিজের, বা পরিবারের জন্য — ব্যস্ত থাকে। এইভাবে, সে হচ্ছে সকাম কর্মী, অর্থাৎ জড়ীয় ভোগবাসনা পূরণের জন্য সে কর্ম — পড়াশুনা করে।

আপাতঃদৃষ্টিতে দুজন ছাত্র একই কর্ম — কলেজশিক্ষা গ্রহণ করছে বলে মনে হলেও তাদের চেতনার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, তাদের ভবিষ্যত পরিণতিও হবে ভিন্ন। সকাম কর্মী ছাত্রটি তাঁর ভবিষ্যতের জন্য, অর্থাৎ আমৃত্যু বিষয় ভোগ করে যাওয়ার সুবন্দোবস্ত করার জন্য বহুরকম পরিকল্পনায় নিমগ্ন থাকায় জড়া প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা, বিশেষতঃ রজোগুণের দ্বারা — আরো বেশি বেশি করে প্রভাবিত হতে থাকবে। পক্ষান্তরে ভক্তিযোগী ছাত্রটি কলেজে বা উত্তর জীবনে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করতে থাকবে, এবং ধীরে ধীরে জড়গুণগুলির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধসত্ত্ব, অর্থাৎ নির্গুণ বা চিন্ময় অবস্থা লাভ করবে। এইরকম শুদ্ধসত্ত্ব-চেতনাসম্পন্ন ভক্ত সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। তার উপর জড়ীয় গুণগুলির ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়, এবং তার মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের করুণাধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে।

অর্জুন ও দুর্যোধন ঃ আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছে অর্জুন ও দুর্যোধন। অর্জুন ও দুর্যোধন উভয়েরই রথ ছিল; দুজনেরই তীর-ধনুক ছিল; দুজনেই ছিল ক্ষত্রিয়; দুজনেই প্রবল পরাক্রমের সংগে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী ছিল। বাহিরে থেকে দুজনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বলে মনে হয়। কিন্তু উভয়ের চেতনার মধ্যে ছিল বিরাট পার্থক্য। দুর্যোধন তাঁর নিজের বাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছিলেন, আর অর্জুন যুদ্ধ করছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য। দুর্যোধন নিজেকে সবকিছুর নিয়ন্তা বলে মনে করত এবং পাণ্ডবদের শেষ করার জন্য সে বহু বহু মাষ্টার-প্ল্যান তৈরী করেছিল। পক্ষান্তরে অর্জুন জানতেন যে সবকিছুই চলছে, কার্য করছে শ্রীকৃষ্ণের পরম ইচ্ছার প্রভাবে, এবং তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের হাতের একটি যন্ত্র বা পুতুল মাত্র, শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে তাঁকে ব্যবহার করতে পারেন। এই হচ্ছে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার পন্থা।

সকল মানুষের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ কর্ম

ভক্তদেরকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে দেখে অনেকে তাদের বলে, *"আপনারা কেবল সারাক্ষণ হরেকৃষ্ণ জপ করেন, দরিদ্র মানুষদের জন্য আপনারা কিছু করেন না কেন? রোগাক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল বা দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরী করেন না কেন? অন্ততঃ এভাবে তো মানুষের কিছু সেবা করা যায়?"* আপনি যদি ভক্ত হন তাহলে প্রায়ই আপনাকে এই প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হবে। তার কারণ হচ্ছে, কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির অমৃতময় আস্বাদন সামান্য মাত্রও লাভ না করে, তাহলে সে প্রথমে কৃষ্ণভাবনামৃতের দিব্য মহিমা অনুভব করতে পারবে না।

জড় শরীরটির যত্ন গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে; কিন্তু দেহটি ব্যক্তি নয়; প্রকৃত ব্যক্তি আত্মার যত্ন গ্রহণ না করলে, আত্মার প্রয়োজনগুলিকে অবহেলা করে কেবল নশ্বর জড়শরীরের পরিচর্যা আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র। জড় শরীরের যত্নগ্রহণের পাশাপাশি অকৃত্রিম শুদ্ধ পারমার্থিক শিক্ষা প্রদান ও অনুশীলনের দ্বারা আত্মার পুষ্টিবিধানের গুরুত্ব বোঝাতে শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্বক বহু বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। তার মধ্যে একটি ঃ ***এক মহিলা একটি সুন্দর তোতা পাখী পুষতে শুরু করেন। সুন্দর ঐ পাখীটির জন্য তিনি একটি বহুমূল্য সোনার খাঁচা কেনেন। সেই খাঁচায় পাখীটিকে রেখে তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে বহুমূল্য খাঁচাটির যত্ন নেওয়া শুরু করেন। প্রত্যেক দিন তিনি খাঁচাটি মুছতেন, পরিষ্কার করে উজ্জ্বল ঝকঝকে করে রাখতেন। এক সপ্তাহ পরে যখন তাঁর এক বান্ধবী তাঁর বাড়ীতে***

আসেন, তিনি সব দেখে তাঁকে ডেকে সবিস্ময়ে বললেন, "একি! তুমি পাখীর খাঁচাটিকে তো খুবই পরিচর্যা করছ, কিন্তু এতে পাখীটির কি উপকার হচ্ছে? পাখীটার কি হাল হয়েছে একবার দেখেছ? ওটাতো মৃত্যুপথযাত্রী!' বর্তমান যুগে ঠিক একইভাবে মানুষ সম্পূর্ণভাবে দেহ-সচেতন, বাহ্যিক দেহ — খাঁচাটির পরিচর্যার মশগুল। তারা দেহ পরিচর্যার জন্য বছরের বছর শিক্ষা গ্রহণ করে; এর জন্য খাদ্য ও বিলাসবহুল বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। দেহকে সুস্থ রাখতে গিয়ে তারা জিমে গিয়ে কসরৎ করে। দেহের জন্য তারা কত ব্যয় করে, ভালো পোশাকে, অলংকারে এটিকে সাজায় এবং দেহের সবরকম সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করার জন্য সর্বদাই কর্ম-তৎপর থাকে; তারা জানে না যে এই জড় দেহটি আসলে ব্যক্তি আত্মার একটির অস্থায়ী আচ্ছাদন মাত্র। এইজন্য যেহেতু তারা আত্মার জন্য পারমার্থিক খাদ্যের ব্যবস্থা করে এর পুষ্টিবিধান করে না, সেজন্য তারা তাদের সবরকম প্রয়াস সত্ত্বেও সুখী হতে পারে না; তারা জানে না যে যথার্থ আনন্দময় জীবন হচ্ছে পারমার্থিক জীবন।

প্রকৃত কল্যাণ কর্ম হচ্ছে আত্মোপলব্ধি লাভ করে নিজ কর্তব্য পালন করা এবং অপরদের মধ্যে একই পারমার্থিক শিক্ষার বিস্তার করা। *একজন ধনবান, কোটিপতি জমিদার ছিলেন। একবার তিনি সাঁতার কাটতে গিয়ে বিপদগ্রস্ত হন — স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। তাকে ডুবে যেতে দেখে সবাই চিৎকার করতে লাগল, "বাঁচাও, বাঁচাও! — জমিদারমশাইকে বাঁচাও!" তখন একজন সবল-দেহী যুবক এগিয়ে এলো। সে দেখল যে জমিদার একটি বহু মূল্য সোনালী কোট পরে আছেন। তা দেখে যুবকটি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিল। সে গিয়ে ডুবন্ত জমিদারের দেহ থেকে সুদক্ষভাবে কোটটি নিয়ে তীরে উঠে এল। অল্পক্ষণের মধ্যেই, বলা বাহুল্য, জমিদার অদৃশ্য হয়ে গেলেন — তার সলিল সমাধি হল। তখন সেই যুবক ঐ সোনালী কোটটি সকলকে দেখিয়ে বলল, "যাক্, বহুমূল্য কোটটাকে বাঁচাতে পেরেছি! একেবারে নষ্ট হয়ে যেত!"*

আপনার কি মনে হয় — মানুষ এর জন্য কি তাকে খুব বাহবা দেবে? লোকেরা তাকে ভর্ৎসনা করে বলল, *"মূর্খ! তুমি যদি স্বয়ং জমিদারকে বাঁচাতে, তাহলে তার কিছু ভাল করতে পারতে। তিনি ডুবে যাচ্ছেন, আর তাঁর কোটটা নিয়ে তুমি চিন্তায় শেষ হয়ে যাচ্ছো! তিনি বেঁচে ফিরলে তো তোমাকে লক্ষ লক্ষ টাকা বক্‌শিশ দিতেন!"*

উপরের দুটি গল্পের নীতিকথা হচ্ছে এই যে আত্মার প্রয়োজনগুলিকে অবহেলা করে কেবল দেহের আরাম-বিলাসগুলি বৃদ্ধি করে চলা উচিত নয়। এই জড়দেহটি একটি জামার চেয়ে খুব বেশি ভাল কিছু নয়। অবশ্য মানুষ প্রায়ই এই বিখ্যাত প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে, *"আগে পেট না ভরলে মানুষ কিভাবে ভগবানের আরাধনা করবে বলে আপনি আশা করেন?"* আমরা বলি, *"হ্যাঁ, আমরা মানুষকে সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন করাব — আত্মা ও দেহ উভয়েরই এর ফলে পুষ্টি হয়।"* বিখ্যাত সেই প্রবাদ বাক্যে যেমন বলা হয়েছে, ***"ভগবান প্রত্যেকের যা প্রয়োজন, তা দিয়েছেন, যতটা লোভ, ততটা দেন নি।"****

পৃথিবীতে খাদ্য ও অর্থের কোনো অভাব নেই; পর্যাপ্ত পরিমাণে তা রয়েছে। কিন্তু তবু পৃথিবীর মানুষ নানা সমস্যায় কবলিত, কেননা তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের কর্তৃত্ব স্বীকার করে না, এবং তাঁরা আইন লঙ্ঘন করে নানাবিধ পাপকর্মে নিয়োজিত হচ্ছে। তাঁরা লোভী, বিষয়ভোগ তৃষ্ণায় আকুল; আরো আরো ধন সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য তাঁরা একে অপরকে শোষণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। আজকাল যদি আপনি কোনো ভিখারীকে কিছু খাবার দেন, সে নিতে চাইবে না। সে টাকা চাইবে, কেননা টাকা হলে ধূমপান সহ নানারকম নেশা ভাঙ করা যায়। **সুতরাং মানুষ যতক্ষণ পাপময় কার্যকলাপ বন্ধ না করছে, ততক্ষণ অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান কাজ-অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য — কোন সমস্যারই সমাধান হবে না, মানুষের জীবন যাপনে শান্তি আসবে না।** শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, **"পাপকর্মের মূল কারণ হচ্ছে ভগবানের কর্তৃত্বকে**

*"*God has provided for everyone's need; but not for everyone's greed."*

অস্বীকার করার মাধ্যমে ভগবৎ-প্রদত্ত আইনগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে অমান্য করা।" সুতরাং ভগবানের কর্তৃত্ব, তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে না চাওয়ার এই বিদ্রোহী স্বভাবের জন্য জীবসত্তাসমূহ এ-জগতে দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হতে থাকে।

আজ আমি একজনকে কিছু খাদ্য দিলাম, কিন্তু কাল আবার সে ক্ষুধার্ত হবে। ভিখারীকে যদি চাকরী বা ব্যবসা করতে দেওয়া হয়, আর কিছু দিন পর যদি সে বছরে কয়েক কোটি টাকাও মুনাফা করে, সে আরো চাইবে — এতে তৃপ্ত হবে না। সে অর্থচিন্তায়, নানা পরিকল্পনায় আমৃত্যু মশগুল থাকবে — শান্ত হতে পারবে না। পরম পরিতৃপ্তি, সন্তোষ একজন ভক্তই কেবল লাভ করতে পারেন, কেননা শ্রীভগবানের প্রীতিবিধান ব্যতীত তাঁর আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। তিনি ধনীই হোন বা দরিদ্র হোন, ভগবান তাঁকে যা দিয়েছেন, সেটাকে তিনি ভগবানের করুণা রূপে গ্রহণ করেন এবং সুখে জীবন কাটান। অন্তহীন তৃষ্ণার আগুন তাঁর মনকে নিরন্তর দগ্ধ করে না, শত শত আশা-বাসনা তাঁর চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে না। সুতরাং, জনগণকে প্রকৃত ধর্ম-শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাদেরকে কৃষ্ণভাবনাময় করে তোলাই হচ্ছে একমাত্র সমাধান। বিশ্বজুড়ে ভগবৎ-চেতনার প্রসারই হচ্ছে বিশ্বের মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধির একমাত্র উপায়। কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শন পৃথিবীর সকল সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক সমস্যার সমাধান। ব্যক্তিগতভাবে যেকোন মানুষ যখন ভগবানের কর্তৃত্ব স্বীকার করে, কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে, তখন সে শান্তি লাভ করে, হৃদয়ে যথার্থ সুখ অনুভব করে।

যিনি ভগবৎচেতনা দান করেন, তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী, সে বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। একবার একজন কোটিপতি ধনী ব্যক্তি একটি বড় উৎসবের সময় তাঁর ছোট শিশুপুত্রকে হারিয়ে ফেলেন। তিনি সমস্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্রের কোনো সংবাদ পেলেন না। উৎসব শেষ হয়ে যাওয়ার পর একাকী শিশুটি একটি ভিখারী অনাথের মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পরপর চারজন লোক তাকে দেখলেন। প্রথম মানুষটি দেখলেন যে শিশুটি ক্ষুধার্ত। তার প্রতি করুণাপরবশ হয়ে তিনি তাকে কিছু খাবার দিলেন। দ্বিতীয় মানুষটি দেখলেন যে শিশুটির জামা-প্যান্ট ছিঁড়ে গেছে, শীতের পোশাকও নেই। দয়াপরবশ হয়ে তিনি তাকে এক সেট নূতন পোষাক, চাদর কিনে দিলেন। তৃতীয় মানুষটি দেখলেন যে শিশুটির দেহে একটি ক্ষতস্থান রয়েছে, সেটি তাকে নিরন্তর কষ্ট দিচ্ছে; তিনি সেখানে লাগানোর জন্য কিছু ওষুধ-পত্র তাঁকে এনে দিলেন। কিন্তু যখন চতুর্থ মানুষটি তাঁকে দেখলেন, তিনি বুঝতে পারলেন যে শিশুটি একজন ক্রোড়পতির পুত্র, যাঁকে তিনি চিনতেন। তিনি ঐ শিশুটির প্রতি প্রবল করুণা অনুভব করলেন। তাঁকে সংগে নিয়ে তিনি ক্রোড়পতি পিতার বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, এবং পরিশেষে শিশুটিকে তাঁর পিতার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এই চারজনের মধ্যে কাকে আপনি ঐ শিশুটির সবচেয়ে বড় কল্যাণকারী বলে মনে করেন?

স্পষ্টতঃই চতুর্থ মানুষটিই ঐ শিশুর সর্বোত্তম মঙ্গল করেছেন, কেননা, *যখন শিশুটি গৃহে ফিরে এল, পিতা অপরিসীম স্বস্তি ও আনন্দ অনুভব করলেন। তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে আলিঙ্গন করে প্রেম প্রীতিতে তাঁকে নিঃস্নাত করলেন। শিশুটির সকল কষ্ট তিরোহিত হল; তার যখন খাবার প্রয়োজন হল, অজস্র সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জনে তাঁকে ভুরিভোজন করানো হল। তাকে একঘর ভর্তি সুন্দর পোশাক পত্র দেওয়া হল — ইচ্ছামত বেছে নেওয়ার জন্য। তার অন্যান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-বিলাসের কোনো অভাব ছিল না — পর্যাপ্ত পরিমাণে সে পেতে থাকল। গভীর পিতৃস্নেহে তাঁর পূর্বের দুঃখময় স্মৃতি মন থেকে মুছে গেল। এইভাবে তাঁর পিতার সংগে মিলিত হওয়ার ফলে শিশুটি সর্বতোভাবে সুখী হল।*

এই উপমাটিতে, প্রথম যে তিনজন মানুষ শিশুটিকে খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ দিয়েছিল, তাদের তুলনা করা যায় সমাজসেবীদের সংগে। সমাজসেবীরা মানুষের জন্য কতরকম 'ভাল' কাজ করে থাকেন ঃ দরিদ্রদেরকে খাওয়ানো, দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরী, বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি। মানুষ এই সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে ক্ষণস্থায়ী সুখ লাভ করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রধান যে জড় দেহজাত চারটি সমস্যা — জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি — এগুলিকে বন্ধ করা যাবে কিভাবে? কে তাদেরকে ভগবৎ-তত্ত্ব জ্ঞান দান করবে? অজ্ঞানতার গভীর তমিস্রা থেকে মুক্ত করে কে তাদের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করবে, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে সাহায্য করবে?

যিনি শিশুটিকে তার পিতার কাছে, তার নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন একজন ভগবদ্ভক্তের মতো। ভগবানের শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের মাধ্যমে জীব-সত্তাকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে, তাঁর ধামে কৃষ্ণলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যান, আর শ্রীকৃষ্ণই আমাদের চির-শুভাকাঙ্ক্ষী, শাশ্বত পিতা। আর একবার যদি আপনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যান, তখন আপনার সমস্ত প্রয়োজন, অভাব, চাহিদা পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

কৃষ্ণভাবনাময় চিত্তে দেহত্যাগের কৌশল

সময় ও নদীর স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করে না

অর্জুনের কাছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিরাট, মহাবিস্ময়কর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। ঐ বিশ্বরূপে অর্জুন অজস্র সহস্র সহস্র — মস্তক, মুখ, বহু, উদর, উরু, পদ, তার মুখে অজস্র ভয়ংকর দন্তরাজি দর্শন করেন। অর্জুন দেখতে পান যে এমনকি মহা মহা দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের মহাবিপুল বিরাটমূর্তি দর্শন করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। অর্জুন আরো দেখেন যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণসহ মহা মহা যোদ্ধাগণ সবেগে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের করাল মুখ-ব্যাদানের মধ্যে প্রবেশ করছে; কেউ কেউ তাঁর দন্তে বিলগ্ন হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অর্জুন দেখতে পান যে ভগবান তাঁর প্রজ্বলিত অগ্নি-উদ্গীরণশীল মুখগহ্বরে সর্বদিক থেকে আগত সমগ্র মানুষকে ভক্ষণ করছেন। সহস্র সূর্যের মত প্রভাময় তাঁর গাত্র-নিঃসৃত প্রবল রশ্মিচ্ছটায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদিত হয়ে গেছে।

সেই সময় ভয়বিহ্বল অর্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, *"উগ্রমূর্তি তুমি কে, আমাকে বল। হে দেবশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও। আমি তোমার প্রবৃত্তি (উদ্দেশ্য) অবগত নই, আমি তোমাকে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করি"* (ভ.গী. ১১/৩১)। পরমেশ্বর ভগবান বলেন, *"আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল। এখন লোক সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমরা (পাণ্ডবেরা) ছাড়া সমস্ত যোদ্ধারা ধ্বংস হবে"* (ভ.গী. ১১/৩২)। কাল বা সময় ধ্বংসাত্মক; সমস্ত জড় জাগতিক প্রকাশ ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। এই হচ্ছে জড়া প্রকৃতির নিয়ম।

মহান রাজনীতিজ্ঞ ও পণ্ডিত চাণক্য বলেন যে এক মুহূর্ত সময় যখন অতিবাহিত হয়, তখন তা লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়েও ফিরে পাওয়া যায় না। সুতরাং জীবনের অমূল্য সময়ের অপচয় করলে যে ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতির পরিমাপ করা কারোর সাধ্য নেই। জড় জাগতিকভাবে হোক বা পারমার্থিকভাবে হোক, প্রত্যেকেরই উচিত হাতের সময়ের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা। একজন বদ্ধ জীবাত্মা একটি বিশেষ মানব দেহে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান করে; সেজন্য শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরিপূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত লাভে প্রয়াসী হওয়া উচিত, যার ফলে কালের প্রভাব হতে বিমুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত যাঁরা কৃষ্ণভাবনাময় নয়, তাদেরকে কোন রকম জ্ঞান লাভ না করেই কালের প্রবল প্রভাবে বিতাড়িত হতে হয়, ঠিক যেমন বায়ুপ্রবাহ মেঘকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিভূ, এবং তার প্রধান কাজ হচ্ছে সব কিছুকে ধ্বংস করা, বিনষ্ট করা (*'মৃত্যু সর্বহরশ্চ অহম্ — "আমি সর্বস্ব হরণকারী মৃত্যু"* ভ.গী. — ১০/৩৪, *কালং কলয়তামহম্ "আমি হচ্ছি সবকিছুকে বিনষ্টকারী মহাকাল"* ভ.গী. — ১০/৩০)। জড়চেতনায় আচ্ছন্ন জড় বিষয়াসক্ত মানুষ অর্থনৈতিক উন্নতির নামে কত কিছু উৎপন্ন করে চলেছে। তারা মনে করে যে মানুষের জড়জাগতিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে প্রচুর উন্নতি করলে মানুষ সুখী হতে পারবে। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে যা-কিছুই তারা উৎপাদন করছে, সবই কালের প্রবাহে ধ্বংস হয়ে যাবে। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে পৃথিবীতে কত প্রবল; চিন্তা, শ্রম দিয়ে কত মহা মহা শক্তিধর সাম্রাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছিল,

কিন্তু কালের অপ্রতিরোধ্য গতিতে সেগুলি সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তবুও জড়ভাবাপন্ন মানুষ বুঝতে পারে না যে তারা তথাকথিত জড়জাগতিক প্রয়োজনগুলি পূরণের জন্য অজস্র সব ভোগ্য সামগ্রী উৎপাদনের মাধ্যমে কেবল সময়ের অপচয় করছে; কালের প্রভাবে তাদের সুখী হবার সমস্ত প্রয়াস পরভুত হতে বাধ্য। **মানবীয় শক্তির এই বৃথা অপচয়ের কারণ হচ্ছে সাধারণ মানুষের অজ্ঞানতা, তারা জানে না যে তারা শাশ্বত, এবং তাদের শাশ্বত কার্যকলাপও রয়েছে,** আর আত্মার অনন্ত অভিযাত্রার পথে একটি বিশেষ দেহের অস্তিত্ব কেবল বিদ্যুৎচমকের মতোই ক্ষণস্থায়ী। এই সত্যটি না জানার ফলে মানুষ এই স্বল্পস্থায়ী বর্তমান জীবন-রূপ বিদ্যুৎ-চমককেই তাদের যথাসর্বস্ব বলে মনে করে, এবং কেবল অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য সময়ের অপচয় করে চলে।

মৃত্যু আসে বিনা বিজ্ঞপ্তিতে, আচম্বিতে

আপনি কি জানেন, কিভাবে একজন মানুষের জীবনে মৃত্যু আসে? এটি ঠিক একজন সর্বস্বাপহারী দস্যুর মতো, যে অকস্মাৎ আপনার সামনে এসে কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে দাঁড়ায়! কর্কশস্বরে সে আপনাকে হুকুম করে অবিলম্বে আপনার যথাসর্বস্ব তাঁকে দিয়ে দিতে, আর ট্রিগার চেপে সে পিস্তল তাক করে রাখে কপালে। আপনি কোনভাবেই অগ্রাহ্য করতে পারেন না তাকে — আপনার সর্বস্ব সে ছিনিয়ে নেবেই; এমনকি আপনার সম্মতি-অসম্মতি বা বাধা দানের কোনোই পরোয়া করে না সে!

একবার আমেরিকার এক শহরের একটি ভাড়াটিয়া মহিলা যে বাড়ীতে ভাড়া ছিলেন, তাতে তাঁর ভাড়া নেওয়ার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল; তিনি পুনর্নবীকরণ করেননি। এক সুন্দর সকালে পুলিশ বাহিনী এল। তারা জোর করে দরজা ভেঙে ঐ মহিলার ঘরে ঢুকে তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র, আসবাব সব বাইরে নিক্ষেপ করল, কেবল ঐ মহিলা যে খাটে শুয়েছিলেন, সেইটি বাদে। দুজন করে পুলিশ সেই খাটটির দুদিকে ধরে ঐ মহিলাসহ উঁচু করে তুলে নিয়ে গিয়ে বাইরে রেখে এল। যখন সে ঘুম থেকে জেগে উঠল, সে দেখতে পেল যে তাঁর সমস্ত জিনিসগুলি বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, এবং তাঁর বাড়ীটাকে সিল করে দেওয়া হয়েছে। গভীর দুঃখে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন এবং তাঁর স্বামীকে ফোন করার জন্য কাছাকাছির টেলিফোন বুথে গেলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বিভিন্ন লোক মোটর সাইকেল আর ট্রাকে করে সেখানে এসে তাঁর সমস্ত জিনিস পত্র — টি. ভি., ফ্রিজ. ওয়াশিং মেশিন, আলমারী এবং অন্যান্য সব সরঞ্জাম নিয়ে যেতে লাগল।

ঠিক এইভাবেই আমাদের কাছে আসে সর্বস্ব অপহারী দস্যু-রূপী মৃত্যু। এটি কল্পনা নয় — বাস্তব সত্য, যা সকলকেই অনুভব করতে হয়। এক সুন্দর দিনে আমাদের উপর নেমে আসে মৃত্যু রূপী বজ্রাঘাত; অনিচ্ছা সত্ত্বেও পদাঘাতে আমাদের বের করে দেয় — যা কিছু এতকাল 'আমার, আমার' বলে পরম যত্নে আগ্‌লে রেখেছি, সেই সমস্ত গৃহ-সম্পদ-পরিবার থেকে — এমনকি নিজের অতিপ্রিয় দেহটি থেকেও! এইভাবে বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করাটা হতাশাবাদ নয়, কিছু লোক যেমন বলে থাকেন। এটি কঠোর বাস্তবতা! কে এটা অস্বীকার করতে পারেন?

একজন ভক্ত ও একজন জড়বিষয়াসক্ত অভক্তের মৃত্যু

কখনো কখনো আপনি যখন সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যুর মতো জীবনের কঠিন বাস্তবতার বিষয়ে কথা বলেন, তখন প্রায়ই তাঁরা পরিহাস করে প্রশ্ন করেন, *"প্রিয় বন্ধু, আপনিও কি বাদ পড়ছেন নাকি? আপনি বলছেন যে আপনি একজন ভক্ত, কিন্তু আপনারও তো মৃত্যু হবে —আপনিও তো মৃত্যুবরণ করতে চলেছেন? কৃষ্ণ কি আপনাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করবেন? আপনি ভক্তই হোন আর অভক্তই হোন, মরতে তো আপনাকে হবেই! তাহলে আর অত ভেবে কি হবে — বরং যতদিন বেঁচে আছি, আনন্দ-ফূর্তি করি, জীবনের রূপ-রস নিংড়ে শেষ বিন্দু অবধি উপভোগ করি ... ... ভক্ত হওয়ার কি দরকার?"*

এই হচ্ছে নির্ভেজাল মুর্খামি। যখন মানুষ এইভাবে কথা বলে, তখন তাঁরা প্রকারান্তরে তাদের দেহচেতনায়, দেহাত্মবুদ্ধিতে সুন্দর প্রগতির কথাই প্রকাশ করে।

শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে কিভাবে সবকিছুকে উপভোগ করতে হয়

আপনার এটা অবগত হওয়া উচিত যে আমরা কখনো অন্য কাউকে বলি না, *"তোমার আনন্দোপভোগ করা উচিত নয়"।* আমরাও উপভোগ করতে চাই। কিন্তু কিভাবে উপভোগ করা উচিত সেটা জানার জন্য কিছু বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন।

উট যখন মরু-প্রান্তরে কাটা ঘাস চিবায়, তখন সে মনে করে সে খুব সুন্দর স্বাদ উপভোগ করছে, কিন্তু আসলে সে তার নিজের রক্তই গলাধঃকরণ করছে। সে যখন প্রায় নীরস ঐ কাঁটাঘাস চিবায়, তখন ঐ কাটায় তাঁর জিভ ছড়ে যায়, উটের মাড়ি থেকেও রক্ত বেরোতে শুরু করে। এইভাবে নিজের মুখের ক্ষরিত রক্ত কাঁটা ঘাসের সংগে মিশ্রিত হয়ে একরকম স্বাদ তৈরী করে, ফলে উট মহা আয়েসে আধবোঁজা চোখে সেই কাটাঘাস চেবানোর সুখ উপভোগ করতে থাকে, যে সুখ সর্বৈব মিথ্যা। ঠিক তেমনি বড় বড় বিজনেস ম্যাগনেট — ধনী শিল্পপতি, উদ্যোগপতি — যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে নানা রহস্যময় উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করে সীমিত সময় তা উপভোগ করার চেষ্টা করে, তারা আসলে তাদের স্বরক্ত-মিশ্রিত কর্মের কাঁটাময় ফল চর্বণ করে থাকে, যে সুখের আস্বাদন জড়, সীমিত, অস্থায়ী — তা প্রকৃত বাস্তব নয়, মায়া-সৃষ্ট, প্রহেলিকাময়।

ঠিক তেমনি, মুর্খ জড়বিষয়াসক্ত লোকেরা বলে থাকে যে তাঁরা ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায় না, কেননা তাঁরা 'ভোগ' করতে চায়। কিন্তু তারা যখন সমস্যায় পড়ে (সমস্যার আবির্ভাব এই জড়জগতে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার), তখন তারা বিভিন্ন রকম বদভ্যাস — যেমন ধূমপান, মদ্যপান্যাদি নেশাসক্তি, জুয়া, যৌনতা — প্রভৃতির দাস হয়ে পড়ে — কিছুক্ষণের জন্য হলেও বাস্তবকে ভুলে যেতে তারা এইসবের আশ্রয় নেয়।

তবুও কেউ যদি মনে করে যে এই জগতে রয়েছে অবিমিশ্র সুখের অঢেল আয়োজন, তাহলে তার বুদ্ধি পূর্বোক্ত উটের থেকে আদৌ উন্নত নয়। ভগবদ্ভক্তরা অবশ্য কেবল জীবনের দুঃখ দর্শন করে দুঃখভারগ্রস্ত, বিষণ্ন থাকেন না, **তাঁরাও উপভোগ করেন জীবনের আনন্দরস; তবে তাঁদের উপভোগের পন্থা ভিন্ন। তাঁরা সবকিছুকে উপভোগ করেন শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে।** শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আনন্দময় পুরুষ, সকল আনন্দের ও সৌন্দর্যের আধার। সেজন্য তাঁর সংগে সম্পর্কিত হলে সবকিছু যথার্থ আনন্দময় হয়ে উঠে। ভক্তগণ সুস্বাদু আহার্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে আস্বাদন করেন এই আস্বাদনের সুখ সাধারণ স্বাদু খাবার আস্বাদনের সামান্য রসনা-সুখ থেকে আলাদা — এর মধ্যে মিশ্রিত রয়েছে প্রীতিরস, ভালবাসার অপ্রাকৃত মাধুর্য, যা ঐ আস্বাদনকে মধুরতাময়, হৃদয়ের পরিতৃপ্তিকর করে তোলে। তেমনিভাবে ভক্তরাও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শোভনীয় শ্রীবিগ্রহের সামনে দিব্যানন্দে নৃত্য করেন, এই নৃত্য কেবল জড় দেহের অঙ্গভঙ্গির শুষ্ক শিল্প-চর্চার থেকে অনন্তগুণে রমণীয়। তাঁরা যখন প্রীতি-মাধুর্য মিশ্রিত করে ভজন-গীতি গান করেন, সংগীত-সুর-রাগধ্বনিত করেন, তখন সেই সংগীত জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে কৃত নানা বিনোদনগীতি থেকে কোটিগুণে শ্রবণরম্য, মাধুর্যময় অনুভূত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি প্রদানের জন্য যে ভালবাসা-সম্পৃক্ত সুরগীতি গান করা হয়, তা হৃদয়কন্দরে নিয়ে আসে এক গভীর সন্তোষ, দিব্য আনন্দোল্লাস, যা কেবল মানসিক প্রশান্তির থেকে অনেক বেশি কিছু, এবং যা বাহ্যিক, জড় লাভ-ক্ষতির দ্বারা কখনই প্রভাবিত হয় না। আর বৌদ্ধিক পরিতৃপ্তি? কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শন-বিষয়ক অজস্র গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়া রয়েছে অসংখ্য লেকচার টেপ, অডিও এবং ভিডিও সিডি — ইত্যাদি, যা একই সাথে বিজ্ঞানভিত্তিক ও দার্শনিক — এবং যা পারমার্থিক উন্নতির ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতির সহায়ক। এছাড়া সারা বছর রয়েছে নানা আনন্দময় উৎসব। পারমার্থিক জীবন, ভক্ত জীবন নীরস, শুষ্ক নয় — আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ, সুখোজ্জ্বল, মধুরতাময় এবং যথার্থ বাস্তব।

জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা মনে করে যে ভক্তরা আসলে উন্মাদ, তারা কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে সময়ের বৃথা অপচয় করে, অথচ সে জানে না যে দেহটিকেই নিজের স্বরূপ বলে গ্রহণ করার ফলে সে নিজেই মোহ ও উন্মত্ততার এক অন্ধতম প্রদেশে প্রবেশ করছে। শুধু কেবল নিজ দেহটিকেই নয়, দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত তার গৃহ, পরিবার, দেশ, সমাজ এবং অন্যান্য সমস্ত উপকরণকে সে চিরস্থায়ী বলে মনে করছে। এইভাবে গৃহ, ভূমি ইত্যাদিকে চিরস্থায়ী বলে গ্রহণ করার এই জড়বাদী মানসিকতা বা ধারণাকে বলা হয় মায়া, অলীকতা। কৃষ্ণভক্তগণ জানেন যে মানব সমাজের অর্থনৈতিক প্রগতির প্রয়াস মায়িক, অলীক ছাড়া কিছু নয়। সমৃদ্ধি ও প্রগতি নিন্দনীয় নয়, কিন্তু কেবল জড়দেহের তৃপ্তি, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যের পরিবর্তে যখন তা মানব সমাজে কৃষ্ণচেতনা বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, তখন মানব সভ্যতা যথার্থ উন্নত হয়ে ওঠে।

ভক্তের কাছে মৃত্যু আসে কৃষ্ণরূপে
অভক্তের কাছে কৃষ্ণ আসেন মৃত্যুরূপে

ভক্ত ও জড় বিষয়াসক্ত মানুষের জীবন ও চেতনার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্য উভয়ের মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার মানসিকতার মধ্যে স্বভাবতই প্রতিফলিত হয়। ভক্তের কাছে মৃত্যু দুঃখজনক বা আনন্দজনক কোনটিই নয়। কেউ হয়ত বলতে পারেন যে মৃত্যুর সময়ে ভক্তকেও তার জড় শরীরটি ত্যাগের জন্য কষ্ট পেতে হয়। এ বিষয়ে এই দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যে, একটি বিড়াল তার মুখে ইঁদুর ধরে বয়ে নিয়ে যায়, আবার সে তার বাচ্চাদেরকেও মুখে করে অন্যত্র নিয়ে যায়। ইঁদুর ও বিড়াল ছানা একই মুখে বাহিত হয় — কিন্তু উভয়ের মানসিকতা এক নয় — সম্পূর্ণ আলাদা। ঐ একই মুখে থেকে বিড়াল ছানারা স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ মনে করছে, পক্ষান্তরে ইঁদুর সেটাকে মৃত্যুর করাল গ্রাস বলে অনুভব করছে। ঠিক তেমনি মৃত্যুর সময়ে ভক্তগণকে চিন্ময় জগতে, বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে যাওয়া হয়, পক্ষান্তরে সাধারণ জড় বিষয়াসক্ত অভক্তকে জোর-পূর্বক যমদূতেরা নরকলোকে টেনে নিয়ে যায়। এইভাবে, অভক্ত অসুরের কাছে কৃষ্ণ মৃত্যু রূপে আবির্ভূত হন, তাদের যথাসর্বস্ব হরণ করেন (*মৃত্যু সর্বহরঃ চ অহম্ — ভ. গী.*), ভক্তদের কাছে মৃত্যু কৃষ্ণ রূপে আসে।

জীবন পরীক্ষার প্রস্তুতি, মৃত্যু অন্তিম পরীক্ষা

আমরা যাতে দেহান্তে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারি, সেজন্য মৃত্যুর সময়ে আমাদের মনের ভাব কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সূত্র প্রদান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন ঃ

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি সব মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

"মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। "(ভ.গী. ৮/৫)

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

"মৃত্যুর সময় যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন" (ভ.গী. ৮/৬)

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ মামেবৈষ্যসি অসংশয়ঃ॥

"অতএব হে অর্জুন, সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব-বিহিত যুদ্ধ কর, তাহলে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পিত হবে এবং নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে।" (ভ.গী. ৮/৭)

অর্জুনের প্রতি প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশগুলি সকল মানুষের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্ববহ। যে ব্যক্তি জীবনান্তে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করে, সে পরমপুরুষ ভগবানের মতই চিন্ময় প্রকৃতি, শাশ্বত, জ্ঞানময় ও আনন্দময় দেহ — অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় দেহ লাভ করে থাকে (ভ.গী.- ৮/৬)। এই সংগে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর স্মরণ করলে (যেমন নিরাকার ব্রহ্ম) কখনই ঐরকম স্বরূপ লাভ করা যায় না, শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না। যে যে-তত্ত্ব স্মরণ করে দেহত্যাগ করে, সেটিই সে লাভ করে থাকে এবং এই প্রক্রিয়াটি অব্যর্থ, অমোঘ, অনিবার্য (৮/৭)।

"যত মত তত পথ" — অর্থাৎ যতরকম মত উদ্ভাবিত হোক, পরম লক্ষ্যে উপনীত হবার ততগুলি পথ — এই কথাটি ভগবদ্গীতায় স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের বাণী অনুযায়ী সর্বৈব ভ্রান্ত। যদি আমি মুম্বই-পৌঁছানোর জন্য ট্রেনের টিকিট কাটি ও ট্রেনে চাপি, আমি কখনোই এমন প্রত্যাশা করতে পারি না যে ট্রেনটি আমাকে পুরীতে নিয়ে যাবে। ঠিক তেমনি এই দেহে অবস্থান কালে যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম ও প্রেমময় সেবা লাভের জন্য আকুলতা অর্জুন না করেছেন, তিনি কখনই এমন প্রত্যাশা করতে পারেন না যে জড়দেহটি ত্যাগের পর তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য চিরন্তন লীলাবিলাসে যোগদানের জন্য তাঁর পরম ধামে ফিরে যাবেন। যদি কেউ এমন কল্পনা করেন যে ভগবানের নাম-রূপ-গুণ নেই এবং তিনি ব্রহ্মে লীন হতে চান (এই ইচ্ছা আসলে ভগবানের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর মতোই সর্ব-ব্যাপিত্ব, অসীম ব্যক্তিত্ব লাভের আসুরিক আকাঙ্ক্ষা-সঞ্জাত), তাঁকে ব্রহ্মজ্যোতিতেই যেতে হবে। সেজন্য জীবসত্তার পরম গন্তব্য, আদর্শ পরম গতি কি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে চূড়ান্ত শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া প্রত্যেকের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের ধামে ফিরে যেতে চান, তাহলে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মত মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করতে হবে, কৃষ্ণ-তন্ময় থাকতে হবে। কিভাবে সেটি সম্ভব? কেউ যদি সারা জীবন নিরন্তর ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন, অর্থাৎ কৃষ্ণচিন্তা ও কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত থাকে, তখন তার ফলে জড় আসক্তি, জড় কলুষ চিত্ত হতে বিদূরিত হয়, দেহাত্মবুদ্ধি হতে সে মুক্ত হয়, ফলে মৃত্যুকালে নশ্বর দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'স্বজন' বা বিষয়-সম্পদ-এর পরিবর্তে চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় আবিষ্ট থাকে। যে-যা ভালবাসে, মৃত্যুকালে সেটাই চিন্তা করে। ভগবৎ-প্রেম, কৃষ্ণাসক্তি লাভ করলে অন্তকালে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাই উদিত হবে। জীবন-ব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের ফলে চিত্ত কৃষ্ণচেতনাময় হয়ে যায় (*সদা তদ্-ভাবভাবিত*), ফলে মৃত্যুকালে স্বভাবতঃই কৃষ্ণচেতনা জাগরূক থাকে। এজন্য প্রয়োজন আজীবনের প্রস্তুতি। ***কেউ যদি বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতে চায়, তাহলে তাকে সারা বছর নিষ্ঠার সংগে প্রস্তুতি নিতে হয়। ঠিক তেমনি বর্তমান জীবনটি আসলে প্রস্তুতির সময়, শ্রীকৃষ্ণকে ও মনকে প্রশিক্ষিত করে তোলার সময়।***

সাধারণভাবে, ভক্তি-অনুশীলন-প্রভাবে আমরা সমস্ত সংশয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত চিন্তা কলুষ থেকে (যেমন অহঙ্কার, কাম, মাৎসর্য বা ঈর্ষাকাতরতা, ক্রোধ এবং মোহ) বিমুক্ত হতে পারি এবং তখন অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমময় অভিলাষ বিকশিত হয়। এইভাবে আমরা যখন কৃষ্ণভাবনায় নিমগ্ন হই, তখন আমরা মৃত্যুকালে কৃষ্ণস্মরণে সফলতা লাভ করতে পারি। সুতরাং, একজন ব্যক্তি জীবনভর যেমন চিন্তা-চেতনায় নিজেকে নিমগ্ন রাখেন, মৃত্যুকালে সেইসব চিন্তা একত্রিত হয়ে তাঁর মনকে প্রভাবিত করতে থাকে। সুতরাং আমরা আমাদের বর্তমান জীবন যেভাবে যাপন করব, সেই জীবন-যাপন ধারা আমাদের পরবর্তী জীবন কেমন হবে তা নির্ধারণ করবে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকট কালে বৃন্দাবনবাসীগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণচিন্তায় আবিষ্ট থাকতেন। কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কাউকে তাঁরা জানতেন না। তাঁরা কেবল কৃষ্ণের প্রীতিসাধনের চেষ্টা করতেন, অন্য কারো নয়। সুতরাং আমাদের আদর্শ হচ্ছে বৃন্দাবনের

ব্রজবাসীদের মতো হওয়া, শুধু কৃষ্ণের প্রীতির জন্য সমস্ত কর্ম সম্পাদন করা। কোনো ব্যক্তির অন্তরে কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কৃষ্ণের সেবা করার জন্য যতই রুচি বিকশিত হবে, ততই তার দেহান্তে শাশ্বত আনন্দময় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া সুনিশ্চিত হবে। আমাদের শাস্ত্রসমূহ বার বার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ

"সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করো,
কখনো কৃষ্ণকে ভুলে যেও না।"

— পদ্মপুরাণ

মৃত্যুকালে কৃষ্ণ স্মরণ

কেউ হয়ত বলতে পারেন, *"আচ্ছা, বেশ, আপনি বলছেন যে মৃত্যুকালে আমি যদি কৃষ্ণচিন্তা করি, তাহলে আমি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারব। তাহলে এটি যখন মৃত্যুকালের ব্যাপার, এখন তা-নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ কি? এখন মন যা চায় তেমনি খুশিমতো ভোগবিলাসের মাধ্যমে জীবন উপভোগ করি! যখন মৃত্যুর সময় আসবে, তখন আমি দ্রুত কৃষ্ণে মন নিবিষ্ট করব এবং ফলে পরম ধামে ফিরে যাব। এইভাবে আমি উভয় জগতেরই পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করতে পারব।"* যেসব মানুষ এইরকম চিন্তা করে, তারা নিজেদেরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকেও বুদ্ধিমান মনে করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রতারণা করা সম্ভব নয়। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে তিনি হচ্ছেন সমস্ত ছলনাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণকে প্রতারিত করার সাধ্য কার আছে? যে-ব্যক্তি আজীবন জড় বিষয়াসক্ত থাকে, সে মৃত্যুকালে কখনো মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ করতে পারে না — এমনকি চেষ্টা করলেও নয়। যে ছাত্র পরীক্ষার জন্য সারা বছর কোনো রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করে নি, তার পক্ষে স্টার নম্বর পাওয়া কিভাবে সম্ভব?

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করার আমাদের কোনো সামর্থ্য নেই, কেননা মৃত্যু এক অত্যন্ত মর্মন্তুদ যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা। আমরা যদি স্বাভাবিক অবস্থায় অবিরাম কৃষ্ণস্মরণ করতে সক্ষম না হই, তাহলে আমরা কি করে ভাবতে পারি যে মৃত্যুর মতো জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক, বিয়োগান্তক মুহূর্তে আমরা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মন নিবিষ্ট রাখতে পারব? তা একপ্রকার অসম্ভব। কেবল শ্রীকৃষ্ণই এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন — আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে। যদি তাঁর সেবা করার জন্য আমাদের আন্তরিকতা দর্শন করে তিনি প্রীত হন, তাহলে মৃত্যু অত্যাসন্ন হলে তিনি আমাদের অনুগ্রহ করেন, আর তাঁর কৃপা-প্রভাবে আমরা ঐ চরম সময়েও তাঁর চিন্তায় মনোনিবেশে সমর্থ হই। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন-প্রতিবন্ধকতা সহ্য করেও নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র **— হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥** জপ করে যাওয়া, যাতে জীবনান্তে আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণ ফল লাভ করতে পারি।

কর্মবন্ধন ও পুনর্জন্ম হতে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়

প্রাচীন ভারতের ঋষি-মুনিগণ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন যে মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর অন্তহীন আবর্তন-চক্র হতে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। *"আর ফিরে এসো না"*, তাঁরা আমাদের সতর্ক করেন। জড় জগতের কোন বদ্ধজীব যখন একটি জীবন সম্পূর্ণ করে, তখন পুনর্জন্মের নিয়ম অনুসারে তাঁকে পরবর্তীতে আরেকটি জীবন শুরু করতে হয়। প্রতি জীবনে সে জড়জাগতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে কর্ম করে, কিন্তু পরিণামে তার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়, এবং তাকে নূতন করে সব কিছু শুরু করতে হয়, অর্থাৎ আরেকটি দেহ ধারণ করে নূতন করে জীবন-সংগ্রাম শুরু করতে হয়। এইজন্যই এই জড় জগৎকে বল হয় **'মৃত্যু-সংসার সাগর'**। এই ভব সংসার অজ্ঞানতা ও মৃত্যুর এক অসীম মহাসাগর, যার মধ্যে আমরা নিপতিত হয়েছি। এই সংসার অরণ্যের মহাদাবাগ্নির মতো,

যা আমাদের নিরন্তর দগ্ধ করছে। কিন্তু এই মৃত্যু-সংসারে-সাগরে কোটি কোটি বার জন্ম ও মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভবের কোনো বাধ্যতা নেই; এর থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার উপায় রয়েছে ঃ যথাযথ সূত্র থেকে পারমার্থিক জ্ঞান, দিব্যজ্ঞান লাভ করা।

এই জ্ঞানের প্রথম ধাপ হচ্ছে, *"আমি এই দেহ নই; আমি শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা"* — এইটি উপলব্ধি। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানা এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা। একজন ব্যক্তি কেবল তখনই এই জ্ঞান যথাযথ ভাবে লাভ করতে পারেন, যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ হতে আগত প্রামাণিক পরম্পরাগত কোন সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুরুদেব তাঁর রুচি-বুদ্ধিকে পরিশীলিত করে কৃষ্ণ শরণাগতিতে প্রশিক্ষিত করে তোলেন, তখন ঐ ব্যক্তির মায়ামোহ অজ্ঞান-তামস বিদূরিত হয় এবং উজ্জ্বল পারমার্থিক দিব্যজ্ঞান লাভ করে তিনি সব কিছু উপলব্ধি করতে পারেন, সব কিছু তার নিকট যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়।

মন ও ইন্দ্রিয়গুলির তৃপ্তিরসাধনের জন্য ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের কার্যকলাপ হচ্ছে জড়-বন্ধনের কারণ, এবং যতদিন কেউ এইরকম কার্যকলাপে বদ্ধ থাকে, ততদিন আত্মা নানা প্রজাতির দেহে দেহান্তরিত হতে থাকে। এটি অনিবার্য সত্য। যতদিন না কেউ জীবনের পারমার্থিক মূল্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হচ্ছে, অধ্যাত্ম-জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হচ্ছে, ততদিন অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা হতে উদ্ভূত দুঃখ-দুর্দশার কাছে পরাভব স্বীকারে তাকে বাধ্য হতে হবে। পুণ্যকর্ম বা পাপ কর্ম — যাই হোক না কেন, কর্ম করলেই তার ফল ভোগ করতেই হবে। কর্ম করলেই তার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় — ভাল কর্মের জন্য ভাল ফল, আর খারাপ কর্ম বা কুকর্মের জন্য কুফল, কিন্তু এই ফল ভোগের জন্য অব্যহত ধারায় চলতে থাকবে জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তন। সেজন্য যতদিন না অন্তরে ভগবৎ-প্রেম বিকশিত হয়, ততদিন বার বার এক-একটি জড়দেহ ধারণ হতে ঐ বদ্ধ জীবের কোনো অব্যাহতি নেই, জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল হতে সে বিমুক্ত হতে পারে না।

জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে মুক্তি ও জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-শূন্য শাশ্বত জীবন লাভের জন্য কেবল তাত্ত্বিক উপলব্ধিই পর্যাপ্ত নয় — আরো বেশি কিছু প্রযোজন। **কেউ তার জড় দেহটি নয়, সে চিন্ময় আত্মা — কেবল এই জ্ঞান মুক্তি লাভের জন্য পর্যাপ্ত নয়। আত্মা হচ্ছে চেতন সত্তা, অজড় চিন্ময় সত্তা; আত্মা নিষ্ক্রিয় নয়, কামনাহীনও নয়; চিন্ময় আত্মার স্বরূপগত বৃত্তি, ক্রিয়াকলাপ রয়েছে। তাই জড়বন্ধন হতে মুক্ত হতে হলে অবশ্যই চিন্ময় আত্মার স্বরূপগত স্তরে কর্ম করতে হবে। এই ধরণের কর্মকে বলা হয় ভগবৎ-প্রেমময় সেবা, বা ভক্তি।** ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মধ্যে কর্মবন্ধন ও পুনর্জন্মের চক্র হতে বিমুক্ত হওয়ার বহু প্রক্রিয়া অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ঃ

১. ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের প্রথম নীতি-সূত্র হচ্ছে, ভক্তিযোগীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট সংখ্যক মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র — **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥** — জপ করতে হবে।

২. আত্মার স্বরূপ, কর্মের নিয়ম, জন্মান্তর-প্রক্রিয়া, আত্মজ্ঞান লাভের উপায় এবং পরমপুরুষ ভগবান কৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনের জন্য নিয়মিত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, বিশেষতঃ — **ভগবদ্গীতা যথাযথ** এবং **শ্রীমদ্ভাগবত**।

৩. কেবল নিরামিষ প্রসাদ আহার্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে কেবল তাঁকে নিবেদিত আহার্যই গ্রহণ করা উচিত, না হলে কর্ম-প্রতিক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়তে হবে। ভগবানকে খাদ্যবস্তু নিবেদন করার সরলতম পদ্ধতি হচ্ছে রাধা-কৃষ্ণের ছবির সামনে নিরামিষ খাদ্য দ্রব্য সুন্দরভাবে রাখা ও সরলভাবে প্রার্থনা করা, "প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ! অনুগ্রহ করে এই নিবেদিত আহার্যবস্তু গ্রহণ করুন", এবং এরপর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা। ভগবান খাদ্যের জন্য ক্ষুধার্ত নন, আমাদের প্রীতির জন্য ক্ষুধার্ত; তিনি আমাদের আন্তরিক প্রীতির বশবর্তী হয়ে নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য আহার করেন। এইভাবে এই প্রসাদ, বিশুদ্ধ খাদ্য দ্রব্য — শ্রীকৃষ্ণ যা গ্রহণ করেছেন — তা ভোজনের ফলে ভোজনকারী কর্ম-প্রতিক্রিয়ার বন্ধন হতে মুক্ত হয় এবং তাঁর চিত্তে জড় কলুষ-সঞ্চয় প্রতিহত হয়।

৪. মাংস, ডিম ও মাছ বর্জন করতে হবে। চা, কফি, অ্যালকোহল এবং তামাক-সহ সমস্ত রকম মাদকদ্রব্যও বর্জন করতে হবে। অবৈধ যৌনসংগও বর্জনীয়। বিবাহ-বহির্ভূত বা সন্তানোৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যতীত যৌনকর্ম অবৈধ।

স্মরণ রাখতে হবে যে ভ্রূণহত্যার ফলে এক বিশেষ কর্মফল উৎপন্ন হয় — যারা জন্মের পূর্বেই গর্ভস্থ শিশুদেরকে হত্যা করে, তাদেরকে পরবর্তী জন্মে এমন মায়েদের গর্ভে স্থাপন করা হয়, যাদের গর্ভপাত করানোর প্রবণতা রয়েছে। এইভাবে তারা মাতৃগর্ভে থাকা কালীন অবস্থায় একইরকম ভয়ঙ্করভাবে নিহত হয়। কিন্তু এমন পাপ করে থাকলেও কেউ যদি ভবিষ্যতে আর পাপ কর্ম না করার সংকল্প করে এবং ভক্তিযোগ অবলম্বন করে ভগবানের দিব্য পবিত্র নাম নিরপরাধে কীর্তন করতে থাকে, সে ঐ সব পাপ-প্রতিক্রিয়া হতে মুক্ত হতে পারে।

৫. কৃতকর্মের ফল ভগবানকে সমর্পণ করা উচিত। দেহরক্ষার জন্য প্রত্যেকেই কর্ম করতে বাধ্য হয়, কিন্তু কেবল নিজের পরিতৃপ্তির জন্য যদি কর্ম করা হয়, তাহলে তাকে ভবিষ্যতে জন্ম জন্ম ধরে তার কৃতকর্মের ফলভোগে বাধ্য হতে হয়। **ভগবদ্গীতায় সতর্ক করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তোষ বিধানের জন্যই কেবল কর্ম করা উচিত। এই ধরণের কর্ম হচ্ছে ভক্তিমূলক সেবা-কর্ম, এবং এতে কোনো কর্ম-প্রতিক্রিয়া বা কর্মবন্ধনের সৃষ্টি হয় না। কৃষ্ণভাবনাময় সকল কর্মই যজ্ঞ।** প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই তাঁর শক্তি সময় ও অর্থ পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য ব্যয় করতে হবে। ***"বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত, তা না হলে কর্ম জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে।"*** (ভ.গী. ৩/৯) ভক্তিমূলক সেবা হিসাবে কৃত কর্ম কর্ম-সম্পাদনকারীকে কেবল কর্ম-প্রতিক্রিয়া থেকেই মুক্ত করে না, তা ক্রমশঃ তাকে অপ্রাকৃত প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবার স্তরে তাঁকে উন্নীত করে — যা হচ্ছে ভগবদ্ধামে প্রবেশের মূল শর্ত-স্বরূপ।

নিজের পেশা পরিবর্তন করাটা প্রয়োজনীয় নয়। কেউ যদি লেখক হন, তাহলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য লিখতে পারেন, কেউ চিত্রকর হলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য ছবি আঁকতে পারেন, কেউ রাঁধুনী হলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাঁধতে পারেন। অথবা কেউ যদি এভাবে সরাসরি কৃষ্ণ-কর্মে নিয়োজিত হতে সক্ষম না হন, তাহলে তিনি সারা বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের স্বার্থে উপার্জনের কিছু অংশ দান করার মাধ্যমে নিজ-কৃত কর্মের ফল ভগবানকে সমর্পণ করতে পারেন।

এই সরল পন্থাগুলি অনুসরণের মাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তি কর্ম-ফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। পক্ষান্তরে, কেউ যদি এগুলি অনুসরণ না করে, তাহলে তাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে জড়-জীবনের কর্ম ও তার প্রতিক্রিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়তে হবে। **প্রকৃতির নিয়ম অত্যন্ত কঠোর; দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ মানুষই এ-সম্বন্ধে সচেতন নয়। কিন্তু নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতার অজুহাতে রক্ষা পাওয়া যায় না। গতি-সীমা ভঙ্গ করে দ্রুত গতিতে গাড়ী চালানোর জন্য কেউ গ্রেপ্তার হওয়ার পর যদি সে বিচারকের কাছে এই অজুহাত দেখায় যে সে অনুমোদিত সর্বোচ্চ গতি-সীমার কথা জানত না, বিচারকের কাছে তার ঐ অজুহাত আদপেই গ্রাহ্য হবে না বা তার শাস্তিও লাঘব হবে না। কোনো ব্যক্তি যদি স্বাস্থ্য রক্ষার বিধি-নিয়ম না জানে, তাহলে প্রকৃতি তার অজ্ঞতার জন্য তাঁকে রোগাক্রান্ত হওয়া থেকে রেহাই দেবে না** (অজ্ঞতা — না-জানাও এক ধরণের অপরাধ বা পাপ, নিজকৃত দোষ। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয় — অর্থাৎ মনুষ্যেতর জন্ম লাভ করে ঃ *অজ্ঞশ্চ অশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি* — ভ.গী. ৪/৪০)। সেজন্য জন্ম-মৃত্যুর অন্তহীন, যন্ত্রণাপ্রদ আবর্তন-চক্র হতে বিমুক্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কর্ম ও পুনর্জন্মের নিয়মটি বুঝতে হবে। তা না হলে আমাদের বার বার এই জড় জগতে নানা রকমের দেহে ফিরে আসতে হবে, **আর আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে সেই দেহ সবসময় মানব দেহ নাও হতে পারে।**

গীতা এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে নীতি নির্দেশিকা বা ইন্‌স্ট্রাকশান ম্যানুয়ালস্, যা আমাদের জীবনের গতিপথের প্রকৃত লক্ষ্য শিক্ষা দেয়। পুনর্জন্ম-বিজ্ঞান অবগত হওয়ার মাধ্যমে আমরা কর্মবন্ধন হতে বিমুক্ত হতে পারি এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি, যা সনাতন, জ্ঞানময় এবং দিব্যানন্দময়।

গীতা প্রতিযোগিতা ঃ চার

এর জন্য

কিছু প্রাসঙ্গিক শ্লোক

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ গ্রন্থ থেকে
নীচের শ্লোক সমূহ, অনুবাদ ও তাৎপর্য সহ ঃ

- ২/২২, ২/২৭, ২/৪৫, ৩/৫, ৩/২৭, ৪/১৬, ৪/১৭, ৬/৩৮-৪৭
- ৮/৫-৯, ৮/১৪-২০, ৯/২৯, ১৪/১৮, ১৪/২১-২৬, ১৫/৬

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

পর্ব ৫ ঃ বিভিন্ন যোগপন্থা ঃ সর্বোত্তম কোনটি



পর্ব ৫ ঃ বিভিন্ন যোগপন্থা — সর্বোত্তম কোনটি

যোগ বলতে কি বোঝায়?

ভগবদ্গীতায় প্রদত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার সার-নির্যাস হচ্ছে এই যে, আমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই যোগী হতে হবে — অর্থাৎ জীবন হবে যোগাভ্যাস-কেন্দ্রিক। যোগ কি? 'যোগ' হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ 'মিলন' বা সংযুক্তি, এবং এর নিহিতার্থ হচ্ছে ব্যক্তি চেতনা ও পরম চেতনা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার — অর্থাৎ আত্মা ও ভগবানের প্রেমান্বিত সংযোগসাধন।

ভগবদ্গীতায় আমরা চার ধরণের মৌলিক যোগ-পন্থার বর্ণনা দেখতে পাই। **কর্মযোগ** বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার দ্বারা কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থ-বাসনাশূন্য হয়ে ভগবানের জন্য কর্ম করে। **জ্ঞানযোগ** হচ্ছে দার্শনিক জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে চিন্ময়-চেতনা লাভের স্তরে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া। অষ্টাঙ্গ-যোগ বা **ধ্যানযোগ** হচ্ছে মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রবেগ সংযত করা এবং পরমাত্মা ভগবানের প্রতি মনোসন্নিবেশের এক যান্ত্রিক ধ্যান-পন্থা। এই সমস্ত যোগ-পন্থা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে **ভক্তিযোগ**-এ, যা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, প্রত্যক্ষ, দিব্যানন্দময় ভগবৎ-প্রেম, কৃষ্ণপ্রেমের পন্থা। এই যোগ-পন্থা সকল যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তা ঘোষণা করেন, **"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদগত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনি সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ"** (ভ. গী. - ৬/৪৭)।

কারও কার্যকলাপ যদি ভগবানের সংগে তার সম্বন্ধ প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্য পরিচালিত না হয়, তাহলে তাকে যোগী বলা যেতে পারে না। বিভিন্ন শ্রেণীর জড়বিষয়াসক্ত মানুষ বা 'কর্মী' রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরণের যোগী রয়েছে, নীচে আলোচনা করা হচ্ছে।

কঠোর পরিশ্রমকারী জড়বিষয়ী কর্মী

বদ্ধ জীব তার জড় দেহ ও মনের দ্বারা জড়বিষয় ভোগ বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আসক্ত থাকে। এই ধরণের স্থূল জড়বাদী বা বস্তুবাদীদের পক্ষে এটা বিশ্বাস করা অত্যন্ত অসম্ভব হয়ে থাকে যে দৃশ্যমান জড় জগতের অতীত একটি চিন্ময় জগৎ রয়েছে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জড়দেহের সংগে এক করে দেখা — অর্থাৎ দেহাত্ম-বুদ্ধিতে আবিষ্ট এই জড় বিষয়াসক্ত বস্তুবাদীরা আসলে পশুদের মতো; কেবল আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষা ও মৈথুনেই এদের সমগ্র চেতনা কেন্দ্রীভূত, সমগ্র কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ। এরা এই চার ধরণের পাশবিক প্রবণতার দ্বারা এতটাই বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে যে তারা পাপকর্ম ও পুণ্যকর্মের পার্থক্য-বোধও হারিয়ে ফেলে। তারা তুচ্ছ একটু ইন্দ্রিয়সুখের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলে, এবং পরিণতিতে তাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। যারা তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করার জন্য অত্যন্ত উদ্গ্রীব, তারা কর্ম করতে গিয়ে বহু ধরণের কষ্ট স্বীকার করে, তাদের কল্পনার স্রোত ক্ষেপা ঘোড়ার মতো যত্র-তত্র ধাবিত থাকে, এবং এইভাবে আচ্ছন্ন অবস্থায় একটি গর্দভের মতোই অজস্র দায়িত্বভার ও কর্মভার বহন করলেও সর্বদাই নিজেদেরকে প্রকৃত ভোক্তা ও মালিক মনে করে আত্মশ্লাঘায় আবিষ্ট, পরিতৃপ্ত থাকে।

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা এমন সব উৎপাদিত দ্রব্য মানুষের কাছে সুলভ করেছেন, যা ইন্দ্রিয়গুলিকে উত্তেজিত

করে। এর ফল-স্বরূপ জড়বিষয়াসক্ত মানুষের মধ্যে এক মারাত্মক প্রতিযোগিতার মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে, যার পরিণাম-স্বরূপ মানব সমাজের পরিবেশ হয়ে উঠেছে অত্যন্ত কলুষিত, কদর্য। মানুষ মনে করে যে ইন্দ্রিয়ভোগময় কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা অধিকতর স্বাধীনতার আস্বাদ পাবে, জীবন হবে মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, কিন্তু বাস্তবে বিপরীতটাই ঘটে — তারা আরো বেশি করে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে পড়ে, জীবন হয়ে ওঠে অনেক জটিল, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাপূর্ণ। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে, সমাজের সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে ঘটছে এর অনুপ্রবেশ, যার ফলে মানব সভ্যতা আরো বেশি বেশি করে জটিল কর্ম-চক্রে বিজড়িত হয়ে পড়ছে। বিশাল বিশাল শিল্প কারখানা, কেবল জড়েন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক শিক্ষার জন্য অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, স্কুল, জড় জাগতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য বিপুল, জটিল সব আয়োজন, ব্যাপক গণহত্যার জন্য ভয়ংকর মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি সমাজকে আরো বেশি বেশি করে কর্ম-চক্রে আবদ্ধ করছে। এইসব আয়োজন মানুষকে সম্পূর্ণভাবে ভগবদ্-বিস্মৃত করে তোলে, তারা ভগবৎ-চিন্তা ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে কেবল-আমৃত্যু এক অলীক মোহময় আবহে জীবন অতিবাহিত করে।

শাস্ত্রবিধি অনুসরণকারী সকাম কর্মী

স্থূল জড়বাদী শ্রেণীর মানুষের থেকে যারা আত্মার দেহান্তরে বিশ্বাস করে তারা এক ধাপ উন্নত। এদের বলা হয় সকাম কর্মী, যারা দান করা সমাজ-সেবা করা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম করে থাকে। তাই এইসব পুণ্যকর্মকারীদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পরবর্তী জীবনে ধনৈশ্বর্য ও ভোগবিলাসের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কেউই উপলব্ধি করতে পারে না যে পুণ্যজনক ও পাপময় — উভয় কর্মই বন্ধন সৃষ্টি করে।

পরমেশ্বর ভগবানের সংগে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন যেকোন চিন্তা, কথা ও কর্ম — তা ভাল বা মন্দ যাইহোক — একটি পাপকর্ম। 'পাপ' —এর অর্থ হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছার অমান্যতা বা বিরুদ্ধতা। সুতরাং স্বর্গে উচ্চতর ভোগবিলাস প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কেউ যদি শাস্ত্রীয় বিধিবিধান মান্য করে চলে, তিনি নিশ্চয়ই একজন জড়বিষয়াসক্ত নাস্তিকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, কিন্তু প্রকৃত ধর্মাচরণের মান হতে তিনি নিম্নস্তরে অবস্থান করছেন। যারা এইরকম জড়জাগতিক উপকার লাভের জন্য, ভৌগেশ্বর্য স্বর্গসুখ লাভের জন্য সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করতে চায়, বেদে তাদের জন্য অনেক যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির বিধিনিয়ম দেওয়া হয়েছে, যাতে করে তারা নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুযোগ পায় এবং ধীরে ধীরে অনাসক্তি অর্জন করতে পারে। **সুতরাং যারা শাস্ত্র অনুসরণ করে ইন্দ্রিয় ভোগসুখের জন্য কর্ম করে, অর্থাৎ বেদের কর্মকান্ড অনুসরণ করে, তাদের বলা হয় সকাম কর্মী।**

কর্মকান্ড ঃ নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়সম্ভোগ

জড়দেহের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রয়াস পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরম উপদেশ — ***সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* — *"সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও"*** প্রত্যেকের দ্বারা গৃহীত হবে না। অবশ্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষ, স্বর্গসুখ, পরবর্তীজন্মে ভৌগেশ্বর্য প্রাপ্তি —এইসব অলীকতাময় জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিপূর্ণ দুঃখপ্রদ আবর্তন-চক্রে আবদ্ধকারী প্রয়াস বর্জন করে প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে পারে না। সবসময়ই এমন কিছু মানুষ থাকবে যারা নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় সম্ভোগ করতে চায়, আবার একই সাথে শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করতে চায়। সুতরাং বেদশাস্ত্র তাদেরকে নির্দেশ দেয় ঃ *"যদি তুমি ধন-সম্পদ চাও, তাহলে বিশেষ একজন দেবতার বা দেবীর আরাধনা করো, অথবা দান কর — তাহলে সে দান বহুগুণে তোমার কাছে ফিরে আসবে।"*

এইভাবে এইসব ভোগাসক্ত মানুষদের অবৈধ উপায়ে ধনসম্পদ সঞ্চয় ও তার ফলে যমরাজের প্রবল বিরাগভাজন হওয়ার পরিবর্তে বেদের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের নির্দেশ দেন, *"শাস্ত্রবিধি অনুসরণ কর, তাহলে নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির*

সুযোগ লাভ করতে পারবে।" এইভাবে শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করতে করতে এইসব মানুষ ক্রমশঃ সংযত হয় এবং ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয় সুখ-সম্ভোগে অনাসক্তি অর্জন করে।

এটি সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে কর্মকাণ্ড হচ্ছে ক্রমোন্নতি লাভের একটি পন্থা, অর্থাৎ উপায়, উদ্দেশ্য নয়। সাধারণ মানুষ খুব বুদ্ধিমান নয়, সেজন্য তাদের অজ্ঞতাবশতঃ তারা বেদের **'কর্মকাণ্ড'** অংশে নির্দেশিত সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তারা স্বর্গে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-দায়ক ভোগবিলাসময় জীবন উপভোগের চেয়ে বেশি আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না। বেদে স্বর্গীয় গ্রহলোক-সমূহে উন্নীত হওয়ার জন্য বহুরকম যাগযজ্ঞের বিধান দেওয়া হয়েছে, বিশেষতঃ 'জ্যোতিষ্টোম' যজ্ঞ। স্বর্গীয় আনন্দ লাভে ব্যাকুল এইসব স্বল্পজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষেরা মনে করে যে স্বর্গলাভই সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রের সারাৎসার। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে 'নিস্ত্রৈগুণ্য' হওয়া, জড় প্রকৃতির গুণগুলি হতে বিমুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত বা চিন্ময় স্থিতি লাভ করা।

জড়বন্ধন হতে মুক্তি

কর্মীরা জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন-চক্র সম্বন্ধে অজ্ঞ। তারা গর্দভের মতো কঠোর পরিশ্রম করে চলে এবং বিভিন্ন ধরণের প্রজাতি-দেহে নিক্ষিপ্ত হয়। তারা জানে না যে এমনকি স্বর্গ লোকে উন্নীত হলেও সঞ্চিত পুণ্য কর্মের ফলভোগ শেষ হয়ে গেলে আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে কারোরই অব্যাহতি নেই — ইন্দ্র-বরুণ-আদি দেবতাদের ও নয়। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেন (ভ.গী. ৮/১৬),

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

"হে অর্জুন, এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।"

এইভাবে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই মৃত্যু-অধ্যুষিত জড়জগতে জীবন একটু উন্নত করার জন্য কর্ম করেন না, কেননা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই জড় জগতকে দুঃখময় স্থান হিসাবে পরিকল্পনা করেছেন (*দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্*) বুদ্ধিমান ব্যক্তি বরং চেষ্টা করেন জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে মুক্ত হতে, এই দুঃখময় স্থান হতে নিষ্ক্রান্ত হতে।

জীবনের প্রকৃত সমস্যা

সমস্ত রকম বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের দুঃখ হ্রাস করা এবং স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা। ঘর্মাক্ত হওয়া থেকে অব্যহতি পেতে ফ্যান ব্যবহার করা হয়। সাইকেলে প্যাডাল করার কষ্ট এড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয় মোটর সাইকেল। এগুলি সরলতম দৃষ্টান্ত। একইভাবে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইত্যাদির বিকাশের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের দুঃখ-কষ্টের ভার লাঘব করা, সম্ভব হলে মানুষের জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে দুঃখ-কষ্ট বিলুপ্ত করা।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তির এই অগ্রগতি মানুষের সমস্যার কিছু তাৎক্ষণিক, অস্থায়ী সমাধান করে, সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারে না। আপনি দেখবেন সে ঐ সমস্যা কোন না কোন ভাবে আবার উদিত হয়েছে।

একবার একজনের শরীরে একটি ফোঁড়া হয়েছিল। একজন ডাক্তার তাঁকে একটি মলম দিলেন ওই ফোঁড়ায় লাগানোর জন্য। ঐ রোগী তাই করল এবং আরোগ্য লাভ করল। কিন্তু কিছুদিন পরে শরীরের অন্য স্থানে একই ধরণের ফোঁড়া দেখা দিল। সে আবার ঐ ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার তাঁকে বললেন যে যখনই ফোঁড়া দেখা দেবে তখনই ঐ একই মলম সেখানে লাগাতে। তখন সেই বেচারী লোকটি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক আছে, লাগাব। কিন্তু যখন ফোঁড়া হয়, তখন তা প্রায় এক

সপ্তাহ থাকে আর প্রবল যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। এই সমস্যা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার কি কোনো উপায় নেই?" ডাক্তার নিরুত্তর। সে তখন অন্য ডাক্তারের কাছে গেল। ঐ চিকিৎসক এই সমস্যার মূল কারণটি বুঝতে পারলেন — রক্ত দূষণ। তিনি রোগীর রক্তের চিকিৎসা করলেন; রক্ত শুদ্ধ হল এবং রোগী স্থায়ী ভাবে সুস্থ হলো।

উপরের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি? স্বরূপতঃ আমরা চিন্ময় আত্মা, কিন্তু এখন এই জড়জগতে এসে আমরা অস্থায়ী জড় দেহের সংগে নিজেদেরকে এক করে ফেলছি। নিজেদেরকে ক্ষণভঙ্গুর দেহের সংগে গুলিয়ে ফেলছি। এইভাবে স্বরূপ বা আত্ম-পরিচয় গুলিয়ে ফেলার ফলে অজস্র সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, এবং বিজ্ঞান সেগুলির বাহ্যিক সমাধান সন্ধান করছে। কিন্তু সমস্যা বার বার পুনরাবৃত্ত হচ্ছে, ঠিক যেমন ঐরোগীটির শরীরে বার বার ফোঁড়ার উদ্গম হচ্ছিল। **মানুষ জানে না যে সমস্ত সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে — নিজেকে জড়ের সংগে একীকরণ।** **শ্রীমদ্ভাগবতে** সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যের ঋষিদের উপদেশ দেন ঃ

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতং চাভিপদ্যতে॥

"এই বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে জড়া প্রকৃতি-সম্ভূত বলে মনে করে এবং তার ফলে জড় জগতের দুঃখ ভোগ করে।"

জীবাত্মা দেহটিকে নিজের স্বরূপ মনে করে জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধির আবর্তন চক্র সহ্য করতে বাধ্য হয়। সেইজন্য আমাদের বর্তমান জীবনে প্রধান সমস্যাগুলি হচ্ছে ঃ **জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি।** বিজ্ঞান এই প্রকৃত সমস্যাগুলিকে সনাক্ত করতে পারে নি।

<u>জন্ম</u> ঃ জন্মের সময়টা জীবাত্মার জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। মাসের মাসের পর মানব ভ্রূণকে মাতৃগর্ভে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ছোট্ট থলির মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে থাকতে হয়। এ সময়ে উদরের অম্ল-বাসু কটু-পাচক রসের সংগে পাতলা জরায়ু-গাত্রের সংস্পর্শে গর্ভস্থ শিশুকে মাঝে মাঝে তীব্র প্রদাহ সহ্য করতে হয়। এছাড়া উদরের ৩২ ফুট লম্বা পৌষ্টিক নালী, পাকস্থলী ও নানা অঙ্গের মধ্যে সংকুচিত হয়ে থাকা শিশুকে অবিরাম তীব্র চাপ সহ্য করতে হয়। এইরকম চাপে শিশুর দেহটি ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যায়। এছাড়া জরায়ু গাত্রে বা উদরে ক্ষুধার্ত কৃমিকীটের উপদ্রবের ফলেও শিশুর গাত্র-চর্মে চুলকানি, প্রদাহ হয়, তাকে কষ্ট পেতে হয়। শিশু ঐ থলিতে মল-মূত্র পরিত্যাগ করে ও সেখানেই মাসের পর মাস তাকে থাকতে হয় — মাথা নীচের দিকে ও পা উপরের দিকে করে।

<u>জরা</u> (বার্ধক্য) ঃ বৃদ্ধ বয়সে দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে না। এজন্য কেউই চায় না বৃদ্ধ হতে। কিন্তু কালের অনিবার্য গতিতে প্রত্যেকেই বৃদ্ধ হতে বাধ্য হয়। কেউই বৃদ্ধের যত্ন নিতে ভালবাসে না। আত্মীয়-স্বজনেরা কেবলই ভাবতে থাকে, পরিবারের বৃদ্ধ ব্যক্তিটি কখন বিদায় নেবে। এটি এক কঠোর বাস্তবতা। পরিবারে বৃদ্ধ ব্যক্তি এক অবাঞ্ছনীয় বোঝা স্বরূপ। সেজন্য আজকাল অনেকে বাড়ীর বৃদ্ধদের বৃদ্ধাবাসে রেখে আসতেও পিছপা হয় না — এজন্য প্রত্যেক শহরে গড়ে উঠেছে বৃদ্ধাবাস। বৃদ্ধেরা ভালবাসা পায় না — সেজন্য প্রায়ই তারা কুকুর-বিড়ালকে ভালবাসতে থাকে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যে। এছাড়া তাদের চোখের সামনেই তাদের বন্ধু-বান্ধব পরিচিতদের মৃত্যু ঘটতে থাকে, সেজন্য বৃদ্ধেরা মানসিকভাবে বিষণ্ণ, কাতর হয়ে পড়ে। মানসিক সমস্যা ছাড়াও দেহও তাদের সংগে আদৌ সহযোগিতা করে না। সুন্দরতম শরীরটিও শ্রী-হীন কুশ্রী হয়ে উঠতে থাকে এবং নিত্য নুতন যন্ত্রণার সৃষ্টি করতে থাকে।

<u>ব্যাধি</u> ঃ আজ মানুষ গর্ব করে যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভুত উন্নতির ফলে মানুষের গড় আয়ু অনেক বেড়ে গেছে। একবার একটি হোর্ডিংয়ে লেখা হয়েছিল *"উই মে লিভ লংগার বাট নই হ্যাপিয়ার"* (আমরা বেশি দিন বাঁচতে পারি, কিন্তু বেশি সুখে নয়)। আমরা জীবনকে দীর্ঘায়িত করতে পারি, কিন্তু তার দ্বারা আমরা দেহজ যন্ত্রণা-ভোগকেও

দীর্ঘায়িত করে থাকি। হাজার হাজার রকমের ব্যধি রয়েছে; চিকিৎসা বিজ্ঞানের বহু মিরাক্‌ল সত্ত্বেও ব্যাধি মানুষের নিত্য সঙ্গী। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের 'স্বাভাবিক' মৃত্যুর সার্টিফিকেটে লেখা থাকে কোনো-না-কোনো ব্যাধির নাম। বহু মানুষের জন্মই হয় ব্যাধি নিয়ে। শৈশব থেকে জীবনের যেকোনো সময় ব্যাধিতে ভুগতে হয় মানুষকে — ক্যান্সার, হৃদরোগ, সুগার, রক্তচাপ, এইড্‌স — কত কি। আমরা কিছু সময়ের জন্য একটি রোগ আরোগ্য করতে পারি, কিন্তু সম্পূর্ণতঃ রোগী হওয়াকে বন্ধ করতে পারি না।

মৃত্যু ঃ মৃত্যুর অভিজ্ঞতা কেমন? গরুড় পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ এমন যন্ত্রণা অনুভব করে যা ৪০,০০০ কাঁকড়া বিছের দংশনের যন্ত্রণার সমান। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৩০/১৬-১৮) কপিল মুনি তাঁর মাতৃদেবীকে মৃত্যুর অভিজ্ঞতার প্রকৃত রূপ জানিয়েছেন ঃ

"সেই রুগ্ন অবস্থায়, ভিতরের বায়ুর চাপে তার চক্ষু ঠিকরে বেরিয়ে আসে, এবং কফের দ্বারা তার শ্বাসনালী রুদ্ধ হয়ে যায়। তার নিঃশ্বাস নিতে তখন খুব কষ্ট হয় এবং তার গলা দিয়ে 'ঘড়-ঘড়' শব্দ বের হয়। এইভাবে সে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করে। তার আত্মীয় বন্ধুরা তাকে ঘিরে তখন শোক করতে থাকে, এবং যদিও সে তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তবুও কাল পাশের বশবর্তী হয়ে সে আর তাদের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। এইভাবে অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কুটুম্বভরণে ব্যাপৃত ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজনদের এইভাবে ক্রন্দন করতে দেখে গভীর দুঃখে তার প্রাণ ত্যাগ করে। সে অসহ্য বেদনায় অচেতন হয়ে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।"

দেহের মধ্যে জীবাত্মা বাস করতে করতে এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, দেহটি জরাজীর্ণ হয়ে গেলেও সে ঐ দেহটি পরিত্যাগ করতে চায় না — ঠিক যেমন কোনো মানুষই তার গৃহ থেকে বিতাড়িত হতে চায় না। এমনকি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবেরাও মৃত্যুকে এড়ানোর জন্য বিস্ময়কর কলা-কৌশল প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু মৃত্যু প্রত্যেক জড়দেহধারী জীবের জন্য অনিবার্য, এবং একই রকম অনিবার্য মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রণা, বেদনা, এবং ভীতি।

সুতরাং জন্ম-মৃত্যু-জরা ও ব্যাধির কষ্টগুলি সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। জড়জীবন যে চরমভাবে দুর্দশাজনক, সে সম্বন্ধে যদি কেউ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত না হয়, তাহলে সে পারমার্থিক জীবন গ্রহণ করতে পারে না। জড়জীবন যন্ত্রণাময় — এটি কঠোর বাস্তবতা, আর জড়বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কোনই সাহায্যে করতে পারে না।*

জড়া প্রকৃতির তিন রকম দুঃখ (ত্রিতাপ) ঃ

ভারতের আইন-মান্যকারী সভ্য নাগরিকদেরকে সুখে এ দেশে বাস করতে দেওয়া হয়, কিন্তু যারা অপরাধী, আইন ভঙ্গকারী, তাদেরকে জেলে ভরে রাখা হয়। অবশ্য, আইনমান্যকারী নাগরিক এবং বিদ্রোহী অপরাধী উভয়েই ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকার উভয়ের জন্যই প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা প্রদান করে থাকেন। অপরাধীদের জেলে রাখা হলেও সরকার তাদের খাদ্য, পোশাক, আশ্রয় এবং এমনকি চিকিৎসাও দিয়ে থাকে, তবে সবই শাস্তির অধীনে। ঠিক তেমনি, অনন্ত জীব রয়েছে যারা চিন্ময় জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমানুরক্ত, তাঁর সেবায় নিয়োজিত। কেবল যারা বিদ্রোহী, অপরাধী, তাদেরকে এই জড় জগতে পাঠানো হয়। অবশ্য, শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণাময় এবং সকল জীবের সর্বশক্তিমান পিতা, সেজন্য তিনি আমাদের খাদ্য, জল, আলো, বাতাস প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করেন। কিন্তু এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি সরবরাহ করা হয় জড়া প্রকৃতির ত্রিবিধ দুঃখের অধীনে।

---

* অনেকে প্রশ্ন করেন — "ভক্তেরও তো মৃত্যু হয়!" উত্তর হচ্ছে ভক্ত না হবার ফলে জড় দেহে জন্মগ্রহণ করতে হয়। ভক্ত হলে, জড় দেহ ত্যাগের পর ভক্ত ভগবদ্ধামে গমন করেন (*মদ্ভক্তা যান্তি মামপি*); জড় দেহটি ত্যাগের পর তাঁর আর জড় জগতে পুনর্জন্ম হয় না (*ত্যক্তাদেহং পুনর্জন্ম নৈতি*)। পক্ষান্তরে অভক্ত অন্য সকলকে কোটি কোটি জন্ম — অন্তহীন কাল ধরে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

জড়াপ্রকৃতির ত্রিবিধ দুঃখ এবং জীবের অবস্থা প্রসংগে সনাতন গোস্বামীর সংগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি আলোচনা হয়। সনাতন গোস্বামী ছিলেন তৎকালীন বাদশাহ হুসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী। তিনি ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের উপর প্রবচন দিতেন। তিনি শুধু সংস্কৃত নয়, উর্দু, আরবি এবং পার্শী ভাষাতেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি মন্ত্রীত্ব ও সংসার পরিত্যাগ করে যখন প্রয়াগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংগে সাক্ষাৎ করেন, তখন তাঁর পতিত অবস্থার নিদর্শন-স্বরূপ দন্তে তৃণ ধারণ করে অত্যন্ত দৈন্যভাবে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিপতিত হন।

"সাধারণ মানুষ আমাকে অত্যন্ত বিজ্ঞ পণ্ডিত মনে করে," সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুকে বলেন, "আর আমি এমনই মুর্খ যে আমি তাদের কথা বিশ্বাস করি।" শ্রীচৈতন্যদেব বললেন, "কেন তুমি ভাববে না যে তুমি শিক্ষিত, সংস্কৃত ও পার্শী ভাষায় একজন মহাপণ্ডিত?" "তা হতে পারে," সনাতন গোস্বামী বললেন, "কিন্তু আমি জানি না আমি কে। আমি জানি না আমি কোথা থেকে এসেছি, এবং এটিও আমি জানি না — আমি কোথায় চলেছি, অথচ মানুষ আমাকে বিজ্ঞ পণ্ডিত বলে। যখন তারা আমাকে মহাপণ্ডিত বলে, আমি বেশ খুশি হই, কিন্তু সত্যিটা হচ্ছে, আমি এমনই মহামুর্খ যে আমি জানি না কে আমি এবং কেনই বা আমি প্রকৃতির ত্রিবিধ দুঃখ-তাপে জর্জরিত হচ্ছি!"

প্রকৃতপক্ষে সনাতন গোস্বামী আমাদের সকলের জন্য এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, কেননা এটাই, এই অজ্ঞতাই হচ্ছে আমাদের বর্তমান অবস্থা। আমরা আমাদের কলেজের শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে গর্বিত হতে পারি, কিন্তু আমাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয় আমরা কে, কেন আমরা দুঃখভোগ করছি, তখন আমরা আর উত্তর দিতে পারি না। সনাতন গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরমেশ্বর ভগবান, জীব ও ত্রিবিধ ভৌতিক দুঃখভোগের কারণ বর্ণনা করেন।

ত্রিবিধ দুঃখ হচ্ছে ঃ ১. আধ্যাত্মিক, ২. আধিভৌতিক এবং ৩. আধিদৈবিক।

<u>১. আধ্যাত্মিক</u> ঃ জড় শরীর ও মন থেকে উৎপন্ন দুঃখ। কখনো জীবসত্তা রোগ, জরা, মৃত্যু ইত্যাদির জন্য দৈহিকভাবে কষ্ট পায়, কখনো বা মানাসিক ক্লেশে তাকে কাতর হতে হয়। এমনকি মাতৃগর্ভে থাকার সময়েও আমাদের এই ক্লেশগুলি অনুভব করতে হয়।

<u>২. আধিভৌতিক</u> ঃ অন্যান্য জীবদের থেকে প্রাপ্ত দুঃখ — যেমন জীবাণুর আক্রমণ, সর্পদংশন, মানুষের শত্রুতা, ইত্যাদি। সামান্য মশা-মাছিও আমাদের প্রাণসংশয় করে ফেলে। বহু জীব থেকেই নানারকম দুঃখে ভুগতে হয় আমাদের।

<u>৩. আধিদৈবিক</u> ঃ দৈবদুর্বিপাক-জনিত দুঃখ, যা উচ্চতর গ্রহলোকের দেবতাদের দ্বারা উৎপন্ন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কখনো তীব্র শীতে আমরা কষ্ট পাই, কখনো প্রবল গ্রীষ্মের দাবদাহে আমরা জর্জ্জরিত হই। কখনো খরা, অনাবৃষ্টি, কখনো বা প্রবল প্লাবনে মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়। ভূমিকম্প, টর্নেডো, সাইক্লোন — প্রভৃতি প্রবল ঝড়, বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সুনামি — ইত্যাদি জনজীবনকে প্রায়ই স্তব্ধ করে দেয়। যেভাবেই হোক না কেন, প্রতিটি মানুষ, এইজগতের প্রতিটি জীব ত্রিবিধ দুঃখে জর্জরিত হচ্ছে। এই জড় জগতকে বলা হয় 'দুর্গ', — এখান থেকে কেউই পালিয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া — এই কারাগারটি এমন সুন্দর ভাবে নির্মিত যে কেউই এই কারাগার থেকে পালাতে চায় না। প্রত্যেকেই এখানে মরীচিকাময় সুখের পিছনে ছুটছে। এই জড়জগৎ-রূপ দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী মহামায়া দুর্গাদেবীর ত্রিশূল ত্রিবিধ দুঃখের প্রতীক। **সুতরাং দুর্গাদেবী তাঁর তিন রকম দুঃখ-রূপী ত্রিশূলটি দিয়ে নিরন্তর সমস্ত বদ্ধ জীবের হৃদয় বিদ্ধ করছেন — তাদেরকে এইটি স্মরণ করাতে যে তারা বর্তমানে যেখানে বাস করছে সেটি একটি কৃত্রিম স্থান, সেটা তাদের আসল, আদি আবাসস্থান নয়। এই দুঃখগুলি আমাদেরকে পারমার্থিক জীবনকে খুব গুরুত্বের সংগে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে।**

মায়াদেবী বা দুর্গাদেবী শ্রীকৃষ্ণের একজন শুদ্ধভক্ত, তাঁর সেবাকর্ম হচ্ছে জীবদেরকে পরীক্ষা করা ও কেবল শুদ্ধ ভক্তদেরকে চিন্ময় জগতে ফিরিয়ে দেওয়া। অবশ্য মায়াদেবী ভগবানের আদেশ ছাড়া নিজে কাউকে মুক্তি দান করতে

সমর্থা নন; তিনি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি, তাঁর দাসী, তিনি কেবল ভগবানের আদেশ অনুসারে কর্ম করেন।

সদ্‌গুরু এবং মায়াদেবী উভয়েই একই লক্ষ্যে কর্ম করছেন — বদ্ধ জীবাত্মাদের উদ্ধার করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে সাহায্য করা। পার্থক্য হচ্ছে এই যে সদ্‌গুরু আপনাকে কৃষ্ণভক্তিতে অগ্রগতি সাধনের জন্য জ্ঞান ও উপদেশ প্রদান করে থাকেন, আর মায়াদেবী চপেটাঘাত বা পদাঘাত করেন (ত্রিতাপ) — এইটি স্মরণ করাতে যে আপনি যা করছেন তা ঠিক নয়।

তাঁরাই হচ্ছেন যোগী, যাঁরা এই জড়জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করেন, এবং মায়া-বিরচিত জগতের প্রতি আকৃষ্ট, মোহিত না থেকে পরমপুরুষ ভগবানের শরণাগত হন এবং জড়বন্ধন হতে বিমুক্ত হয়ে শাশ্বত জগতে ফিরে গিয়ে অন্তহীন, শাশ্বত জীবন লাভ করার জন্য প্রয়াসী হন।

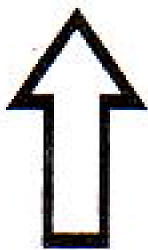
বিভিন্ন ধরণের যোগ

সমস্ত মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ **(১) আইন বা বিধি মান্যকারী (২) বিধি লঙ্ঘনকারী।** যারা নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যা-খুশি তাই করে চলে, কোনো বিধি-নিয়ম পালনের তোয়াক্কা করে না, তারা প্রায় পশুর মতো, সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত। ঐ রকম মানুষ সংস্কৃতিবান বা সংস্কৃতিহীন, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, দুর্বল বা সবল — যেমনই হোক না কেন, তার কার্যকলাপ পশুসুলভ। ঐ সব কাজ কারোরই মঙ্গল করতে পারে না। এদের বলা হয় **বিধি লঙ্ঘনকারী।**

বিধি মান্যকারী মানুষদেরকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় — কর্মী, জ্ঞানী বা জ্ঞানান্বেষী এবং ভক্ত। কর্মীদের আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় ঃ সকাম কর্মী — যারা তাদের নিজকৃত কর্মের ফলভোগ করতে চায় এবং নিষ্কাম কর্মী, যারা তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগের বাসনা করে না। সকাম কর্মীরা তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী সুখভোগের প্রতি আসক্ত। তারা এই জগতে বিধিনিয়ম অনুসারে কর্ম করে ও স্বর্গসুখ লাভ করে। কিন্তু এই সব জড় সুখ ক্ষণস্থায়ী।

<u>ক্রমোন্নতিমূলক যোগ-সিঁড়ি</u>

সকাম কর্মীদের যোগী বলে গণ্য করা হয় না, কেননা তারা কেবল জাগতিক সুখ ভোগে আসক্ত ও পারমার্থিক চেতনাহীন। চার ধরণের যোগী রয়েছে, কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, অষ্টাঙ্গযোগী এবং ভক্তিযোগী। আসলে এগুলি সবই অভিন্ন, যদিও বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। যোগের অর্থ হচ্ছে ভগবানের সংগে যুক্ত হওয়া। যোগ-পন্থা একটি সিঁড়ির মতো, যাতে ক্রমশঃ আরোহণ করতে করতে পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান-রূপ পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। এই সিঁড়ির প্রথম ধাপটি হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম, কর্মের ফল ত্যাগ। যখন জ্ঞান ও তপস্যা এর সংগে যুক্ত হয়, তখন এটি হয় জ্ঞান যোগ, সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপ। যখন জ্ঞানযোগের সংগে পরমপুরুষের ধ্যান যুক্ত হয়, তখন সেটি অষ্টাঙ্গ যোগ। পরিশেষে, এর সংগে প্রেমময় ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবা যুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। এই হচ্ছে যোগাভ্যাসের সর্বোচ্চ ধাপ। সমগ্র ক্রমপর্যায়টিকে যোগ বলা হয়।



- ভক্তিযোগ — ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবা
- অষ্টাঙ্গযোগ — হৃদয়ে পরমাত্মার ধ্যান
- জ্ঞানযোগ — জড় ও চিন্ময়ের পার্থক্য জ্ঞান ও তপস্যা
- কর্মযোগ — কর্মের ফল ত্যাগ

মানুষের জন্য যা সর্বোত্তম, সেটিই যারা আকাঙ্ক্ষা করেন, তারা যোগ পন্থা অবলম্বন করেন। **যোগে উন্নতি** লাভের জন্য প্রথমতঃ প্রয়োজন দৃঢ়সংকল্প এবং প্রতিটি স্তরে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করে চলা। **অনেকে আছেন, যারা যোগক্রমের কোন একটি নিম্ন স্তরে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। তারা সহজে উচ্চতম স্তরে যেতে পারেন না।** যোগ-ক্রম অনুযায়ী যোগী চার ধরণের ঃ কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগী। **ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যিনি তাঁর (পরমেশ্বর ভগবান) প্রতি প্রেমপূর্ণ ভক্তিযুক্ত সেবা সম্পাদন করেন, তিনিই সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং অর্জুনের উচিত ওইরকম ভক্তিযোগী হওয়ার জন্য চেষ্টা করা।** (ভ.গী. ৬/৪৭)

কর্মযোগ

আপনি যদি ফলকামনাযুক্ত কর্ম করেন ... ...

সামাজিক নিয়মকানুন অথবা বৈদিক বিধিনিয়ম অনুসারে কোনো ব্যক্তি এই জগতে যে ফলকামনা-যুক্ত কর্ম করে, সেই কর্ম ফল উৎপন্ন করে। তাকে তার কৃতকর্মের ফলভোগে বাধ্য থাকতে হয়। আবার ঐ কর্মফল ভোগ করতে গিয়ে নুতন কর্ম করা হয় এবং তারও ফল ভোগে কর্মকর্তাকে বাধ্য থাকতে হয়। এইভাবে, কর্ম ও কর্মফল ভোগের চক্র চলতেই থাকে; এটি ঠিক বিশাল একটি বৃক্ষের মতো, যা কেবল নূতন নূতন শাখা প্রশাখা-পল্লব উন্মোচিত করতে থাকে। এর ফলে ৮৪ লক্ষ জীবযোনিতে বার বার আবর্তিত হতে হয় এবং জড়া প্রকৃতির ত্রিতাপ — আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক — ত্রিবিধ দুঃখজ্বালায় নিরন্তর দগ্ধ হতে হয়। এমনকি, পুণ্য কর্ম বা সৎকর্ম করে স্বর্গে গেলেও নিস্তার নেই; কিছুকাল স্বর্গসুখ ভোগের পর পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে পুনরায় মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এইভাবে ফল কামনাযুক্ত-কর্ম করা ও সেই কর্মের ফল ভোগের বন্ধনে আবদ্ধ থাকাকে বলা হয় কর্মবন্ধন। সকাম কর্ম সম্পাদনের ফলে কোটি কোটি জন্ম — অনন্তকাল ধরে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়।

যদি আপনি কর্ম ত্যাগ করেন ... ...

আর সবরকম কার্যকলাপ বা কর্ম ত্যাগ করার চেষ্টা করাটা সমাধান নয়। যখন অর্জুন, একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা, তাঁর যুদ্ধ করার কর্তব্য পরিত্যাগ করতে চাইছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, **"তুমি শাস্ত্রনির্ধারিত কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান কর, কেননা কর্মত্যাগ থেকে কর্মের অনুষ্ঠান শ্রেয়। কর্ম না করে কেউ দেহযাত্রাও নির্বাহ করতে পারে না।** (ভ.গী. ৩/৮)। পারমার্থিক অনুমোদন (গুরু নির্দেশ, প্রভৃতি) ব্যতীত কখনই নিজ কর্তব্য কর্ম বা স্বধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়, কেননা তার ফলে জগতে অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। **যেহেতু কর্ম না করলে দেহরক্ষা অসম্ভব, সেজন্য পুরোপুরি কর্মত্যাগ করাও অসম্ভব।** আর সমস্তরকম সতর্কতা অবলম্বন করলেও আমরা অজ্ঞাতসারে বহু জীব — যেমন কীটপতঙ্গ প্রভৃতি হত্যা করে থাকি। স্মৃতি শাস্ত্রে পাঁচ ধরণের পাপকর্মের কথা বলা হয়েছে যা প্রত্যেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও করে থাকে। সেগুলি এইরকম ঃ (১) চুলকানো (২) ঘর্ষণ (৩) অগ্নি প্রজ্জ্বলন (৪) পাত্র থেকে জল ঢালা (৫) গৃহ পরিষ্কার। এইগুলির ফলে পাপ সৃষ্টি হয় — কেননা এই মৌলিক কর্মগুলি না করে দেহধারণ করা যায় না, আর এর ফলে জীব হত্যাঘটিত পাপ হয়। ইচ্ছাকৃত ভাবে পাপ না করলেও ঐ পাঁচ ধরণের কর্মজনিত পাপ সকলকেই করতে হয়। অন্যদিকে, জড়বন্ধন-রূপ যে বৃক্ষটি সকাম কর্ম ও তার ফলের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, সেটি বাড়তেই থাকে এবং ফলে শান্তি লাভের আশা হয় সুদূরপরাহত।

কর্মবন্ধন ছাড়াই কিভাবে কর্ম করা সম্ভব?

কর্ম করলেই কর্মবন্ধনের চক্রে জড়িয়ে পড়তে হয়। আবার কর্মত্যাগ করাও অনুচিত, এবং অসম্ভব। তাহলে কিভাবে কর্মবন্ধন ছাড়াই কর্ম করা সম্ভব?

এজন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করছেন, ঠিক কেমন ভাবে কর্ম করা উচিত ঃ

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।

"বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত, তা না হলে কর্ম জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাই হে কৌন্তেয়, ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য কেবল তুমি কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান কর, তার ফলে তুমি সদাসর্বদা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।" (ভ.গী. ৩/৯)

সমস্ত কর্ম শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য যজ্ঞ হিসাবে সম্পাদন করাই হচ্ছে কর্মফলের বন্ধন হতে প্রকৃত মুক্তি, কর্মযোগের প্রকৃত কৌশল। এইভাবে, এটাও জরুরী যে আমরা যেন খাদ্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করার পর তাঁর ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করি, কেননা এর ফলে আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যা-কিছু পাপ করি না কেন, তার ফল বা প্রতিক্রিয়া বিনষ্ট হয়ে যাবে। এইজন্য সনাতন ধর্মের অনুগামী এমন গৃহে আজও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করার রীতি রয়েছে। যারা শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের জন্য রন্ধন না করে কেবল নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য রন্ধন করে, তারা তাদের কর্তব্যকর্ম করার সময়ে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কৃত সকল পাপকর্মের ফলভোগে বাধ্য থাকে।

কর্মযোগ ঃ শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম করা

কর্মযোগ, অর্থাৎ দিব্য চেতনায় কর্ম সম্পাদনের এই পন্থার মাধ্যমে কমবন্ধন হতে বিমুক্ত হওয়া যায় এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আমাদের হৃদয়স্থ সুপ্ত প্রেম ক্রমশ অভিব্যক্ত হতে থাকে। এই ধরণের কর্মযোগকে নিষ্কাম কর্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনারহিত কর্ম বলা হয়। এইভাবে যিনি কর্ম করেন, তিনি তাঁর সমস্ত কৃতকর্মের ফল নিজেই ভোগ করার পরিবর্তে ভগবানকে সমর্পণ করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন যে সমস্ত জীবসত্তা তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ। অংশের কর্তব্য হচ্ছে পূর্ণের সেবা করা। একটি *পূর্ণাঙ্গ দেহের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, যেমন হাত, পা, চোখ, কান। হাত পা কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু তারা উদরকে খাদ্য দিতে অস্বীকার করে না, যদিও উদর আপাতঃদৃষ্টিতে কোনোই পরিশ্রম করে না। অন্যদিকে, হাত ও পা যদি বিরুদ্ধাচরণ করে, যদি উদরকে খাদ্য দিতে অস্বীকার করে, তাহলে উদরে খাদ্যের স্বল্পতা হাত-পাকে দুর্বল, অকেজো করে দেবে। ঠিক তেমনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ-বায়ু, আত্মা। ভগবদ্গীতার ৯/২৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেন, "আমি সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা।"* আমরা এই সরল সত্যটি ভুলে গিয়েছি যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং সমস্ত জীবসত্তা তাঁর নিত্য সেবক। সেজন্য, পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় আমাদের দেহেন্দ্রিয় ও মনকে নিয়োজিত করার পরিবর্তে আমরা নিজেরাই ছোট ছোট ভগবান সেজেছি এবং এই জড়জগৎকে ভোগ করার চেষ্টা করছি। এই হচ্ছে মায়া।

কর্মযোগীগণ কখনই জড়গুণের প্রণোদনায় জড় কর্মে লিপ্ত হন না, সাধারণ কর্মীরা যা করে থাকেন। তারা কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, যার অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সেবা। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "হে মহাবাহো! তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ভগবৎ-ভক্তিমুখী কর্ম ও সকাম কর্মের পার্থক্য ভালভাবে অবগত হয়ে, কখনও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগাত্মক কার্যে প্রবৃত্ত হন না।" (ভ.গী. - ৩/২৮) পরবর্তী শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ এইরকম মুক্ত অবস্থা লাভের উপায় বর্ণনা করেছেন ঃ 'অতএব, হে অর্জুন! অধ্যাত্মচেতনা সম্পন্ন হয়ে তোমার সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ কর এবং মমতাশূন্য, নিষ্কাম ও শোকশূন্য হয়ে তুমি যুদ্ধ কর! আমার নির্দেশ অনুসারে যে-সমস্ত মানুষ তাঁদের কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন এবং যাঁরা শ্রদ্ধাবান ও মাৎসর্যরহিত হয়ে এই উপদেশ অনুসরণ করেন, তাঁরাও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।" (ভ.গী. ৩/৩০-৩১)

জ্ঞানযোগ

পরমার্থীদের দুটি শ্রেণী ঃ সবিশেষবাদী ও নির্বিশেষবাদী

সাধারণভাবে সমস্ত পরমার্থীদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ সবিশেষবাদী। ও নির্বিশেষবাদী। সবিশেষবাদী ভক্ত নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হন। নির্বিশেষবাদীও নিজেকে নিয়োজিত করেন, তবে সারসরি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নয়, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ, নিরাকার সর্বব্যাপ্ত অব্যক্ত ব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হন। **যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নিরাকার, নির্বিশেষ বিভাবের (ব্রহ্মজ্যোতি) অনুধ্যানের পন্থা অবলম্বন করেন, তাঁদের বলা হয় জ্ঞানযোগী। আর যাঁরা পূর্ণ কৃষ্ণচেতনায় ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত হন, তাঁদেরকে বলা হয় ভক্তিযোগী।**

জ্ঞানযোগের পন্থা একই লক্ষ্যে নিয়ে গেলেও তা অত্যন্ত ক্লেশকর, কষ্টদায়ক; পক্ষান্তরে ভক্তিযোগের পথ — পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবায় নিয়োজিত হবার পথ সহজতর, এবং দেহধারী জীবের জন্য স্বাভাবিক। এই জগতে প্রতিটি জীবসত্তা স্মরণাতীত কাল হতে জড় দেহে আবদ্ধ রয়েছে। সে দেহ নয় — এই কথাটি কেবল তত্ত্বগতভাবে উপলব্ধি করাও তার পক্ষে কঠিন। অবশ্য, মন্দিরে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনা পুতুল পূজা নয়। বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে উপাসনা দুইরকম হতে পারে — সগুণ এবং নির্গুণ অর্থাৎ নির্বিশেষে বিভাবের অনুধ্যান। মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা সগুণ; ভগবদ্-রূপ এখানে যা জড়ের মাধ্যমে অভিব্যক্ত। মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের রূপ ভগবানের চিন্ময় রূপের সঙ্গে অভিন্ন। **যেহেতু আমরা আমাদের জড় চোখ দিয়ে ভগবানকে দর্শন করতে পারি না, সেজন্য ভগবান আমাদের কাছে কাঠ, পাথর, তৈল-চিত্র প্রভৃতি জড় বস্তুর মাধ্যমে নিজেকে অভিব্যক্ত করেন। ফলে ঐ শ্রীবিগ্রহ জড় নয়, তা ভগবানের মতোই চিন্ময়, ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন।** এই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পরম বৈশিষ্ট্য।

জ্ঞানযোগীদের ক্লেশকর পথ

সুতরাং সরাসরি পরমেশ্বর ভগবানের সাহচর্য-লাভের পথে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে একজন ভক্তের কাছে কোন সমস্যা নেই; কিন্তু যাঁরা নির্বিশেষ পন্থা অবলম্বন করে পারমার্থিক উপলব্ধি লাভের প্রয়াস করেন, তাদের জন্য ঐ পথটি কঠিন, ক্লেশদায়ক। উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করে তাদেরকে পরমেশ্বর ভগবানের অব্যক্ত অনির্দেশ্য, অক্ষর বিভাগ সম্বন্ধে জানতে হয়, তাদের সংস্কৃত শিখতে হয়, অপ্রত্যক্ষজ অনুভূতি-সমূহ উপলব্ধির কৌশল আয়ত্ত করতে হয়, 'নেতি নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়) বিচার করে জড় ও চেতনা বা চিদ্ বস্তুর পার্থক্য বুঝতে হয়, এবং বহু পরিমাণ মানসিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে এই সব অধিগত করতে হয়।

পক্ষান্তরে যিনি কৃষ্ণভক্তির পন্থা গ্রহণ করেছেন, তিনি কেবল গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে ভক্তিযোগের বিধিনিয়মগুলি পালন করেন, শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম নিবেদন, ভগবৎ- কথা শ্রবণ, ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ ভোজন, ভগবানের চরণকমলে অর্পিত ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে খুব সহজেই পরমতত্ত্ব, পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন। এইভাবে ক্রমশঃ ভগবানের সংগে তাঁর প্রেমময় সম্পর্কের বিকাশ হয়, এবং ফলে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করে দেহান্তে *ভক্ত চিজ্জগতে ভগবদ্ধামে ফিরে যান, যাকে ভগবদ্গীতায় পরম বা সর্বশ্রেষ্ঠ গতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।* অপরদিকে, জ্ঞানীর পথ ক্লেশকর, আনন্দহীন এবং পরিণামে দুঃখময়। ব্রহ্মানন্দ হতে ভগবদ্ভক্তির আনন্দ অনন্ত কোটি গুণ বেশি।

জ্ঞানযোগী ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হন ভক্তসঙ্গের মাধ্যমে

পারমার্থিক উপলব্ধির প্রাথমিক স্তরে যখন কেউ জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগের চেষ্টা করেন, তখন নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের প্রতি কিছুটা ঝোঁক দেখা দিতে পারে, কিন্তু যখন কেউ আরো অগ্রসর হন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে অপ্রাকৃত, অজড় চিন্ময় স্তরেও কার্যকলাপ রয়েছে এবং ঐ কার্যকলাপ হচ্ছে ভক্তিযুক্ত সেবা। এটি উপলব্ধি করে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর শরণাগত হন। এই সময়ে তিনি উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে শ্রীকৃষ্ণের করুণা বা অনুগ্রহই সবকিছু, তিনিই সর্বকারণের কারণ এবং এই জড়জাগতিক প্রকাশ তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, স্বাধীন নয়। তিনি উপলব্ধি করেন যে এই জড়জগত হচ্ছে চিন্ময় জগতের, চিদ্বৈচিত্র্যের বিকৃত প্রতিফলন, এবং সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সংগে সম্পর্কযুক্ত। এইভাবে তিনি সবকিছুকেই বাসুদেব অথবা শ্রীকৃষ্ণের সংগে সম্বন্ধযুক্তভাবে দর্শন করতে শুরু করেন। বাসুদেবের এই বিশ্বরূপের এই জ্ঞান, বাসুদেবকেই সমস্ত জড় ও চিন্ময় অভিব্যক্তির কারণ রূপে উপলব্ধি বা তত্ত্ববোধ তাঁকে পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণকে জীবনের চরম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। এইরকম আত্মনিবেদিত পুরুষ খুবই দুর্লভ। নীচের শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে সমর্থিত হয়েছে ঃ

বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেব সর্বম্-ইতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।।

— ভ.গী.- ৭/১৯

"বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব কারণের পরম কারণ রূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।"

একটি জীবসত্তা শাশ্বত সনাতন সত্তা, নিত্যকালের জন্য এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি। প্রত্যেক আত্মা স্বরূপতঃ সৎ-চিৎ আনন্দময়। সে যদি পূর্ণের সংগে লীন হয়ে থাকতে চায় (স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব কখনই বিলুপ্ত হয় না), তাহলে তাঁকে তাঁর নিজ মুল স্বরূপের নিত্যত্ব এবং চিৎ বা জ্ঞানময়-বিভাবের উপলব্ধি অর্জন করতে হয়। কিন্তু এভাবে সৎ ও চিৎ স্বরূপের উপলব্ধি হলেও তাঁর সত্তার আনন্দময় স্বরূপটি তার কাছে অনুপলব্ধ থেকে যায়। এই রকম জ্ঞানযোগের পন্থায় অত্যন্ত বিজ্ঞ পারদর্শী একজন যোগী ভক্তসঙ্গ বা কোনোভাবে ভক্তিযোগের স্তরে উপনীত হতে পারেন। সেই সময়ে, নির্বিশেষবাদে তাঁর দীর্ঘকালের অভ্যাস-অনুশীলন তার কাছে মর্ম পীড়ার কারণ হয়ে ওঠে, কেননা ঐ ধারণা ত্যাগ করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য জড়দেহধারী জীবের পক্ষে অব্যক্ত ব্রহ্ম অনুধ্যান সর্বদাই ক্লেশকর, অভ্যাস ও উপলব্ধি — উভয় সময়ে। অব্যক্ত উপলব্ধি চিন্ময়, আনন্দময় আত্মার প্রকৃত স্বভাবের বিরোধী। সেজন্য এই পন্থা গ্রহণ করা উচিত নয়। প্রত্যেক জীবসত্তার জন্য ভক্তিযুক্ত সেবায় পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হওয়ার পন্থা — কৃষ্ণভক্তির পন্থা সর্বোত্তম। ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবাকে উপেক্ষা করলে নাস্তিকতাবাদে আকৃষ্ট হয়ে পড়ার বিপদ থাকে।

জ্ঞানযোগ কষ্টদায়ক ঃ শ্রীকৃষ্ণের ঘোষণা

ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের শুরুতে শ্রীকৃষ্ণের সংগে অর্জুনের একটি কথোপকথন রয়েছে, সেখানে ভক্তিযোগকে সর্বোত্তম বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে ঃ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, "এইভাবে নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে যে সমস্ত ভক্তেরা যথাযথভাবে তোমার আরাধনা করেন এবং যাঁরা ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী?" (ভ.গী. ১২/১)

শ্রীভগবান বললেন, "যাঁরা তাঁদের মনকে আমার সবিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন এবং অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।" (ভ.গী. ১২/২)

শ্রীকৃষ্ণ এরপর সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে নির্বিশেষ অব্যক্ত আরাধনা কেবল ক্লেশদায়ক, কষ্টকর ঃ **"যাদের মন অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের আরাধনায় অধিকতর ক্লেশ লাভ হয়।"** (ভ.গী. ১২/৫)

ধ্যানযোগ বা অষ্টাঙ্গ যোগ

ধ্যানযোগ বা অষ্টাঙ্গ যোগের আটটি অঙ্গ রয়েছে ঃ **যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান, সমাধি।** এই যোগপন্থায়, ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ — শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ থেকে প্রত্যাহার করতে হয় এবং তারপর চোখের পাতা অর্ধনিমীলিত করে ভ্রূমধ্যে বা নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। চোখ পুরো খোলা রাখলে ইন্দ্রিয়-বিষয়ের দ্বারা মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে পারে, আবার চোখ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখলে ঘুম এসে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। ধীরে ধীরে অভ্যাসের মাধ্যমে প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান-সমান, এই পঞ্চ বায়ুর ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, এজন্য দীর্ঘকাল শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ বা প্রাণায়াম অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। যোগী ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে বাহ্য বিষয় সম্ভোগ হতে সেগুলিকে বিরত রাখেন এবং মুক্তিলাভের জন্য প্রস্তুত করে তোলেন। এই অষ্টাঙ্গ যোগ হচ্ছে প্রকৃত যোগের শুরু।

অষ্টাঙ্গ যোগপন্থায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীর ধ্যানাভ্যাসে সাহায্য করার জন্য যে দৈহিক ব্যায়মাভ্যাসের প্রয়োজন হয়, সেগুলিকে জড়ীয় কার্যকলাপ বলে গণ্য করা হয়। যোগাভ্যাসে পরিপক্ক হলে এগুলির আর প্রয়োজন হয় না। কেউ যখন যোগে উন্নতি লাভ করেন, তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের, পরমাত্মার ধ্যানে তন্ময় হন এবং সমস্ত রকমের জড়বাসনা পরিত্যাগ করেন। তিনি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সকাম কর্ম থেকে বিরত হন।

অষ্টাঙ্গ যোগসিদ্ধির ফলে যোগীর আট রকমের সিদ্ধি বা অষ্টসিদ্ধির এক বা একাধিক সিদ্ধি বা ক্ষমতা লাভ হতে পারে, এগুলি হচ্ছে ঃ ১. **অণিমা** (অণুর মতো ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা); ২. **মহিমা** (অত্যন্ত বড় হবার ক্ষমতা); ৩. **লঘিমা** (অত্যন্ত লঘু বা হাল্কা হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা-এর প্রভাবে শূন্যে ভেসে থাকা যায়); ৪. **প্রাপ্তি**; ৫. **ঈশিতা**; ৬. **প্রাকাম্য**; ৮. **কামবশয়িতা**। এই যোগ সিদ্ধির এক বা একাধিক সিদ্ধি লাভ হলে, বহু যোগী যশ-খ্যাতির ফাঁদে জড়িয়ে পড়েন। তিনি একজন জাদুকরের মতোই সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনকারীতে পরিণত হন। এরফলে ঐ সমস্ত যোগীগণ কিছু মানুষের বাহবা পেলেও তারা সর্বোচ্চ সিদ্ধি — পরমাত্মা উপলব্ধি বা ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করতে ব্যর্থ হন।

যারা সরাসরি পরেমশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির পথ অবলম্বন করেন, সেই কৃষ্ণভক্তের এইভাবে পতনের কোনো ভয় থাকে না, কেননা তাঁর মনোযোগ প্রথম থেকে ভগবানের দিব্যানন্দময় অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবায় দৃঢ়-নিবদ্ধ থাকে, যার ফলে তাঁর কাছে জড়বিষয় অত্যন্ত বিস্বাদ, বিরক্তিকর বলে অনুভূত হতে থাকে। অনুক্ষণ কৃষ্ণতন্ময়তাই হচ্ছে পরিপূর্ণ সমাধির স্তর; ভক্ত ভগবৎ-সেবায় নিমগ্ন থাকায় তাঁর মন সর্বদা ভগবৎ-তন্ময়, কৃষ্ণভাবনাময় থাকে, সেজন্য ভক্তকে আর পৃথকভাবে সমাধি অভ্যাস করতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান প্রেমাবিষ্টতার প্রভাবে ভক্তের কাছে অষ্ট সিদ্ধি অত্যন্ত তুচ্ছ বা বোঝাস্বরূপ মনে হয়। আনন্দ-চিন্ময়-সদুজ্জ্বল-বিগ্রহ মাধুর্য-মূর্তি ভগবানের প্রেমপূর্ণ সেবায় যে কি অপ্রাকৃত সুখ অনুভূত হয়, জড়-বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা তা উপলব্ধি করতে আদৌ সক্ষম হয় না।

অষ্টাঙ্গ যোগসাধনার বিধিনিয়ম

প্রথমে একটি অত্যন্ত নির্জন নিরালা স্থান নির্বাচন করতে হয়। জনবহুল শহরে বসে অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন করা যায় না। এজন্য সম্পূর্ণভাবে যৌন জীবন পরিহার করে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করার প্রয়োজন হয়। মিতাহারী হতে হয় ও পরিমিত নিদ্রা অভ্যাস করতে হয়। আহার, নিদ্রা, বাক্য, কার্যকলাপ প্রভৃতির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যোগী মনকে জড় বাসনার প্রবেশ-শূন্য করে সম্পূর্ণভাবে পরমাত্মার প্রতি মনঃসন্নিবেশ করতে সমর্থ হন। এই অবস্থায় মন নিবাত নিষ্কম্প

দীপশিখার মতো স্থির রেখে পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন হতে হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় যোগ সমাধি। এই অবস্থায় যোগীর মন সম্পূর্ণভাবে জড়জাগতিক ও মানসিক চিন্তাতরঙ্গ থেকে মুক্ত থাকে। এইভাবে যে-যোগী ভগবানে মন নিবদ্ধ করে সমাধিমগ্ন হতে পারেন, তিনি সর্বোচ্চ অপ্রাকৃত সুখ লাভ করেন, যার ফলে সমস্ত জড়ীয় সুখকে তুচ্ছ মনে হয়। এইভাবে আত্ম-সংযত, যোগ-নিমগ্ন যোগী সমস্ত জড়কলুষ থেকে বিমুক্ত হন ও ভগবৎ-চেতনার দিব্য সুখ আস্বাদন করতে থাকেন।

প্রসঙ্গতঃ, আজকাল বিশ্বের নানা প্রান্তে বহু যোগ-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, যেখানে ভগবানের ধ্যানের পরিবর্তে 'বিন্দু', 'দীপশিখা', বা শূন্য ধ্যানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এগুলি যথার্থ যোগ নয়, এইসবের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত একজন মানুষও যোগসিদ্ধি কিংবা সমাধি অবস্থা লাভ করতে পারে নি। এগুলি এক ধরণের ব্যায়াম-অনুশীলন — শরীর-মনকে সুস্থ, উদ্বেগমুক্ত ('টেনশন-ফ্রি') রাখার কলাকৌশল, যাতে জড়বিষয় ভোগের পথ আরো মসৃণ হয়।

কলিযুগে অষ্টাঙ্গ যোগ-পন্থার সীমাবদ্ধতা

এমনকি পাঁচ হাজার বছর আগেও যখন বিশ্বের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম, তখনও এই অষ্টাঙ্গ যোগ-পন্থা অনুশীলন সহজসাধ্য ছিল না। অর্জুন ছিলেন রাজপরিবারের অন্তর্ভূক্ত, একজন মহাবীর এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা ও প্রায় সর্বক্ষণের সহচর;এমনকি সেই অর্জুনের মতো মহান ব্যক্তিত্বও শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে মুখোমুখি কথোপকথনের মাধ্যমে এই যোগপন্থার কথা শ্রবণ করার পর বলেছিলেন, "প্রিয় কৃষ্ণ, এই পন্থা অনুসরণ করা সম্ভব নয়।" অর্জুন বলেছিলেন, **"হে মধুসূদন! তুমি সর্বত্র সমদর্শনরূপ যে যোগ উপদেশ করলে, মনের চঞ্চল স্বভাববশতঃ আমি তার স্থায়ী স্থিতি দেখতে পাচ্ছি না। হে কৃষ্ণ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয় - আদির বিক্ষেপ উৎপাদক, দুর্দমনীয় এবং অত্যন্ত বলবান, তাই তাকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভূত করার থেকেও অধিকতর কঠিন বলে আমি মনে করি"।** (ভ.গী. ৬/৩৩-৩৪)

এই কলিযুগের একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে গৃহত্যাগ করে নির্জন অরণ্যে বা পর্বতে গিয়ে যোগাভ্যাস করা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগে জীবন মানেই হচ্ছে সামান্য কিছুকাল বেঁচে থাকার জন্য কঠোর, তিক্ত সংগ্রাম। মানুষ এখন সহজ, বাস্তব উপয়েও আত্মোপলব্ধির জন্য চেষ্টিত নয়, তাহলে এই অত্যন্ত আয়াস ও শ্রমসাধ্য অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনার কথা আর কি বলার আছে! আহার-বিহার, বসার ধরণ, মানুষের সঙ্গ — সবই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন হয়, এবং মনকে জড়-বিষয় হতে বিচ্ছিন্ন করতে হয়। একজন বাস্তববাদী মানুষ হিসাবে অর্জুন তাঁর পক্ষে এই যোগ-পন্থা অনুসরণ অসম্ভব বলে মনে করেছিলেন, যদিও তার এজন্য অনেক অনুকূল গুণ ছিল — যেমন তিনি ছিলেন নিদ্রাজয়ী (*গুড়াকেশ*)। সেজন্য আধুনিক যুগের পরিবেশে সাধারণভাবে এই যোগ-পন্থা অভ্যাসকে অসম্ভব বলে মনে করা হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পক্ষে সাফল্য লাভ সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের জন্য এই পন্থা অনুসরণ কার্যতঃ অসম্ভব। পাঁচ হাজার বছর আগেও যদি মাত্র কতিপয় সাধকের পক্ষে এই যোগসাধনা সম্ভব হয়, অর্জুনের মতো মহাপ্রতিভাধরেরা অপারগ হন, তাহলে এখনকার কথা আর কি বলার আছে? বর্তমানে যাঁরা তথাকথিত যোগ্যাভ্যাস-কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে এই যোগপন্থা অনুকরণের চেষ্টা করছেন, তারা কিছুটা শান্তি ও মানসিক সাম্য লাভ করলেও তাঁরা সময়েরই অপচয় করছেন; কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তারা ভগবদ্গীতার উপদেশ অনুসারে পরমাত্মা, ভগবানের ধ্যান করছেন না — অন্য নানা কিছু উদ্ভাবন করে তার ধ্যান করছেন। তাদের এইসব কলাকৌশল কখনই শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, ফলে দেহান্তে তাঁরা পরম গতি লাভ করতে — চিন্ময় জগতে ফিরে যেতে পারেন না। পরমপুরুষের নির্দেশ পালন না করে মনগড়া পথে চললে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। যোগসাধনার নামে এগুলি প্রহসন ও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। কলিযুগের জন্য অষ্টাঙ্গ যোগের সর্বোত্তম বিকল্প যোগপন্থা হচ্ছে — ভক্তিযোগ।

ভক্তিযোগ

ভক্তিযোগের অর্থ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সংযোগ সাধন এবং তাঁর নিত্য সঙ্গী বা পার্ষদ হিসাবে তার সংগে আমাদের শাশ্বত সম্পর্কের পুনর্জাগরণ। ভগবানের মহিমা স্বীকারের মাধ্যমে ভক্তির শুরু হয়। ভক্তিযোগে অবশ্যই এই তিনটি অঙ্গ বা উপাদান থাকতে হবে ঃ **(১) সেবক (২) সেব্য** এবং **(৩) সেবা**। সেবা গ্রহণ করার জন্য একজনকে থাকতে হবে, সেবা করার জন্যও কাউকে থাকতে হবে। সেব্যের সংগে সম্পর্কিত হবার মাধ্যম হচ্ছে সেবা; ভগবৎ-সেবাকে হয় ভক্তিযোগ।

জীবসত্তাসমূহ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক, নিত্য-সহচর। বস্তুত, তাদের আদি শাশ্বত স্বরূপে জীবগণ শ্রীকৃষ্ণের দাস হতে বা তাঁর দাসানুদাস হতেও ভালবাসে। **পরম আকর্ষক পরম ভোক্তা পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সেব্য বস্তু বা সেবার লক্ষ্য**। ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবার নয়টি অঙ্গ রয়েছে, এবং ভক্তিযোগের একজন শিক্ষার্থী তাঁর পছন্দ অনুসারে এই নয়টির মধ্যে একটি, দুটি, চারটি বা সবগুলিই সম্পাদন করতে পারেন।

পরমতত্ত্বের প্রতি সম্পাদিত সেবাও পরম, জড় জগতের দ্বৈততা বর্জিত এবং অপ্রাকৃত। পারমার্থিক স্তরে চিন্ময় বৈচিত্র্য রয়েছে। অর্থাৎ চিন্ময় জগতেও ভূমি, বৃক্ষ, জল, সেব্য, সেবক ও সেবা — সবকিছুই রয়েছে, কিন্তু সবই পরম ও চিন্ময়, জড় গুণবর্জিত বিশুদ্ধ, এবং সবকিছুই শাশ্বত ও আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিত। সেজন্য ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবা সরাসরিভাবে চিন্ময়, অপ্রাকৃত, তা জড় কর্ম নয়। এই ভক্ত্যাঙ্গগুলি আমাদের চিন্ময় নিত্য স্বরূপ বিকাশে অত্যন্ত শক্তিশালী। অতীতে বহু বহু ঋষি, মুনি, মহান ব্যক্তিগণ ও রাজা-রাজর্ষিগণ এই ভক্তিযোগ অবলম্বন করে সফলতা লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমনকি একটি বা দুটি ভক্তি-অঙ্গ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সংগে সাধন করে জীবনের চরম সার্থকতা প্রাপ্ত হয়েছেন। নীচে ভক্তির নয়টি অঙ্গ ও সেগুলির অনুশীলনে সফলকাম কয়েকজন ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল ঃ

১. **শ্রবণম্** ঃ মহারাজ পরীক্ষিত কেবল শ্রবণের মাধ্যমে ভগবদ্ধাম লাভ করেন। তিনি শ্রীল শুকদেবের নিকট থেকে কেবলমাত্র সাত দিন শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা শ্রবণ করেছিলেন।

২. **কীর্তনম্** ঃ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ঐ একই গতি লাভ করেন তাঁর পিতা, মহান ঋষি ব্যাসদেবের নিকট থেকে লব্ধ অপ্রাকৃত সংবাদ — ভগবৎ গুণমহিমা অবিকৃতভাবে কীর্তনের মাধ্যমে।

৩. **স্মরণম্** ঃ মহারাজ প্রহ্লাদ ভগবানের শুদ্ধভক্ত দেবর্ষি নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে সর্বদা, অনুক্ষণ ভগবানকে স্মরণের মাধ্যমে পরম গতি প্রাপ্ত হন।

৪. **পাদসেবনম্** (সেবা) ঃ সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, লক্ষ্মীদেবী কেবল একস্থানে উপবেশন করে শ্রীনারায়ণের পদসেবা করে সাফল্য লাভ করেন।

৫. **অর্চনম্** (পূজা) ঃ মহারাজ পৃথু কেবল ভগবানের পূজা করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

৬. **বন্দনম্** (স্তব-গান) ঃ কেবল স্তবের দ্বারা, ভগবানের বন্দনা করার মাধ্যমে অক্রুর পরম পদ প্রাপ্ত হন।

৭. **দাস্যম্** (আজ্ঞা পালন) ঃ শ্রীরামচন্দ্রের সেবক মহাভক্ত হনুমান কেবল ভগবানের আজ্ঞা পালনের মাধ্যমে পরম গতি লাভ করেন।

৮. <u>সখ্যম</u> (ভগবানের সংগে সখ্যতা স্থাপন) ঃ মহাবীর অর্জুন ভগবানের সংগে সখ্যতা করার মাধ্যমে পূর্ণ সিদ্ধি অর্জন করেন। অত্যন্ত প্রীত হয়ে ভগবান অর্জুন ও অর্জুনের ভবিষ্যৎ অনুগামী মানুষদের জন্য ভগবদ্গীতার অমৃতময় জ্ঞান উপদেশ করেন।

৯. <u>আত্মনিবেদন</u> ঃ মহারাজ বলি তাঁর যথা-সর্বস্ব — এমনকি নিজ দেহটিকেও ভগবানকে নিবেদনের মাধ্যমে পূর্ণ সাফল্য প্রাপ্ত হন।

মহারাজ অম্বরীষ উপরোক্ত নটি ভক্ত্যাঙ্গই সাধন করতেন, এবং এভাবে তিনিও পরমপদ প্রাপ্ত হন।

শুদ্ধ ভক্তিযুক্ত সেবা লাভের জন্য ক্রমোন্নতিমূলক পন্থা ও সরাসরি পন্থা

নীচে উদ্ধৃত শ্লোকার্থগুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ জীবদেরকে তাঁর কাছে ফিরে আসার জন্য বিভিন্ন রকম উপায়ের কথা বলেছেন — তাঁদের শরণাগতির ক্ষমতা অনুসারে। "**ভক্তিযোগ**" নামের এই দ্বাদশ অধ্যায়ের শ্লোকগুলি কেউ যদি পড়েন, তাহলে তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন, কিভাবে প্রত্যেকেই ২৪ ঘন্টাই কৃষ্ণচেতনায় নিমগ্ন থাকতে পারেন — এমনকি সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেও।

"অতএব আমাকেই তুমি মন সমাহিত কর এবং আমাতেই বুদ্ধি অর্পণ কর। তার ফলে তুমি সর্বদাই আমার নিকটে বাস করবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।" (ভ.গী. ১২/৮)

ভক্ত ভগবানের দিব্যনাম হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন ও তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্বুজে নিবদ্ধ করেন। যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে খাদ্য নিবেদন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সরাসরি প্রীতিসহকারে প্রদত্ত সেইসব আহার্য-দ্রব্য গ্রহণ করেন, আর ভক্ত ভগবানের সেই ভুক্তবশেষ প্রসাদ গ্রহণ করে ক্রমশঃ আরো গভীরভাবে কৃষ্ণচেতনাময় হয়ে উঠতে থাকেন। ভক্তের সমস্ত কার্যকলাপ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ যুক্ত — সবকিছুই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য সম্পাদন করেন। **এইভাবে তিনি সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন এবং কখনো কৃষ্ণকে বিস্মৃত হন না।** এইভাবে, ভক্ত জড় স্তরে থাকেন না। তিনি শুরু থেকেই অপ্রাকৃত, চিন্ময় স্তরে বিরাজ করতে থাকেন — তিনি শ্রীকৃষ্ণে, শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই বাস করতে থাকেন, ঠিক যেমন মাছ জলে বিরাজ করে।

"হে ধনঞ্জয়। যদি তুমি স্থিরভাবে আমাতে চিত্ত সমাহিত করতে সক্ষম না হও, তা হলে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হতে ইচ্ছা কর।" (ভ.গী. ১২/৯)

এই শ্লোকে ভক্তিযোগের দুটি ভিন্ন পন্থার কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি তাদের জন্য, যারা অপ্রাকৃত প্রেমে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমাসক্তিকে বলা হয় রাগানুগা ভক্তি। অপরটি তাদের জন্য, যারা ভগবানের প্রতি এমন প্রেমময় আসক্তি এখনো অর্জন করতে পারেন নি। **এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের জন্য বিভিন্ন ধরণের বিধি-নিয়ম নির্দেশিত হয়েছে, যা অনুসরণ করলে পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমাসক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। একে বলা হয় বৈধী ভক্তি।**

<u>ভগবৎ-প্রেম</u>

শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হচ্ছে জীবের স্বরূপগত প্রবৃত্তি। "**জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।**" কিন্তু জীব যখন এই জড়জগতে পতিত হয়, তখন সে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যায়। তখন সে অন্য কতকিছুর — বিশেষতঃ নিজের ইন্দ্রিয়গুলির সেবা করতে শুরু করে — যার জন্য তাঁকে এই দুর্দশায় পড়তে হয়েছে। সেবা করাই জীবের ধর্ম, তাই জড়জগতেও

কেউই সেবা না করে থাকতে পারে না। একজন প্রধানমন্ত্রী দেশের সেবা করেন, পিতা-মাতা তাঁর সন্তানদের সেবা করেন, কর্মচারীরা তাঁদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সেবা করেন, ডাক্তার রোগীদের সেবা করেন এবং এমনকি কোনো একজন বৃদ্ধের যখন কোনো সঙ্গী থাকে না, তখন তিনি তাঁর কুকুরটির সেবা করেন, কিংবা জনসেবায় ব্রতী হন। অতএব জীবসত্তার জন্য সেবা একটি স্বাভাবিক বৃত্তি বা প্রবণতা, এবং এ-জগতে প্রত্যেকেই কারো না কারো সেবা করছে। যেমন মিষ্টি থেকে — রসগোল্লা থেকে চিনিকে পৃথক করা যায় না, তেমনি আত্মা থেকে তাঁর সেবা-প্রবণতাকে কখনই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জীব-সত্তার স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে, সে এই স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রেম ও ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য ব্যবহার করতে পারে, আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে তাঁর মায়ার সেবাতেও লিপ্ত হতে পারে।

কৃষ্ণপ্রেম প্রত্যেকের হৃদয়ে নিত্যকাল বিদ্যমান, এ-জগতের বদ্ধজীবের হৃদয়ে সেই প্রেম সুপ্ত রয়েছে। আমরা তা অনুভব করতে পারছি না জড়-সঙ্গ-প্রভাবে চিত্ত কলুষিত হয়ে যাওয়ার জন্য। এখন চিত্তকে, চেতনাকে জড়কলুষ থেকে মুক্ত, নির্মল করতে হবে; তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক সুপ্ত ভালবাসা পুনর্জাগরিত হবে। আমরা **প্রেম অর্জন করতে পারি না** — তা হৃদয়ে নিত্যকাল রয়েছে; প্রয়োজন হচ্ছে কেবল **হৃদয়স্থ সুপ্ত প্রেমের বিকাশ**। অর্জন করার অর্থ হচ্ছে যা নেই তা প্রাপ্ত হওয়া। আর পুনর্জাগরিত করার অর্থ হচ্ছে আমাদের যা আগেই রয়েছে, সে-সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠা, সেটি পুনর্বিকশিত করা। ***কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে খনি-গর্ভের কয়লা-আবৃত হীরক খণ্ডের মতো। যখন কয়লা ধুয়ে ফেলা হয়, তখন উজ্জ্বল প্রভাময় হীরাটি দৃষ্টিগোচর হয়। ঠিক তেমনি যখন শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা-নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে, বিধিভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে চিত্ত, অন্তঃকরণ কলুষমুক্ত, নির্মল হয়ে ওঠে, তখন আমরা আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান কৃষ্ণপ্রেম প্রত্যক্ষ করতে পারি। প্রত্যেকের অন্তরেই কৃষ্ণপ্রেম সুপ্ত রয়েছে, কেবল 'মার্জিত', শুদ্ধ চেতনায় তা উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়।***

একজন সুদক্ষ সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম-বিধি অনুসরণ করতে হয় — যেমন ভোরে ওঠা, স্নান করা, মন্দিরে বা গৃহে ভগবানের ছবি উন্মোচন করে প্রণাম করা, সেখানে প্রার্থনা-গীতি গান করা, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা, ভগবানের জন্য ফুল তোলা, আহার্য রন্ধন করে ভগবানকে নিবেদন করা ও প্রসাদ গ্রহণ করা, ইত্যাদি। এজন্য ভক্তকে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে **ভগবদ্গীতা** ও **শ্রীমদ্ভাগবত** শ্রবণ করতে হয়। সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে ভক্তিযোগের এই বিধি-নিয়মগুলির অভ্যাস-অনুশীলনের ফলে ভক্ত অতি দ্রুত ভগবৎ-প্রেম লাভের স্তরে উন্নীত হন।

> "যদি তুমি এমনকি অভ্যাস করতেও অসমর্থ হও, তাহলে আমার প্রতি কর্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম করেও তুমি সিদ্ধি লাভ করবে।" (ভ.গী. ১২/১০)

কেউ যদি সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে বৈধী ভক্তি অনুশীলন করতে অসমর্থ হন, তাহলে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের জন্য কর্ম করার মাধ্যমে পূর্ণ সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারেন। ভগবানের জন্য কিভাবে কর্ম করা যায়? বহু ভক্ত রয়েছেন যারা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিয়োজিত রয়েছেন, এবং তাদের সাহায্যের প্রয়োজন। জগতের সর্বোত্তম কল্যাণের জন্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের প্রতি সকলেরই সহানুভূতিশীল হওয়া কর্তব্য। সুতরাং, কেউ যদি সরাসরি ভক্তিযোগের বিধিনিয়মগুলি অভ্যাসে অসমর্থ হন, তাহলে তিনি নানাভাবে এই প্রচারকার্যে সহযোগিতা করতে পারেন। ঠিক যেমন ব্যবসা করতে হলে একটি থাকবার জায়গা, মূলধন, শ্রম এবং সংগঠনের প্রয়োজন হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য ও এই সমস্ত কিছুর প্রয়োজন হয়। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এই যে, জড়জাগতিক ব্যবসা-কর্মে ব্যবসায়ী নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কাজ করে থাকেন। ঐ কর্ম জড়, প্রাকৃত। ঐ একই কর্ম শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষবিধানের জন্য সম্পাদন করা যেতে পারে, আর সেটি চিন্ময় কর্ম, অপ্রাকৃত কর্ম। **যদি কারো যথেষ্ট অর্থ থাকে, তাহলে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য একটি অফিস কিংবা একটি মন্দির তৈরীর জন্য ঐ অর্থ দিয়ে সহায়তা করতে পারেন। অথবা তিনি গ্রন্থ-প্রকাশনায় সাহায্য করতে পারেন।** বহুরকমের সেবাকার্য রয়েছে, আর ঐ সমস্ত কাজকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য এই স্বেচ্ছাকৃত সহায়তা বা সেবা সম্পদনের ফলে সহযোগিতাকারী ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভালবাসা লাভের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হন, এভাবে তিনি পূর্ণসিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

"আর যদি তাও করতে অক্ষম হও, তবে আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে সংযতচিত্তে কর্মের ফল ত্যাগ কর।" (ভ. গী. ১২/১১)

এমনও হতে পারে যে, সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মীয় অথবা অন্য কোন রকম প্রতিবন্ধক — তার ফলে কেউ কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে সহায়তা করতে অসমর্থ। এমনও হতে পারে যে সরাসরিভাবে কেউ কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে যুক্ত হলে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে নানারকম ওজর আপত্তি আসতে পারে, অথবা নানা রকমের বাধাবিপত্তিও দেখা দিতে পারে। কারও যদি এইরকমের সমস্যা থাকে, তাঁর প্রতি উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁর কর্মের সঞ্চিত ফল কোন সৎ উদ্দেশ্যে তিনি অর্পণ করতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে এই ধরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, **কৃষ্ণভাবনামৃত কার্যকলাপে নিরুৎসাহী লোকেরা হাসপাতাল অথবা অন্য কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করে থাকেন। এভাবেই তাঁরা বহু কষ্টে উপার্জিত অর্থ দান করার মাধ্যমে তাঁদের কর্মের ফল দান করে থাকেন।** এই পন্থাকেও এখানে অনুমোদন করা হয়েছে, কারণ এভাবেই কর্মফল দান করার মাধ্যমে চিত্ত ক্রমশ নির্মল হতে থাকে এবং চিত্ত নির্মল হলে কৃষ্ণভাবনার অমৃত উপলব্ধি করা যায়। কৃষ্ণভাবনামৃতই কেবল চিত্তকে নির্মল করতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণের পথে যদি কোন প্রতিবন্ধক দেখা দেয়, তাহলে কর্মফল ত্যাগ করার পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই সূত্রে সমাজ-সেবা সম্প্রদায়-সেবা, জাতির সেবা, দেশের জন্য ত্যাগ-ধর্ম প্রভৃতি আদি গ্রহণ করা যেতে পারে, যাতে এইভাবে কর্মফল ত্যাগ করার পরিণামে কোন এক সময়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীতে হওয়া যায়।

"তুমি যদি এই প্রকার অভ্যাস করতে সক্ষম না হও, তাহলে জ্ঞানের অনুশীলন কর। জ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান থেকে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কেন না এইরকম কর্মফল ত্যাগে শান্তি লাভ হয়।" (ভ.গী. ১২/১২)

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তি দুই রকমের ঃ বৈধীভক্তির পন্থা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি আসক্তি-জনিত প্রেমভক্তির পন্থা। যাঁরা ভক্তিযোগের বিধি-নিয়মগুলি আচরণ করতে অসমর্থ, তাঁদের পক্ষে জ্ঞানের অনুশীলন করাই শ্রেয়, কারণ জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। জ্ঞানের প্রভাবেই তাঁরা ধীরে ধীরে ধ্যানের স্তরে উন্নীত হতে পারেন এবং ধ্যানের প্রভাবে ধীরে ধীরে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেন।

যদি কেউ এভাবে ধ্যান করতে সক্ষম না হন, তাহলে বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করা যেতে পারে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মফল ত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ কোন সৎ উদ্দেশ্যে কর্মফল নিবেদন করতে হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, জীবনের পরম উদ্দেশ্য, ভগবানের সমীপবর্তী হওয়ার দুটি পন্থা আছে — একটি হচ্ছে (১) ক্রমিক উন্নতি সাধন এবং অপরটি হচ্ছে (২) সরাসরি পন্থা। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগ হচ্ছে সরাসরি পন্থা এবং অপরটি হচ্ছে কর্মফল ত্যাগের পন্থা। এইভাবে কর্মফল ত্যাগের ফলে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, তারপর ক্রমান্বয়ে ধ্যানের স্তরে, তারপরে পরমাত্মা উপলব্ধির স্তরে এবং সবশেষে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধির স্তরে। এখন, কেউ ধাপে ধাপে এগোতে পারেন, অথবা সরাসরি গ্রহণ করতে পারেন।

সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণে মন নিমগ্ন করা, অনন্যচিত্ত হওয়া

ভক্তিযোগের বিধিনিয়মগুলি অনুশীলন

শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম করতে চেষ্টা করা ও পূর্ণতার স্তরে উন্নীত হওয়া

নিজকৃত কর্মের ফল ত্যাগ করা ও আত্ম-তৃপ্ত থাকা

নিজের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য জ্ঞান অনুশীলন করা

অবশ্য জ্ঞানের থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, আর ধ্যানের থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে কর্মত্যাগ।

সরাসরি পন্থাটি গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই ক্রমিক উন্নতির পন্থা গহণ করাই মঙ্গলজনক। কিন্তু এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, ভগবান অর্জুনকে পরোক্ষ পন্থাটি গ্রহণ করার নির্দেশ দেননি, কারণ তিনি ইতিপূর্বেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু যাঁরা ভক্তিযোগে যুক্ত হয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে পারেননি, তাঁদের জন্যই কেবল এভাবে বৈরাগ্য, জ্ঞান, ধ্যান, ব্রহ্ম-উপলব্ধি, পরমাত্মা-ধ্যান-আদির মাধ্যমে ক্রমিক উন্নতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ভগবদ্গীতায় প্রত্যক্ষ পন্থার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেককে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে সকলেই যেন এই সরাসরি পন্থা অবলম্বন করে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করেন।

ভক্তিযোগ ঃ সকল যোগের চরম পরিণতি

আমরা যখন 'যোগ' শব্দটি বলি, তখন তার অর্থ বোঝায় আমাদের চেতনাকে সর্বোচ্চ পরম তত্ত্বের সংগে যুক্ত করা। উদ্দেশ্য একই — পরমতত্ত্বের সংগে জীব-চেতনার সংযুক্তিসাধন; এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন নামকরণ হয় বিভিন্ন ধরণের পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে (কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ)। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন॥

— ভ.গী. ৬/৪৬

"যোগী তপস্বীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সকাম কর্মীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জুন, সর্ব অবস্থাতেই তুমি যোগী হও॥"

আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান ব্যতীত তপশ্চর্যার কোন তাৎপর্য নেই। ভগবানে শরণাগতি না হলে গবেষণামূলক জ্ঞানও সম্পূর্ণ নিরর্থক। আর কৃষ্ণভাবনা-বিহীন সকাম কর্ম কেবল সময় নষ্ট করারই নামান্তর। তাই, সমস্ত যোগের মধ্যে ভক্তিযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। পরবর্তী শ্লোকে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

(ভ.গী. ৬/৪৭)

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্‌গত চিত্তে আমার ভজনা করছেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেটিই আমার অভিমত।"

উপরের শ্লোকের 'ভজতে' শব্দটিকে 'পূজা' করা অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু 'পূজা করা' ও 'ভজনা করা' — এই দুটি শব্দ সমার্থক নয়। **পূজা করার অর্থ যোগ্য সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন ও অভিবাদন করা। কিন্তু ভজনা করার অর্থ হচ্ছে প্রেম ও ভক্তি সহকারে সেবা করা, যা কেবল পরমেশ্বর ভগবানেই প্রযোজ্য।** পূজ্য ব্যক্তিকে অথবা দেবতাকে পূজা না করলে মানুষ কেবল শিষ্টাচারহীন অভদ্র বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু ভক্তি ও ভালবাসার সংগে ভগবানের সেবা না করা নিন্দনীয় অপরাধ। **সুতরাং পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রেই কেবল 'ভজনা' শব্দটি প্রযোজ্য, কিন্তু 'পূজা' শব্দটি দেব-দেবী ও অন্যান্য মহৎ জীবের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।**

আদর্শ যোগী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর বলা হয়, কারণ তাঁর অঙ্গকান্তি জলভরা মেঘের মতো নীলাভ, তাঁর পদ্মের মতো মুখারবিন্দ সূর্যের মতো প্রফুল্লোজ্জ্বল, তাঁর বসন মণি-রত্নের দ্বারা বিভূষিত, তাঁর শ্রীঅঙ্গ ফুলমালায়, কুসুমাভরণে সুশোভিত। তাঁর দিব্য অঙ্গকান্তি-প্রভায় সর্বদিক উদ্ভাসিত, যাকে বলা হয় ব্রহ্মজ্যোতি। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীবরাহদেব এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি অবতরণ করেন। তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী। তিনি মাতা যশোদার নন্দনরূপে একজন মানুষের মতো আবির্ভূত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, বাসুদেব আদি নামে পরিচিত হন। তিনি হচ্ছেন আদর্শ সন্তান, আদর্শ পতি, আদর্শ সখা, আদর্শ প্রভু। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এবং অপ্রাকৃত গুণাবলীতে বিভূষিত। ভগবানের এই স্বরূপ যিনি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন, তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ যোগী। **যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধির এই স্তর লাভ হয় ভক্তিযোগের মাধ্যমে। সমস্ত রকম যোগ সাধনার চরম পরিণতি হচ্ছে ভক্তিযোগ।**

অন্য সমস্ত যোগ-পদ্ধতি হচ্ছে এই স্তরে উন্নীত হওয়ার উপায়-স্বরূপ। অন্য সমস্ত যোগ-পন্থাগুলি হচ্ছে ভক্তিযোগ-রূপ গন্তব্যে উপনীত হওয়ার ক্রম বা ধাপ। কর্মযোগের শুরু থেকে ভক্তিযোগের শেষ পর্যন্ত ক্রমগুলি আত্মোপলব্ধি লাভ করার একটি দীর্ঘ পথ। ভক্তিযোগের সর্বোচ্চ স্তর লাভের দুটি উপায় রয়েছে ঃ (১) ক্রমিক উন্নতি সাধন (২) প্রত্যক্ষ পন্থা।

১. <u>ক্রমিক উন্নতি সাধন</u> ঃ ভক্তিযোগের ক্রমিক উন্নতিসাধনের সংগে সম্পর্কিত ক্রমগুলি নীচের লেখচিত্রে প্রদর্শিত হল ঃ

২. <u>প্রত্যক্ষ পন্থা</u> ঃ ভক্তিযুক্ত সেবানুশীলন হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির প্রত্যক্ষ পন্থা। এই পন্থায় দুটি স্তর রয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্মল করে তোলার জন্য সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে ভক্তিযোগের বিধিনিয়মগুলি অনুশীলন হচ্ছে প্রথম স্তর। এই স্তরকে বলা হয় ঃ **বৈধী ভক্তি**। এই স্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তি বা আসক্তি বিকশিত হয়। দ্বিতীয় স্তরে, যখন ঐ আসক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক অপ্রাকৃত প্রেমে পরিণতি লাভ করে, তখন সেই ভক্তিযোগী ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সংগে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে যুক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের এই স্তরকে বলা হয় **রাগানুগা ভক্তি**। ভক্তিযোগ হচ্ছে একমাত্র পন্থা, যেখানে উদ্দেশ্য ও উপায় এক ঃ এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তি, উপায়ও ভক্তি। **অষ্টাঙ্গ-যোগ, জ্ঞানযোগ** প্রভৃতি অন্যান্য যোগপন্থায় উদ্দেশ্য ও উপায় আলাদা।

এইভাবে, পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, সমগ্র যোগ পন্থাকে একটি সিঁড়ির সঙ্গে তুলনা করা যায়, যা ক্রমান্বয়ে আমাদেরকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংগে যুক্ত করে। সেই পরম বস্তু, পরমপুরুষ ভগবানকে লাভ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই যোগের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে হবে, যা হচ্ছে ভক্তিযোগ।

কিন্তু একটি বাড়ীর সর্বোচ্চ তলে ওঠার জন্য যদি এলিভেটর বা লিফ্‌ট্‌ থাকে, তাহলে আর অযথা সিঁড়ি দিয়ে ওঠার প্রয়োজন কোথায়? লিফ্‌টের দ্বারা বাড়ীটির মাথায় ওঠা কেবল কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। **ভক্তিযোগ**

চতুর্থ ধাপ ঃ
অষ্টাঙ্গ যোগ + শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবা ▶ — **ভক্তিযোগ**

তৃতীয় ধাপ ঃ
কর্মফলত্যাগ + জ্ঞান + অষ্টাঙ্গ পথে মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযম + হৃদয়ে স্থিত পরমাত্মার ধ্যান ▶ — **অষ্টাঙ্গযোগ/ধ্যানযোগ**

দ্বিতীয় ধাপ ঃ
কর্মফল ত্যাগ + ব্রহ্ম সম্বন্ধে জল্পনাত্মক জ্ঞান + তপশ্চর্যা ▶ — **জ্ঞানযোগ**

প্রথম ধাপ ঃ
নিজকৃত কর্মের ফল ত্যাগ ▶ — **কর্মযোগ/নিষ্কাম কর্ম**

শূন্য ধাপ ঃ
স্বর্গাদি উচ্চলোক লাভের অভিলাষে যজ্ঞাদি সকাম কর্ম অনুষ্ঠান; শাস্ত্র নির্দেশ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ▶ — **কর্মকাণ্ড**

প্রত্যক্ষ পন্থা } বৈধী + রাগানুগা

হচ্ছে ঐ লিফ্‌টের মতো, প্রত্যক্ষ পন্থা, যার সাহায্যে আমরা ধাপে ধাপে এগোতে পারি, আবার সরাসরিও যেতে পারি। কলিযুগের এই অস্থির পরিবেশে মানুষ স্বল্পায়ু এবং সর্বদাই নানাভাবে উপদ্রুত ও উদ্বিগ্ন। কলিযুগের যুগাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে এইরকম একটি এলিভেটর দিয়েছেন, যার সাহায্যে আমরা অবিলম্বে ভক্তিযোগের স্তরে উপনীত হতে পারি — সেটি হচ্ছে অনুক্ষণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ-কীর্তন ঃ *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥*

ভক্তিযোগের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভক্ত্যাঙ্গ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান শ্রবণ। মনকে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত করতে এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অপ্রাকৃত পন্থা। কেউ যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী সদাচারী ভগবদ্ভক্তের নিকট থেকে যতই শ্রবণ করতে থাকেন, ততই তাঁর হৃদয় জ্ঞান-দীপ্তিতে উজ্জ্বল হতে থাকে এবং যা-কিছু কৃষ্ণ হতে তাঁর মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করে, তার প্রতি তিনি অনাসক্ত হয়ে উঠতে থাকেন। *এটি হচ্ছে ঠিক সুদক্ষ চিকিৎসা ও উপযুক্ত পথ্যের দ্বারা রোগ আরোগ্যের মতো। বিষয়মদোন্মত্ত মনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণমহিমা ও অপ্রাকৃত কার্যাবলীর কথা শ্রবণ হচ্ছে সুদক্ষ চিকিৎসা, আর শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত প্রসাদান্ন জড় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত পথ্য।*

কৃষ্ণভাবনামৃতের এই চিকিৎসাপন্থা কলিযুগের জন্য প্রকৃত ও সর্বোচ্চ যোগপন্থা। এইরকম অনুশীলনকারী ধীরে ধীরে কলুষমুক্ত, নির্মল হয়ে ওঠেন এবং শুদ্ধ ভক্তিযুক্ত সেবার স্তর লাভ করেন; তখন তার মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী প্রকাশিত হতে শুরু করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা বর্ণনা করেছেন ঃ

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

— ভ.গী. ১২/১৩-১৪

"যিনি সমস্ত জীবের প্রতি দ্বেষশূন্য, বন্ধু-ভাবাপন্ন, কৃপালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহঙ্কার, সুখে ও দুঃখে সম-ভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সর্বদা ভক্তিযোগে যুক্ত, সংযত-স্বভাব, দৃঢ় সংকল্পযুক্ত এবং যাঁর মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।"

শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গে আলোচনা করে এখানে ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের আরো যোগ্যতা ও গুণাবলী ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

● একজন শুদ্ধভক্ত কোনো পরিস্থিতিতেই বিচলিত হন না। তিনি কারো প্রতি ঈর্ষান্বিতও নন — শুদ্ধ ভক্ত নির্মৎসর। তিনি তাঁর শত্রুরও শত্রু নন; তিনি ভাবেন, *"এই ব্যক্তিটি আমারই কৃত অতীতের মন্দ কর্মের জন্য এখন আমার শত্রু হিসাবে আচরণ করছে। সুতরাং প্রতিবাদ না করে কষ্ট সহ্য করাই শ্রেয়।"*

● ভক্ত যখনই কোনো সংকট বা বিপদে পতিত হন, তখন তিনি মনে করেন যে সেটি হচ্ছে তাঁর প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ। তিনি চিন্তা করেন, *"আমার অতীতের কুকর্মদেরকে ধন্যবাদ! এগুলির জন্য আমার অনেক অনেক বেশি কষ্ট পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের অসীম অনুগ্রহে আমি আমার প্রাপ্য শাস্তি অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে পাচ্ছি। ভগবৎ-কৃপায় আমার শাস্তি অনেক লঘু হয়ে গেছে।"* সেজন্য সমস্ত পরিস্থিতিতে, সংকটে ভক্ত ধীর, শান্ত ও ধৈর্যশীল থাকেন। তিনি তাঁর শারীরিক দুঃখকষ্টের প্রতিও উদাসীন থাকেন, কেননা তিনি জানেন যে তিনি জড় দেহ নন, এবং জড় দেহে বাস সবসময়ই বিপজ্জনক। ভক্ত প্রত্যেকের প্রতি সদয়, করুণাশীল, এমনকি তাঁর শত্রুর প্রতিও। সেজন্য, তিনি নির্বৈর, শত্রুহীন।

● ভক্ত 'নির্মম', মমত্ববুদ্ধি রহিত। তিনি জানেন যে সবকিছুই ভগবানের সম্পত্তি, সেজন্য অনেক জড়সম্পদের অধিকারী হলেও ভক্ত অন্তরে নিরাসক্ত, নিস্পৃহ থাকেন। তিনি নিরহঙ্কার; তিনি জড়দেহের সংগে নিজেকে এক করে দেখেন না, সেজন্য তিনি মিথ্যা অহঙ্কার থেকে মুক্ত। তিনি মানে ও অপমানে অবিচলিত, সমবুদ্ধি; সুখে দুঃখে সমচিত্ত।

● শুদ্ধভক্ত সহনশীল; এবং তিনি সন্তুষ্টচিত্ত। ভগবানের কৃপায় তিনি যা পান, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন — তিনি যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট। কোনো কিছুর জন্য শোক করেন না, আবার কিছু পাওয়ার জন্য তিনি প্রবল প্রয়াস করেন না, সেজন্য তিনি সবসময়ই আনন্দময়। তিনি শুচি, দক্ষ, উদাসীন নিরপেক্ষ।

● তিনি একজন দৃঢ়চিত্ত যোগী, কেননা তিনি তাঁর শ্রীগুরুদেবের নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা-নির্দেশের প্রতি সর্বদাই দৃঢ়নিষ্ঠ, অবিচলিত থাকেন, এবং তার ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণভাবে তাঁর বশীভূত। তিনি দৃঢ়সংকল্প। মিথ্যা তর্কজালে তিনি বিভ্রান্ত হননা। কেউ তাঁকে তার ভক্তিযোগের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। তিনি পূর্ণরূপে অবগত যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন শাশ্বত পরমপুরুষ, তাঁর নিত্য প্রভু, সেজন্য কেউই তাকে ভক্তিপথ থেকে বিচলিত করতে পারে না।

এই সমস্ত গুণাবলী তাঁর মন ও বুদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি নিবদ্ধ করতে সমর্থ করে। ভক্তির এইরকম উন্নত স্তর নিঃসন্দেহে খুবই বিরল, কিন্তু কেবল ভক্তিযোগের বিধিনিয়মগুলি অনুশীলনের ফলে ভক্ত ঐরকম স্তরে স্থিত হন। প্রকৃতপক্ষে, ভক্তকে ঐসব গুণাবলী অর্জনের জন্য পৃথকভাবে বিশেষ প্রয়াস করতে হয় না; ভক্তি অনুশীলনের প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐ গুণগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করে। এভাবে ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্ত সর্বসদ্‌গুণাবলীভূষিত হয়ে ওঠেন। ভগবান এখানে বলছেন যে (১২/১৩-২০) এই রকম গুণাবলীযুক্ত ভক্ত তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, কেননা ভগবান স্বয়ং তাঁর পূর্ণভগবদ্‌ভাবনায় কৃত সমস্ত কার্যকলাপে সর্বদাই প্রীত হন।

মৃত্যুর পর বিভিন্ন যোগীর গতি

❑ ধ্যানযোগী

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ***"যিনি মৃত্যুর সময় অচঞ্চল চিত্তে, ভক্তি সহকারে, পূর্ণ যোগশক্তির বলে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপন করে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনি অবশ্যই সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন।"*** (ভ. গী- ৮/১০) **'প্রয়াণকালে'** শব্দটির অর্থ হচ্ছে **"মৃত্যুর পর"**। এই জীবন হচ্ছে সেই চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রস্তুতি, যাকে বলা হয় মৃত্যু। এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হলে আমরা চিন্ময় জগতে অমৃতময় জীবন লাভ করতে পারি।

দেহত্যাগ-কালে যোগী তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি রুদ্ধ করেন, যাকে বলা হয় **'প্রত্যাহার'**। তিনি ওঙ্কার ধ্বনি-তরঙ্গ শ্রবণে মন নিবদ্ধ করেন, ঠিক তেমনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ থেকে নিবৃত্ত করতে হয়। মনকে **তখন হৃদয়ে বিরাজিত পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর রূপে নিবদ্ধ করতে হয়।** এইভাবে ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধ করে যোগী তাঁর মনকে সংবদ্ধ করেন, তারপর তিনি মস্তকের শীর্ষে সহস্রারে প্রাণ-বায়ুকে আকর্ষণ করেন, এবং কোথায় যাবেন তা স্থির করেন। এই জড়জগতে অগণিত গ্রহলোক রয়েছে, আর জড়জগতের পরপারে রয়েছে অন্তহীন চিন্ময় জগৎ। যোগী এই সব গ্রহলোক সম্বন্ধে জানতে পারেন বৈদিক শাস্ত্র থেকে। ***উচ্চতর গ্রহলোক লাভ করতে হলে সেই গ্রহে বসবাসের উপযোগী দেহ লাভের প্রয়োজন হয়। কৃত্রিম, যান্ত্রিক উপায়ে আমরা ঐসব গ্রহলোক লাভ করতে পারি না, কেননা সেখানে বাস করার জন্য উপযুক্ত দেহের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা অল্প কিছুক্ষণের জন্য জলে থাকতে পারি, কিন্তু মাছেরা সেখানে সমগ্র জীবন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। কিন্তু স্থলে, ডাঙায় বাস করার মতো উপযুক্ত শরীর মাছেদের নেই, সেজন্য মাছেরা ডাঙায় বাস করতে পারে না। ঠিক তেমনি কোন একটি উচ্চতর লোকে প্রবেশ হলে একটি উপযুক্ত দেহের প্রয়োজন হয়।***

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ অবশ্য এই জড়জগতের কোনো লোকেই যেতে আগ্রহী নন, কেননা তাঁরা জানেন যে ঐ সমস্ত গ্রহলোকেই চারটি মৌলিক সমস্যা — জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি বিদ্যমান। উচ্চতর গ্রহলোকের অধিবাসীদের আয়ু এই পৃথিবীর অধিবাসীদের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি হতে পারে, কিন্তু পরিশেষে বিনাশ, মৃত্যু সেখানেও রয়েছে। মৃত্যু জড় জীবনের অপরিহার্য পরিণতি। স্বর্গলোক, জনলোক, তপলোক, এমনকি সত্যলোকও মৃত্যু-অধ্যুষিত। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তগণ জড়জাগতিক জীবনে আকৃষ্ট নন — তা বাহ্যতঃ যতই সুখময়, উন্নত হোক না কেন; কৃষ্ণভক্তগণ চিন্ময় জীবনের প্রতি আকৃষ্ট, কেননা চিন্ময় জীবন চারটি মৌলিক দুঃখ থেকে মুক্ত, তা শাশ্বত ও দিব্যানন্দময়।

ষট্‌চক্রযোগ-পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মাকে সহস্রারে স্থাপন করা। সেখান থেকে সিদ্ধি-প্রাপ্ত **ধ্যানযোগী** উচ্চতর যেকোন গ্রহলোকে ইচ্ছানুসারে গমন করতে পারেন। এই ধরণের যোগ সাধনার এই হচ্ছে চরম সিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ***"যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই পরমা গতি লাভ করবেন।"*** (ভ.গী. ৮/১৩) দেহান্তকালে ধ্যানযোগীকে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করতে করতে ওঙ্কার উচ্চারণ করতে হয়।

এইভাবে ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে ও ভগবানকে স্মরণ করতে করতে জড় দেহ ত্যাগ করতে সক্ষম হলে যোগী চিন্ময় জগতে গমন করতে পারেন। এই সমস্ত ধ্যানযোগীগণ পাঁচটি সম্পর্কের মধ্যে শান্ত রতিযুক্ত সম্পর্কে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত; সেজন্য তাঁরা বৈকুন্ঠে গমন করে শান্ত রসোপযোগী দেহ — তৃণ, তরুলতা, বৃক্ষ, গাভী — ইত্যাদির কোন একটি লাভ করে ভগবানের সংগে প্রীতি বিনিময়ের সুযোগ পান।

যোগীদের মধ্যে যারা নির্বিশেষবাদী বা নিরাকারবাদী, তাঁরা অবশ্য অপ্রাকৃত ভগবদ্দাবাস বৈকুন্ঠধাম লাভ করতে পারেন না (কেননা ভগবদ্ধামে ভগবানকে দর্শন তাঁদের অনভিপ্রেত)। **তাঁরা বৈকুন্ঠ গ্রহলোকের বহির্ভাগে, ব্রহ্মজ্যোতির রশ্মিমণ্ডলে অবস্থান করতে থাকেন।** ব্রহ্ম হচ্ছে পরমপুরুষোত্তম ভগবানের দেহনিঃসৃত সর্বব্যাপ্ত চিন্ময় রশ্মিচ্ছটা, ভগবানের অঙ্গপ্রভা। এই ব্রহ্মজ্যোতিতে অবস্থান করলেও কোনো যোগীর, তার আত্মার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হয় না — কেননা প্রত্যেক আত্মাই চির-শাশ্বত সত্তা। নির্বিশেষবাদীরা যেহেতু ব্যক্তিগত রূপ চান না, সেজন্য তাঁরা দেহ-হীন অবস্থায় ব্রহ্মজ্যোতিতে অবস্থান করতে থাকেন, ঠিক যেমন সূর্যরশ্মির মধ্যে কিরণ-কণা ভাসমান থাকে। আমরা, প্রত্যেক জীবাত্মাই স্বরূপতঃ সৎ-চিৎ-আনন্দময়। সেজন্য যারা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে বিরাজ করে, তারা সেখানে "আমি এখন ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছি, এখন আমি সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মের সংগে একীভূত" — এই রকম জ্ঞানে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেও তাঁরা সেখানে নিত্যকাল থাকতে পারে না, কেননা চিদ্বৈচিত্র্য-শূন্য সেই পরিবেশে তাদের সৎ ও চিৎ প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হলেও তাদের 'আনন্দ' প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি হয় না। সেই পরিবেশ দুঃখহীন হলেও সেখানে আনন্দময় প্রীতিবিনিময়ের কোনো সুযোগ নেই।

❑ জ্ঞানযোগী

নির্বিশেষবাদী (নিরাকারবাদী) বা মায়াবাদী হওয়ার ফলে জ্ঞানীগণ দেহান্তে ব্রহ্ম বা চিন্ময় ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করেন। ***জ্ঞানীরা এই মুক্তির অবস্থাকে জলবিন্দুর সমুদ্রে পতন ও বিলীন হওয়া, বা 'সমুদ্রে পরিণত হওয়া'- র সংগে তুলনা করে থাকেন। কিন্তু যদিও জীবসত্তা ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রায় সমভাববিশিষ্ট (Homogeneous) অবস্থায় থাকে, তবুও কারোর স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত হয় না। এটি ঠিক একটি সবুজ গাছে একটি সবুজ টিয়াপাখীর প্রবেশের মতো। যদিও টিয়া পাখীর রঙ সবুজ গাছেরই মতো, এবং মনে হয় যে পাখীটি গাছের সংগে মিশে গিয়েছে, কিন্তু তখনও পাখীটির স্বাতন্ত্র্য, পৃথক ব্যক্তিসত্তা রয়েছে।*** ঠিক তেমনি জীবসত্তার, চিৎ-কণা সমূহের স্বাতন্ত্র্য নিত্য; এমন কি ব্রহ্মজ্যোতির চিন্ময় পরিবেশেও চিন্ময় জীব সত্তার স্বাতন্ত্র্য অটুট থাকে। কখনোই কারোর সত্তাবিলোপ ঘটে না। এটি ভগবদ্গীতা সহ সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত।

এমন কে রয়েছে যে একাকী একটি ঘরে একই বই বছরের পর বছর পড়ে নিজে আনন্দোপভোগ করতে পারে? আমরা কেউ চিরকাল একাকী থাকতে পারি না। তাই ঐ অবস্থায় পড়লে কালক্রমে আমরা প্রত্যেকেই ঐ রকম নিরালা ঘর ছেড়ে কারো সঙ্গ লাভের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হব। অন্যের সংগে আমোদ-প্রমোদ আমাদের অবিচ্ছেদ্য স্বভাবগত প্রবৃত্তি। ভগবানের নির্বিশেষ জ্যোতিঃপ্রভার মধ্যে অবস্থানের অন্তহীন একাকীত্বে অসন্তুষ্ট হয়ে, বৈচিত্র্য সম্ভোগের জন্য পুনরায় মুক্তাত্মাগণ এই জড় জগতে ফিরে আসে। **শ্রীমদ্ভাগবতে** (১০/২/৩২) একথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্তয্যস্তভাবাদ্ অবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্তি-অধো-অনাদৃত যুষ্মদ্ অঙ্ঘ্রয়ঃ॥

"হে অরবিন্দাক্ষ! যারা 'বিমুক্ত হয়েছে' বলে অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়ায় তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। কৃচ্ছ্রসাধন ও কঠোর তপস্যার ফলে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্যন্ত আরোহণ করলেও আপনার শ্রীচরণ সেবায় অনাদর করায়, নিশ্চিতভাবে তাঁরা ভবসাগরে পুনরায় পতিত হন।"

নির্বিশেষবাদীরা হচ্ছে কোনো গ্রহের সন্ধানে মহাশূন্যে পরিভ্রমণরত মহাকাশচারীদের মতো। যদি তারা বিশ্রাম গ্রহণের জন্য কোনো গ্রহ খুঁজে না পায়, তাহলে তাদেরকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। এখানে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে (*পতন্তি অধঃঅনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়*), নির্বিশেষ অব্যক্ত ব্রহ্মবাদীদের অবশ্যই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় — কেননা তাঁরা প্রেম-ভক্তি সহকারে পরমপুরুষ ভগবানের পাদপদ্মের সেবাকে অবহেলা করে। যতদিন আমরা এই পৃথিবীতে থাকি, আমাদের উচিত ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের সেবায় নিয়োজিত থাকা; তাহলে আমরা তাঁর অপ্রাকৃত ধামে প্রবেশ করতে সমর্থ হব। আমরা যদি এইভাবে ভক্তিযোগে প্রশিক্ষিত না হই, আমরা একজন নির্বিশেষবাদী হিসাবে ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করতে পারি, কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার যেকোন সময়ে এই জড় অস্তিত্বে, ভবসাগরে পতিত হবার ঝুঁকি সবসময়ই থেকে যাবে।

গভীর একাকীত্বে অসহিষ্ণু হয়ে আমরা অন্যদের সাহচর্য খুঁজব এবং তার ফলে জড় জগতে আবার আমাদের ফিরে আসতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা চাই তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শাশ্বত সাহচর্য। এই হচ্ছে আমাদের সৎ (শাশ্বত অস্তিত্ব), চিৎ (জ্ঞান), আনন্দ পূর্ণ স্বরূপগত প্রকৃতির উপযুক্ত, সুসমঞ্জস অবস্থান। আমরা যদি নিঃসঙ্গ থাকি, তাহলে আমরা পরমপুরুষ ভগবানের সান্নিধ্য পাই না, ফলে সেই আনন্দচিন্ময় বিগ্রহ পুরুষের আনন্দময় সান্নিধ্য থেকেও বঞ্চিত হই। আনন্দলাভের অভাবে আমরা অস্বচ্ছন্দ অনুভব করি। তখন, আনন্দের পরশ-বঞ্চিত আমরা যেকোন ধরণের সান্নিধ্য, যে কোন ধরণের আনন্দ গ্রহণ করতে ব্যগ্র হব। সেই জন্য সেই নিরালম্ব জ্যোতিতে তদ্গত অবস্থাতেও সঙ্গশূন্য আমরা চরম অসহিষ্ণুতায় একসময় বলতে বাধ্য হব ঃ *"আচ্ছা বেশ, আবার জড়জাগতিক আনন্দই উপভোগ করি বরং।"* নির্বিশেষবাদীদের এই ধরণের অধঃপতনের ঝুঁকি রয়েছে (*অব্যক্তা হি গতি দুঃখং* — 'অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসকদের গতি অবশ্যই দুঃখময়' — ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভ.গী-১২/৫)।

❑ ভক্তিযোগী

জড়জগতে, জড়জাগতিক জীবনে জীব সর্বোচ্চ আনন্দ পায় মৈথুনে। চিজ্জগতে, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে জীবসত্তাসমূহের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে শুদ্ধ প্রেমের বিনিময় হয়, জড় জগতের এই যৌনতা, কাম হচ্ছে তার বিকৃত প্রতিফলন। কিন্তু, যেহেতু ভগবদ্ধামই আমাদের নিত্য শাশ্বত আলয়, সেজন্য আমাদের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ-সৌন্দর্য সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে, আমরা সেই সৌন্দর্য দর্শন করেছি; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই ছিল প্রগাঢ় প্রীতি, প্রেম। কিন্তু যখনই আমরা এই জড়জগতে অধঃপতিত হই, আমরা সেই কৃষ্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য, সেই অপ্রাকৃত রূপ মধুরিমা জড়ের প্রতিফলনে অন্বেষণ করতে থাকি। এই জড়জগত হচ্ছে কৃষ্ণবিস্মৃতির স্থান। আর আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের রূপবল্লরীর ভগ্নাংশ-মাত্রও কারও দেহে দেখতে পাই, তাহলে আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত প্রেমৈশ্বর্য, সকল ভালবাসা উজাড় করে সেই মাংসপেশীময় ভঙ্গুর জড়দেহে অর্পণ করি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রকৃতির নিয়মেই চিত্র যায় বদলে। প্রকৃত প্রেম শাশ্বত, প্রকৃত প্রেমময় জীবন তাই চিজ্জগতে, শাশ্বত ভগবদ্ধামে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। শ্রীকৃষ্ণ সর্বানন্দের আধার, আর আমরা যদি এই জড়জগতেও প্রেমানুরক্তচিত্রে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিজেদের প্রশিক্ষিত করে তুলি, তাহলে মৃত্যুর সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে আমরা অপ্রাকৃত জগতে স্থানান্তরিত হতে সক্ষম হব এবং শ্রীকৃষ্ণের লোক, কৃষ্ণলোকে প্রবেশ করে সর্বানন্দের উৎস, আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য উপভোগ করতে পারব।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/২৯) কৃষ্ণলোক সম্বন্ধে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভিরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রম সেব্যমানম্
গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

"যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে আবৃত, চিন্তামণিকর-গঠিত গৃহ-সমূহে সুরভি, অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করছেন এবং শতসহস্র লক্ষ্মীগণের দ্বারা নিরন্তর সম্ভ্রম সহকারে পরিসেবিত হচ্ছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।"

এইভাবে শাস্ত্রে কৃষ্ণলোকের বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে সমস্ত প্রাসাদ-অট্টালিকাসমূহ চিন্তামণি বা স্পর্শমণি দিয়ে তৈরী। সেখানকার গাছগুলি কল্পবৃক্ষ, অর্থাৎ যেকোন কিছু চাওয়া মাত্রই গোলক-বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষ তা প্রদান করতে পারে। এখানে আমরা একটি আম গাছ থেকে কেবল আমই পেতে পারি, কিন্তু কৃষ্ণলোকে আমরা যা-কিছু বাসনা করব তা যেকোন গাছ থেকে পেতে পারি, কেননা সেখানকার বৃক্ষগুলি সবই কল্পবৃক্ষ। চিদাকাশে, চিন্ময় মহাকাশে স্থিত চিজ্জগতে শ্রীকৃষ্ণের এই নিত্য আলয় কৃষ্ণলোকের উপরোক্ত বিবরণ কেবল আংশিক বর্ণনা মাত্র।

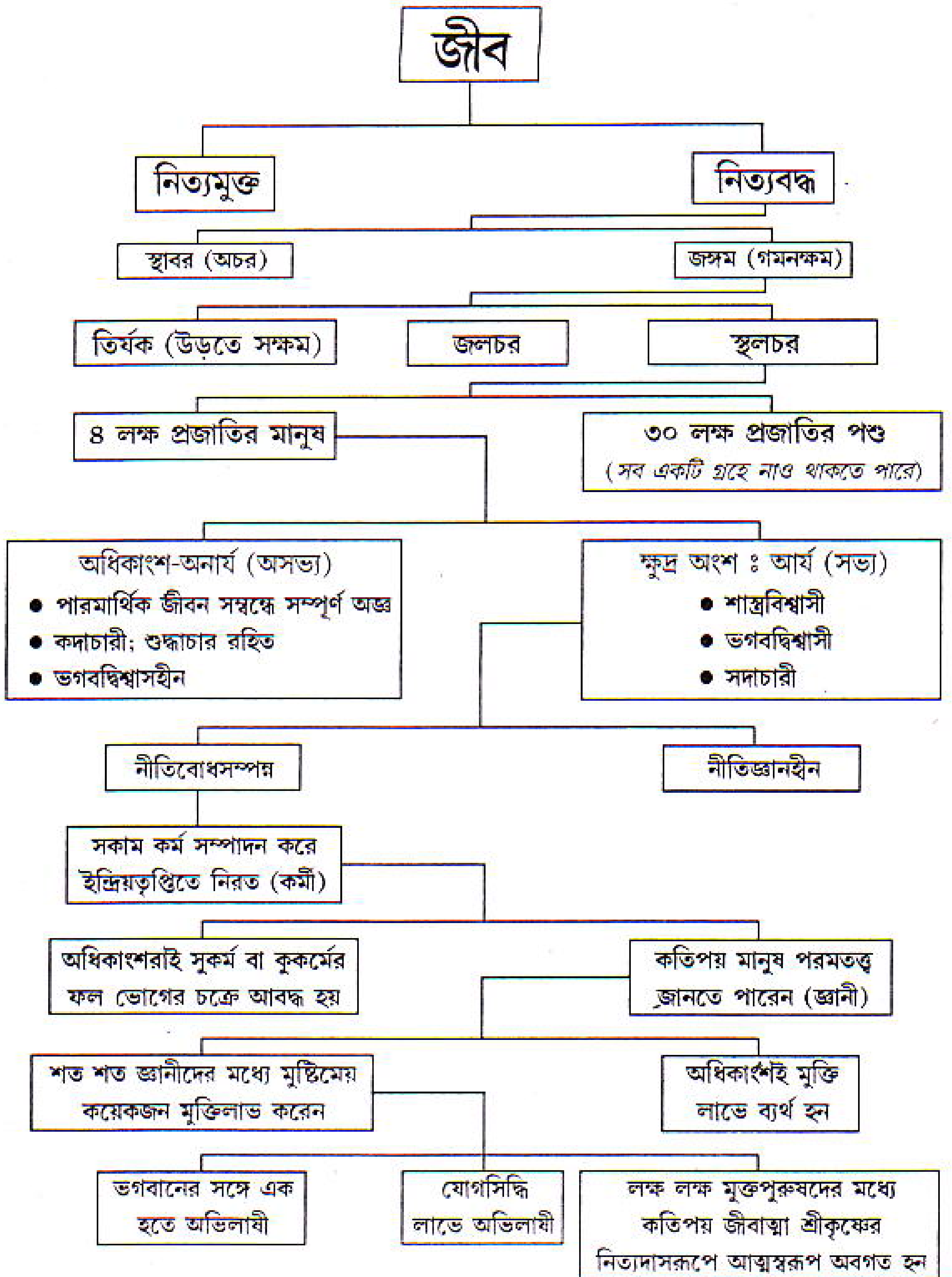
কৃষ্ণভাবনার অর্থ হচ্ছে সবক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর চিন্ময় ধামে গোলক বৃন্দাবনে বাস করা। যেহেতু কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণভাবনাময়, সেজন্য তাঁর ভক্তরা জড় জগতে থাকলেও তারা শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যেই বাস করছে। কেবল জড় দেহটি ত্যাগের অপেক্ষা মাত্র; জড় দেহ বিনাশের পরই কৃষ্ণভক্তগণ-ভগবদ্ধামে ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন। কেননা যেসব অনন্যচিত্ত ভক্ত সতত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকেন, তাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ সুলভ, সুপ্রাপ্য। ***"তস্যাহং সুলভঃ পার্থ", "আমি তাঁদের কাছে অত্যন্ত সহজলভ্য হই।"*** যেহেতু কোন জীব ভক্তিযোগে যুক্ত হয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে সুলভ হন। আমাদের কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র — **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥** প্রতিদিন জপ করতে হবে। মহামন্ত্র জপ করার কোন বাধাধরা বিধিনিয়ম নেই। আমরা আমাদের ঘরে, রাস্তায়, কিংবা অফিসে — যেখানে ইচ্ছা জপ করতে পারি। এর জন্য কোন খরচ নেই, কোন করও দিতে হয় না এজন্য।

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত অনন্যসাধারণ

পাঁচশো বছর পূর্বে আবির্ভূত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের করুণাময় অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ ব্যাখ্যা করে বলেন, কিভাবে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে একজন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত দুর্লভ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য জীব রয়েছে, আর তারা তাদের কর্মানুসারে বিভিন্ন প্রজাতিতে নানা গ্রহলোকে জড় শরীর ধারণ করে চলেছে। এইভাবে তারা স্মরণাতীত কাল ধরে জড় জগতে আবদ্ধ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত জীবসত্তা পরমাত্মার আণবিক অংশবিশেষ।

দুই ধরণের জীব রয়েছে — **নিত্যমুক্ত** ও **নিত্যবদ্ধ**। নিত্যবদ্ধ (জড় জগতে আবদ্ধ জীব) দুই প্রকার ঃ **স্থাবর** এবং **জঙ্গম**। বৃক্ষাদি যেসব জীব চলৎশক্তিরহিত, তারা স্থাবর, আর যারা গমনক্ষম — যেমন পশু, পাখী, তাদের বলা হয় জঙ্গম। এই জঙ্গম জীব আবার তিন ভাবে বিভক্ত — (১) **তির্যক** অর্থাৎ যারা আকাশে ওড়ে, (২) **জলচর** — যেমন মাছ, এবং (৩) **স্থলচর**, যারা স্থলভাগে বিচরণ করে। লক্ষ লক্ষ স্থলচর জীবের মধ্যে একটি নগণ্য অংশ হচ্ছে **মানব** প্রজাতি। মানুষদের মধ্যে আবার অধিকাংশই শুদ্ধাচারহীন, পরমার্থবোধহীন ও নিরীশ্বরবাদী। কার্যতঃ অধিকাংশ


জীব
নিত্যমুক্ত
নিত্যবদ্ধ
স্থাবর (অচর)
জঙ্গম (গমনক্ষম)
তির্যক (উড়তে সক্ষম)
জলচর
স্থলচর
৪ লক্ষ প্রজাতির মানুষ
৩০ লক্ষ প্রজাতির পশু
(সব একটি গ্রহে নাও থাকতে পারে)
অধিকাংশ-অনার্য (অসভ্য)
পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ
কদাচারী; শুদ্ধাচার রহিত
ভগবদ্বিশ্বাসহীন
ক্ষুদ্র অংশ ঃ আর্য (সভ্য)
শাস্ত্রবিশ্বাসী
ভগবদ্বিশ্বাসী
সদাচারী
নীতিবোধসম্পন্ন
নীতিজ্ঞানহীন
সকাম কর্ম সম্পাদন করে
ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে নিরত (কর্মী)
অধিকাংশরাই সুকর্ম বা কুকর্মের
ফল ভোগের চক্রে আবদ্ধ হয়
কতিপয় মানুষ পরমতত্ত্ব
জানতে পারেন (জ্ঞানী)
শত শত জ্ঞানীদের মধ্যে মুষ্টিমেয়
কয়েকজন মুক্তিলাভ করেন
অধিকাংশই মুক্তি
লাভে ব্যর্থ হন
ভগবানের সঙ্গে এক
হতে অভিলাষী
যোগসিদ্ধি
লাভে অভিলাষী
লক্ষ লক্ষ মুক্তপুরুষদের মধ্যে
কতিপয় জীবাত্মা শ্রীকৃষ্ণের
নিত্যদাসরূপে আত্মস্বরূপ অবগত হন
কৃষ্ণভক্ত

মানুষই পশুতুল্য। যারা প্রকৃতই সদাচারসম্পন্ন সভ্য মানুষ, তাদের থেকে এদের বাদ দেওয়া যেতে পারে।

শাস্ত্রবিশ্বাসী ও ভগবদ্বিশ্বাসী এবং সেই কারণে সদাচারী — এমন কতিপয় মানুষ খুঁজে পাওয়াও কঠিন। এইরকম মানুষদের বলা হয় আর্য, যার অর্থ হচ্ছে যারা পারমার্থিক উন্নতির প্রতি যত্নশীল। শাস্ত্রবিশ্বাসী ও ভগবদ্বিশ্বাসী, সুশৃঙ্খল মানুষও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত — **নীতিবোধসম্পন্ন ও নীতিজ্ঞানহীন**। নৈতিক বোধযুক্ত মানুষেরা সাধারণতঃ শাস্ত্রবিহিত সকাম কর্ম করে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সেই কর্মফল ভোগ করে। এইরকম ইন্দ্রিয়ভোগান্বেষী সকাম কর্মকারী বহু বহু মানুষদের মধ্যে কেবল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ পরমতত্ত্ব, ভগবান সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়। এঁদের বলা হয় জ্ঞানী, বা মানসিক জল্পনাকারী দার্শনিক। এইরকম শত শত জ্ঞানীদের মধ্যে কিছু নগণ্য সংখ্যক মাত্র প্রকৃতপক্ষে মুক্তিলাভ করে থাকেন। যিনি মুক্ত অবস্থা লাভ করেন, তিনি তত্ত্বগতভাবে উপলব্ধি করতে পারেন যে জীবাত্মা কোন জড় পদার্থে তৈরী নয়; প্রতিটি জীবসত্তা শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা।

এই সত্যটি কেবল তাত্ত্বিকভাবে যিনি হৃদয়ঙ্গম করেন, তাকে মুক্তাত্মা বলা যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই **যথার্থ মুক্ত, যিনি উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর নিত্য স্বরূপে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাস। এই রকম মুক্তাত্মাগণ দৃঢ় বিশ্বাস** ও ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় নিরত হন। এঁদের বলা হয় কৃষ্ণভক্ত।

কৃষ্ণভক্তগণ সকল জড়বাসনা থেকে মুক্ত। জীবাত্মা জড় বস্তু নয়, কেবল এইটি জেনে যারা মুক্ত অবস্থা লাভ করেছেন, তাঁদের তখনও জড় বাসনা থাকতে পারে, যদিও তাত্ত্বিকভাবে তাঁদের মুক্তাত্মাদের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তাঁদের প্রধান আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হওয়া। কিছু যোগী যোগসাধনার মাধ্যমে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা বা যোগসিদ্ধি অর্জন করতে চান। এইসব ভুক্তি (ভোগেচ্ছা) মুক্তি ও সিদ্ধি বাসনা যতদিন হৃদয়ে থাকে, ততদিন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। আর এইসব ভুক্তি-মুক্তি বাসনায় যারা নিরন্তর উত্তেজিত হতে থাকেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অশান্ত, অধীর।

বাস্তবিকই, যতক্ষণ চিত্তে কোন জড়ীয় বাসনা বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ কখনো শান্তি লাভ করা যায় না। যেহেতু কৃষ্ণভক্তগণ জড়জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থেকে বিমুক্ত, সেজন্য এই জড় জগতে কেবল কৃষ্ণভক্তগণই শান্ত, প্রশান্তচিত্ত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এর সত্যতা সমর্থন করে বলা হয়েছে (৬/১৪/৫) ঃ

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

"হে মহামুনে! কোটি কোটি মুক্তপুরুষ ও সিদ্ধগণের মধ্যে যাঁরা বিশুদ্ধ ভগবদ্ভজনে ব্রতী, তাঁরাই কেবল প্রশান্তচিত্ত। এইরকম ভগবৎ-পরায়ণ ভক্ত জড় জগতে সুদুর্লভ।"

এইভাবে এই জড় জগতে, ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণরত কোটি কোটি জীবগণের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও সদ্‌গুরুর কৃপায় যিনি ভক্তিযুক্ত সেবার বীজ লাভ করেন, তিনি অনন্য সাধারণ ও সৌভাগ্যবান। **একজন পুণ্যবান ও ধার্মিক ব্যক্তি বিভিন্ন মন্দিরে নানা দেবদেবীর পূজায় আসক্ত থাকেন। কিন্তু যদি কোনভাবে দৈবক্রমে — এমনকি অজ্ঞাতসারেও ঐ ব্যক্তি কখনো শ্রীমন্দিরে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেন বা একজন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করেন, তিনি তখন সেই ভক্তি-লতিকার বীজ প্রাপ্ত হন, যার সাহায্যে ক্রমান্বয়ে ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়।**

গীতা প্রতিযোগিতা ঃ পাঁচ

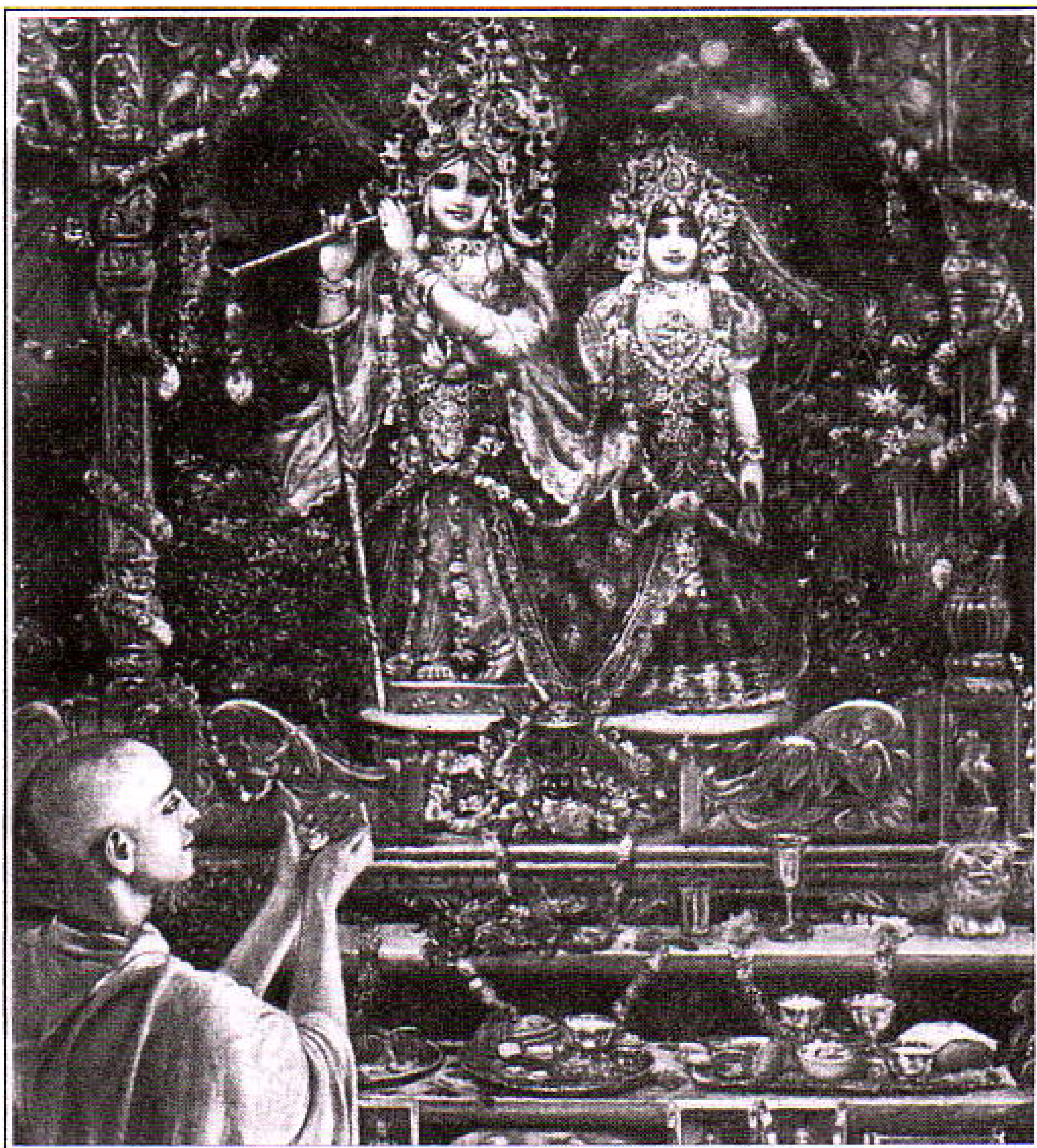
এর জন্য

কিছু প্রাসঙ্গিক শ্লোক

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ গ্রন্থ থেকে
নীচের শ্লোক সমূহ, অনুবাদ ও তাৎপর্য সহ ঃ

- ২/৪০-৪৬, ৩/১৩-১৪, ৬/৩৩-৩৬, ৭/৩, ৭/৭, ৭/১৪, ৭/২৪-২৭, ৮/২৮
- ৯/২-৫, ৯/১১, ৯/১৩-১৪, ৯/২০-২১, ১০/৮-১১, ১২/৮-২০, ১৪/২৭, ১৫/৬

পর্ব ৬ ঃ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভগবদ্গীতার ব্যবহারিক প্রয়োগ



পর্ব ৬ ঃ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভগবদ্গীতার ব্যবহারিক প্রয়োগ

কেন আমরা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করব

আমাদের স্বরূপ

স্বরূপতঃ আমরা দেহ নই — চিন্ময় আত্মা। আমাদের জড় দেহটি অস্থায়ী, নশ্বর, কিন্তু প্রতিটি দেহের অভ্যন্তরে বিরাজিত জীবাত্মা নিত্য, শাশ্বত, চির-অস্তিত্বশীল।

প্রত্যেক জীবাত্মার পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংগে এক শাশ্বত, প্রেমময়, দিব্যানন্দপূর্ণ সম্বন্ধ রয়েছে। আমাদের প্রকৃত জীবন এই জড়জগতে নয় — প্রকৃত জীবন হচ্ছে আমাদের চিরন্তন আলয় চিন্ময় জগতে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। চিন্ময় ভগবদ্ধাম সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেখানে আনন্দময়তনু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অগণিত প্রেমময় সেবকবৃন্দ দ্বারা পরিবৃত থাকেন, যাঁরা সকলেই সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলুষ শুদ্ধভক্ত। তাঁরা সকলেই সম্পূর্ণরূপে জড় বাসনা, কাম, লোভ এবং ঈর্ষা বা মৎসরতা থেকে বিমুক্ত, নির্মল-চিত্ত।

চিন্ময় জগতের সবকিছু — ভূমি, বৃক্ষরাজি, জল — সমস্তকিছুই চিন্ময়, চেতন এবং আনন্দময়। চিজ্জগতে কোনো দুঃখ-শোক নেই, সেখানে রয়েছে কেবল আবিলতাশূন্য, মধুর অনবচ্ছিন্ন আনন্দোপভোগ; সেই আনন্দ এই জড় জগতের দূষিত চর্ম-মাংস-কেন্দ্রিক পুঁতিগন্ধময় মিথ্যা আনন্দ নয় — তা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য সান্নিধ্যে অনুভূত সারবত্তাপূর্ণ চিন্ময় আনন্দোল্লাস। অন্তহীন সুখোৎসবপূর্ণ সেই আনন্দবিলাসময় ভগবদাবাসে শ্রীকৃষ্ণ শাশ্বত অনন্তকাল তাঁর প্রেমপর ভক্তগণের সংগে পরমাশ্চর্যকর পরমানন্দময় বিচিত্র লীলাবিলাস সম্পাদন করছেন। এটি পরমেশ্বর ভগবানের সংগে নৃত্য, গীত, ক্রীড়া এবং ভোজনের এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দোৎসব।

এই চিন্ময় জগতই সমস্ত জীবের সনাতন, শাশ্বত আলয়। যে সমস্ত জীবাত্মা প্রমত্ততাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষান্বিত, শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, তাঁদেরকে এই জড় জগতে রাখা হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি তাদের স্বরূপ আচ্ছাদিত করে। এই জড়জগত হচ্ছে শাস্তি দ্বারা সংশোধনের জন্য তৈরী একটি কারাগার বিশেষ। বদ্ধ জীবাত্মাগণ এখানে ৮৪ লক্ষ প্রজাতির নানা দেহে বার বার জন্ম-মৃত্যুর দুর্দশা ভোগ করতে থাকে। মায়া-বিমোহিত হয়ে এবং মায়া-বিরচিত কৃত্রিম সম্মানে গর্বস্ফীত হয়ে এখানে বদ্ধ জীব এমনকি বিষ্ঠাভোগী শূকর দেহে অবস্থান করেও নিজেকে সুখী মনে করে। সর্বোচ্চ গ্রহলোক থেকে সর্বনিম্ন লোক — সমগ্র জড় ব্রহ্মাণ্ডই এক দুঃখের মহাসাগর বিশেষ, শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* যাকে *'মৃত্যুসংসারসাগর'*, বলে অভিহিত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ চান না যে আমরা জড়জগতে থাকি। সেজন্য তিনি আমাদের আহ্বান করছেন — আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর সংগে অনন্তকাল পরম সুখে বাস করার জন্য। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনছেন, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* প্রদত্ত তাঁর আমন্ত্রণ-বাণী শ্রবণ করছেন এবং জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবর্তনের মৌল সমস্যাটির সমাধানে প্রয়াসী হচ্ছেন। তাঁরা তাঁদের সুপ্ত কৃষ্ণচেতনা জাগ্রত করার জন্য এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য ভগবদ্ভক্তিময় সেবা অনুশীলন — কৃষ্ণভক্তির পন্থা গ্রহণ করছেন।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে তাঁর সবচেয়ে করুণাপূর্ণ অবতার — 'মহাবদান্য' অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হয়ে কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষা দান করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এজন্য সংকীর্তন আন্দোলনের সূচনা করেন, যা

হচ্ছে ভগবদুপলব্ধির সরলতম, কিন্তু সবচেয়ে আনন্দময় পন্থা। এটি 'কেবল আনন্দকন্দ' — অবিমিশ্র আনন্দের উৎস, কেবল আনন্দময়। কৃষ্ণভাবনামৃত কোনো প্রাণহীন আচার-ক্রিয়া-সর্বস্ব ধর্ম-পন্থা নয়। কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ হচ্ছে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন, দিব্যানন্দে নৃত্য, মহাভোজে সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ আস্বাদন, শুদ্ধ নির্মলাত্মা ভগবদ্ভক্তগণের দিব্য সঙ্গ-উপভোগ, শ্রীবিগ্রহের অনুপম দিব্যাদ্ভুত সৌন্দর্যরাশি অবলোকন, সুগভীর তত্ত্বদর্শন উপলব্ধি, শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত গুণ-মহিমা ও তাঁর পরমাস্বাদ্য লীলাবিলাস-কথা শ্রবণ এবং অন্যদের কাছে তাঁর মহিমা প্রচার। কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ হচ্ছে আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিত অপ্রাকৃত, চিন্ময় জগতের ভাব-অঙ্গীকার। ভক্তি অনুশীলনময় জীবন হচ্ছে এক ক্রমবর্দ্ধমান আনন্দ-সুখোৎসবপূর্ণ জীবন, এবং পরিশেষে এটি আমাদের সেই চরম সিদ্ধি প্রদান করে, যেখানে আমরা প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারি, তাঁর সংগে সরাসরি কথা বলতে পারি। জীবনে পূর্ণতা লাভের জন্য কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন এক পরীক্ষিত, ও প্রামাণিক পন্থা। অতীতে বহু বহু ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে নির্মল, পবিত্র হয়েছেন এবং এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল লাভ করেছেন।

যাঁদের পারমার্থিক বুদ্ধি জাগরিত হয়, তাঁরা পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করেন, এবং এই জীবনকে তাঁদের শেষ জীবনে পরিণত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। ভক্তিময় সেবা অনুশীলন-প্রভাবে ভক্তদের মধ্যে সকল সদ্গুণাবলী বিকশিত হয়। তাঁরা সদয়, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, বিনম্র, সংযত, শান্ত, এবং সকলের কাছে প্রীতিপ্রদ হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণভাবনামৃত এমনকি সকল প্রকার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং ধর্মীয় সমস্যারও সমাধান প্রদান করে। কিভাবে — তা শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীতে পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে ভগবদ্গীতার প্রয়োজন-সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে এ-বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সাধারণ, প্রাথমিক প্রশ্নগুলির — যেমন "আমি কেন একটি মূর্তিকে পূজা করব? আমি জপ করব কেন? কেন আমাকে মাংসাহার বর্জন করতে হবে?" — ইত্যাদির মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন যাতে তাদের কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের গুরুত্ব উপলব্ধি সহজতর হয়।

শ্রীবিগ্রহ আরাধনা

বিগ্রহ কি?

ভগবদ্ভক্তিময় সেবা বা ভজনের নয়টি নির্ধারিত অঙ্গ রয়েছে ঃ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবা (পাদসেবন), পূজা (অর্চনা), সবকিছু শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ ইত্যাদি। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ-রূপে প্রকটিত হন, যাতে করে উপরোক্ত সেবা অনুশীলনের দ্বারা আমরা তাঁর আরাধনায় সমর্থ হই, এইভাবে শুদ্ধতা লাভ করি এবং সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে আমাদের আপন আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি। এইভাবে **বিগ্রহ হচ্ছে মন্দিরে বা গৃহে বিরাজিত ভগবানের শ্রীমূর্তি, যার মাধ্যমে আমরা জড়জগতে থেকেও ভগবানকে দর্শন ও তাঁর সেবা সম্পাদনে সমর্থ হতে পারি।**

বিগ্রহ-আরাধনার যুক্তি ও দর্শনতত্ত্ব

বিগ্রহ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত প্রতিভূ, যাকে বলা হয় অর্চা-বিগ্রহ। এই অর্চা-বিগ্রহ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের এক অবতার। বাজার থেকে কিনে আনা যে-কোন মূর্তি আমরা পূজা করতে পারি না, সেই চেষ্টা নিষ্ফল, কেননা সেটি অর্চা-বিগ্রহ নয়। **অর্চা-বিগ্রহ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক মূর্তি, যা শাস্ত্র-নির্ধারিত উপাদানে নির্মিত এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে একজন শুদ্ধভক্তের দ্বারা যার স্থাপনা ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাঁর শুদ্ধভক্তের আহ্বানে পরমেশ্বর ভগবান এইরকম এক শ্রীমূর্তিতে এসে বিরাজ করতে ও ভক্ত প্রদত্ত নিবেদিত দ্রব্যাদি গ্রহণ করতে সম্মত হন। যদি যথোচিত বিধিনিয়ম অনুসারে এইরকম কোনো শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা করা হয়, তাহলে তা ভগবদ্ভক্তিতে দ্রুত উন্নতি লাভের সহায়ক হয়। কেবল এইরকম শ্রীমূর্তিকে প্রামাণিক অর্চা-বিগ্রহ বলা যেতে পারে।**

কোন রূপের বিগ্রহ আরাধনা করা উচিত?

প্রায়ই দেখা যায় যে মানুষ পাথরের তৈরী নানা আকৃতির মূর্তি তৈরী করে তাদের পূজা করছে। এইরকম মূর্তি-পূজাকে বিগ্রহ-আরাধনা বলে স্বীকার করা যেতে পারে না। পরমপুরুষ ভগবানের নিত্য শাশ্বত রূপ শাস্ত্রসমূহে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটিকমনীয় বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

"মুরলীগান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্ল-চক্ষু, ময়ূর-পুচ্ছ শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর-শরীর কোটি-কন্দর্পমোহন বিশেষ শোভা-বিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।" *(ব্রহ্মসংহিতা ঃ শ্লোক-৩০)*

গোলকে বিরাজিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুপম পরমাদ্ভুত রূপ-শোভা উপরোক্ত শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের এই দিব্য অনবদ্যরূপ কোন জাগতিক সৌন্দর্য মনশ্চক্ষে দেখে তা থেকে কল্পনায় বিরচিত কিছু নয়। প্রামাণিক বহু শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের এই নিত্য রূপ বর্ণিত হয়েছে, যেমন *ব্রহ্মসংহিতায়* (শ্লোক ৩১) ঃ

আলোলচন্দ্রক লসদ্বনমাল্যবংশী —
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

"দোলায়িত চন্দ্রক-শোভিত বনমালা যাঁর গলদেশে, বংশী রত্নাঙ্গদ যাঁর করদ্বয়ে, সর্বদা প্রণয়কেলি—বিলাসযুক্ত যিনি ললিত-ত্রিভঙ্গ, শ্যামসুন্দর রূপই যাঁর নিত্য প্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্তি বা বিগ্রহের রূপ উপরের বর্ণনার অনুরূপ। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সুন্দর, তিনি মুরলীধর, এবং তিনি ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীমায় দণ্ডায়মান। শ্রীবিগ্রহের এই সকল বৈশিষ্ট্যই শাস্ত্র-নির্ধারিত। সুতরাং কেউই স্বকপোল-কল্পিত কোন রূপের মূর্তিকে পূজা করতে পারে না — তা শাস্ত্রবিরুদ্ধ॥ বিগ্রহ শাস্ত্রানুগভাবে নির্মিত হওয়া উচিত এবং পরম্পরা ধারায় আগত কোনো শুদ্ধ ভক্তের দ্বারা ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

মূর্তি পূজা ও বিগ্রহ আরাধনার পার্থক্য

কোনো অর্চা-বিগ্রহের পূজাকে মূর্তি-পূজা মনে করা উচিত নয়। এক টুকরো পাথর মাটি বা ধাতুকে কোনো রূপ দান করে তার মূর্তি তৈরী করা যেতে পারে। কেউ এরকম যে কোনো মূর্তি তৈরী করে তার পূজা করতে পারে। কিন্তু এই পূজা 'বিগ্রহ-আরাধনা' নয়, কেননা ঐ মূর্তি — 'বিগ্রহ' নয়। শাস্ত্রে এই ধরণের পূজা অনুমোদিত হয় নি। মূর্তির সংগে বিগ্রহের পার্থক্য রয়েছে ঃ

- **বিগ্রহের রূপ শাস্ত্রানুমোদিত, শাস্ত্রে প্রদত্ত বর্ণনাসম্মত;**
- **বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও বিগ্রহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হয় কঠোর শাস্ত্রবিধি অনুসারে, ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্তের দ্বারা। এইরকম বিগ্রহই পূজার জন্য অনুমোদিত।**
- **শুদ্ধভক্তের আহ্বানে "আগমনপূর্বক শ্রীভগবান" শ্রীবিগ্রহে বিরাজ করেন এবং বিগ্রহের মাধ্যমে সমস্ত নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করেন, প্রীতি বিনিময় করেন।**

কিন্তু সাধারণ একটি মূর্তি জড় পদার্থের মতোই নিষ্প্রাণ, অচেতন জড়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা রাস্তায় অনেক ডাকবাক্স দেখি। আমরা যদি ঐসব ডাকবাক্সে চিঠি ফেলি, তাহলে অনায়াসে সেগুলি তাদের উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যায়। কিন্তু একই রকমের কোন পুরানো লাল বাক্সে — বা কোনো ডাক বিভাগের অনুমোদিত নয় এমন কোনো ডাকবাক্সে আমরা যদি চিঠি ফেলি, তা হলে সেটি কখনোই পৌঁছবে না গন্তব্যে। ঠিক তেমনি শ্রীকৃষ্ণের প্রামাণিক অনুমোদিত প্রতিভূ হচ্ছে তাঁর শ্রীমূর্তি, শ্রীবিগ্রহ — যাকে বলা হয় অর্চা বিগ্রহ। সংবাদপত্র কাগজের তৈরী, আবার টাকাও কাগজের তৈরী। যদিও দুটিই কাগজের তৈরী, তবুও একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি টাকা-কাগজটির বিশেষ মূল্য জানেন; তিনি জানেন কিভাবে ঐ নোটটি সরকার দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ঠিক তেমনি, অর্চা-বিগ্রহ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদিত প্রতিভূ, এবং বিগ্রহ স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান হতে অ-ভিন্ন, কেননা ঐ শ্রীমূর্তির মাধ্যমে তিনি আমাদের প্রেম ও ভক্তি গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং অর্চা-বিগ্রহ রূপে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান আমাদের মধ্যে বিরাজিত, আমাদের কাছে সুলভ — তাঁকে ভালবাসা যায়, সেবা করা যায় — এমনকি তাঁর সংগে কথোপকথনও করা যায় — উন্নত ভক্তদের কেন্দ্র করে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ অজড়, চিন্ময় হলেও এমনকি জড় চোখ দিয়েও আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি তাঁর শ্রীবিগ্রহের মাধ্যমে।

বিগ্রহ-আরাধনা সম্পর্কে মায়াবাদীর ধারণা

মায়াবাদী কারা?

'মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ'।

— শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, চৈ.চ. ৬/৬৬৯

যারা মায়াবাদ দর্শনে বিশ্বাসী তাদের বলা হয় মায়াবাদী। মায়াবাদ শঙ্করাচার্য-প্রচারিত অদ্বৈতবাদের অপর নাম। বেদান্তের বিকৃত ব্যাখ্যাকে আশ্রয় করে এই মতবাদ গড়ে উঠেছে। এই মতবাদের কোনোই শাস্ত্রীয় ভিত্তি নেই; বেদ-বেদান্তের বিভিন্ন শ্লোক ও শ্লোকাংশের অপব্যাখ্যার মাধ্যমেই এই মতবাদের উদ্ভব।

মায়াবাদ অনুসারে জগৎ মরীচিকাবৎ মিথ্যা; কেবল অচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বিরাজমান; রজ্জুতে সর্প ভ্রম হওয়ার মতো ব্রহ্মকে জগৎ ও জীব বলে ভ্রম হচ্ছে মাত্র। এই মতানুসারে শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে সম্পাদিত সেবামূলক কর্ম (ভক্তি) — সবই হল মায়ার সৃষ্টি। তারা বিশ্বাস করে যে সবকিছুই চরমে "এক" (অদ্বৈত), এবং অধ্যাত্ম-জীবনের চরম লক্ষ্য হল ভগবানের সঙ্গে লীন বা "এক" হয়ে যাওয়া। এদের বলা হয় নির্বিশেষবাদী; অর্থাৎ এদের মতে ভগবান নিরাকার, রূপহীন।

পরমেশ্বর ভগবান হতে মানুষের মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করে, তারা ভগবানের সংগে এক হয়ে যেতে পারে — মানুষকে এইরকম মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এই মায়াবাদ বিশ্বের পারমার্থিক জীবনধারায় এক চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। সেইজন্য বৈষ্ণব আচার্যবর্গ, বিশেষ করে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মায়াবাদের বিরোধিতা করেছেন। বহুবিধ শাস্ত্র-প্রমাণ এবং সাধারণ জ্ঞান-ভিত্তিক যুক্তি-বিচারের সাহায্যে মায়াবাদ-দর্শনের অসংখ্য মৌলিক দোষ-ত্রুটি-অসারতা প্রদর্শন করে তাঁরা যুক্তিপূর্ণভাবে এই মতবাদ খণ্ডন করেছেন।

পরম সত্যের যথার্থ উপলব্ধি হচ্ছে এই যে, সর্বোচ্চ পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি নিরাকার নন, তিনি শাশ্বত কাল তাঁর সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহে বিরাজিত। **ভগবান হচ্ছেন একজন ব্যক্তি** এবং অপর সকল **জীব তার নিত্য সেবক** — এটিই হচ্ছে অপ্রাকৃত পারমার্থিক সত্যের সর্বোচ্চ উপলব্ধি। সেইজন্য আমাদের ভগবান

হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়; আমাদের কেবল বিনম্রচিত্তে ভগবানের অধীনতা স্বীকার করে নিতে হবে, তাঁর শরণাগত হতে হবে।

মায়াবাদীরা শ্রীবিগ্রহের চরণে অপরাধী

মায়াবাদীরা নিরাকারবাদী; তাঁরা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে কোনটি ব্রহ্ম, আর কোনটি ব্রহ্ম নয় — এবং ঐরকম চেষ্টায় তাঁরা তাঁদের সমগ্র জীবন অতিবাহিত করে। তাদের দর্শনের শুষ্কতায় দগ্ধ হয়ে অথবা সারগর্ভহীন দর্শনতত্ত্বের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করে তাঁরা কখনো কখনো ভক্তিমার্গের সহায়তা গ্রহণের চেষ্টা করে।

তাঁরা মূর্তির পূজাও করে থাকে। তাদের ধারণা হচ্ছে, চরমে ভগবান 'নির্বিশেষ', কিন্তু সেই 'নির্বিশেষ' ভগবান মূর্তির মাধ্যমে আমাদের সংগে আদান-প্রদান করতে পারেন। কখনো কখনো এজন্য তারা দেব-দেবীর মূর্তিরও শরণাপন্ন হয় এবং তাদের প্রতি 'ভক্তি' প্রদর্শন করতে থাকে, আর তারা প্রচার করতে থাকে চরমে দেবদেবী ও তাঁদের প্রভু স্বয়ং ভগবান এক; এমনকি তারা নিজেরাও তাদের আরাধ্যের সংগে এক। ভগবানের প্রতি স্বভাবগতভাবে বিদ্বেষপরায়ণ হওয়ায় তারা চরমে কোনো উর্দ্ধতন সত্তার অধীনস্থ হতে চায় না — নিজেদের উপরে কারো স্থান সহ্য করতে পারে না। এইভাবে অদৃশ্য ফল্গুধারার মতো আত্মনাশা মায়াবাদী চিন্তাস্রোত তাঁদের অন্তরে সর্বদা প্রবহমান থাকে; ভক্তির কিছু বাহ্য-প্রদর্শনীর জন্য তারা কোনো দেব-মূর্তিকে ব্যবহার করে থাকে; তাদের ঐ পূজার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহান্তে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া।

মন্দিরে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা মূর্তিপূজা নয়। বৈদিক শাস্ত্র-প্রমাণ অনুসারে বিগ্রহোপাসনা দু'প্রকার হতে পারে ঃ সগুণ এবং নির্গুণ। 'সগুণ' উপাসনার অর্থ হচ্ছে জড়গুণাত্মক বস্তুরাজি যেমন পাথর কাঠ বা তৈলচিত্রাদির দ্বারা তৈরী ভগবদ্বিগ্রহের পূজা — মন্দিরে যেভাবে শ্রীবিগ্রহ আরাধিত হন। 'নির্গুণ' উপাসনার অর্থ "জড় গুণ-শূন্য" আরাধনা, যার অর্থ — "সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়"। মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা হচ্ছে সগুণ আরাধনা, কেননা এখানে জড়বস্তু-সামগ্রীর মাধ্যমে ভগবান প্রকাশিত হন। কিন্তু ভগবানের শ্রীমূর্তি পাথর, কাঠ, ধাতু বা তৈলচিত্রাদি জড় বস্তুরাজির দ্বারা প্রকাশিত হলেও ঐ শ্রীমূর্তি প্রকৃতপক্ষে জড় নয়, তা জড় গুণাশ্লিষ্ট নয়।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অচিন্ত্য শক্তিরাজির অধিকারী, সেজন্য ভগবান যেকোন মাধ্যমের সাহায্যে তিনি আমাদের সেবা গ্রহণ করতে পারেন, এবং তিনি তাঁর নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর বিভিন্ন শক্তির চারিত্রিক রূপান্তর-সাধনও করতে পারেন। তিনি যে শ্রীমূর্তিতে আমাদের সামনে প্রকাশিত হন, তা তাঁর জড়া শক্তি-প্রসূত দ্রব্যাদি (পাথর, ধাতু) দিয়ে নির্মিত, কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছাক্রমে ঐ জড়া শক্তিকে চিন্ময় শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেন। যেহেতু এইসব শক্তিরাজির নিঃসৃত হওয়ার উৎস এক ও অভিন্ন, সেজন্য তাদের উৎসের অভিপ্রায় অনুসারে এই শক্তিরাজির বিভিন্ন প্রকার উপযোগ হতে পারে। এইভাবে, ভগবান সবকিছুর মধ্যেই বিদ্যমান, এবং তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তিরাজির মাধ্যমে তিনি সবকিছু সৃজন করেন।

তাঁর অচিন্ত্য শক্তিবলে শ্রীভগবান তাঁর নিষ্ঠাবান ভক্তের প্রতি প্রীতিপূর্ণ অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য যে কোন স্থানে আবির্ভূত হতে পারেন। একটি জড় বস্তু-রচিত স্তম্ভের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব — নাস্তিক হিরণ্যকশিপুর আদেশে নয় — তাঁর প্রিয় ভক্ত প্রহ্লাদের ইচ্ছায়। একজন নাস্তিক কখনই ভগবানকে অবির্ভূত হবার আদেশ করতে পারে না, ভগবান কেবল তাঁর ভক্তের প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য যে কোন স্থানে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, দৃশ্যত পাথর, মৃত্তিকা, কাঠ, ধাতু, মণিরত্ন প্রভৃতি (সাতটি) উপাদানে তৈরী শ্রীমূতিতে 'অর্চা-বিগ্রহ' রূপে আবির্ভূত হতে পারেন। কাঠ, ধাতু, পাথর প্রভৃতি দৃশ্যত জড় পদার্থে নির্মিত হলেও ভগবানের শ্রীবিগ্রহ 'জড়' নয়, তা সাধারণ মূর্ত্তি নয়।

প্রকৃতপক্ষে, চিন্ময় জগতে ভগবদ্ধামে ভগবানের এক শুদ্ধ, চিন্ময় ব্যক্তিরূপ রয়েছে, যা সৎ-চিৎ-আনন্দময় (*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ*)। আমাদের বর্তমান জড় অস্তিত্বের বদ্ধ দশায় আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে সরাসরি তাঁর দিব্য চিদ্‌স্বরূপে দর্শন করতে পারি না — আমাদের দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতার জন্য। জড় আবরণে আমাদের চিন্ময় ইন্দ্রিয়গুলি আবৃত, আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। তবুও যে সমস্ত ভক্তগণ ভগবানকে তাঁদের জড় দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখতে চান, তাঁদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে ভগবান জড় বস্তু-নির্মিত বস্তুর মাধ্যমে আবির্ভূত হয়ে তাঁর চিন্ময় রূপ-শোভা-মাধুরী প্রদর্শন করেন, ভক্তদের সাথে প্রীতিবিনিময় করেন, তাঁদের সেবা গ্রহণ করেন। এটি ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা ও তাঁর অকুণ্ঠ করুণাপরতার এক উত্তম নিদর্শন। ভগবানের এই শ্রীবিগ্রহের উপাসনা মূর্তি পূজা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এটি স্বয়ং শ্রীভগবানের আরাধনা, যিনি ভক্তের সামর্থ্যের অনুরূপ শ্রীমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন।

জড়া-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কাজ করে থাকে (*'ময়া-অধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ ...'*); সেই জন্য তিনি সেই শক্তির দ্বারা বিন্দুমাত্র না হয়ে সেই শক্তিকে ব্যবহার করে তিনি তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে পারেন। এছাড়া, ভগবান কোনো সময়েই রূপ বা আকার রহিত এক নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় পরিণত হয়ে যান না, কেননা তাঁর পরম স্বরূপে তাঁর ব্যক্তিত্ব শাশ্বত, তিনি আদি পুরুষ। তাঁর নির্বিশেষ বিভাব, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে তাঁরই অঙ্গ-প্রভা (ঠিক যেমন সূর্যদেব ও সূর্যরশ্মি)।

মায়াবাদীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত

সুতরাং এইটি উপলব্ধি করা উচিত যে মন্দিরে বিরাজিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হতে অভিন্ন এবং সেইজন্য মায়াবাদীদের মতো অপরাধমূলক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে শ্রীবিগ্রহের পূজার্চনা করা কখনই উচিত নয়। তাদের সঙ্গও সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে হবে — সবসময়ই এজন্য সতর্ক থাকা উচিত। উপরে যেমন বলা হয়েছে, মায়াবাদীদের অনেক সময় বাহ্যতঃ ভক্ত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাদের আসল ধারণা 'সব কিছুই এক, অদ্বৈত', এমনকি সে নিজেও ভগবানের সংগে এক' — এটি তারা কখনই পরিত্যাগ করে না; বরং এই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা গর্বিত হয়ে তারা যথার্থ ভক্তদেরকে 'ভাববাদী' এবং নিজেদেরকে 'জ্ঞানী' বলে মনে করে। ভগবান সম্বন্ধে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে এই উত্তর মেলে যে *'সবই এক, এবং জীবনের চরম সার্থকতা হচ্ছে দেহান্তে ব্রহ্মে লীন হওয়া'*, তাহলে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারব যে সে মায়াবাদী মতবাদের দ্বারা সংক্রামিত। এটি অত্যন্ত অপরাধমূলক মানসিকতা, কেননা তারা ভগবানের পূজা করছে, কিন্তু একই সাথে ভগবানের পদটি দখল করতে চাইছে, ভগবানের সংগে সমগোত্রীয় হওয়ার চেষ্টা করছে — যদিও বাস্তবে তা কখনো হবার নয়। সুতরাং **বিগ্রহ আরাধনার মাধ্যমে সর্বদাই তাঁর অনুপম রূপ-বৈভব-পূর্ণ সবিশেষ রূপে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা উচিত।** তাহলেই সর্বোচ্চ চিন্ময় গ্রহলোক গোলোক বৃন্দাবনে পরম দুর্লভ গতি লাভ করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্তি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও হতে অভিন্ন

এমন কিছু মানুষ আছে, যাদের আপনি যদি মন্দির দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান তাহলে তারা বলবে, *"ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান। প্রত্যেকের অন্তরেও তিনি রয়েছেন। তাহলে মন্দিরে যাওয়ার প্রয়োজন কোথায়? আমি আমার নিজ অন্তরেও তো তাঁর পূজা করতে পারি? মন্দিরে যেতে হবে কেন?"* আমরা প্রত্যুত্তরে তাদের কাছে এই প্রশ্নটি রাখতে পারি : *"ভগবান যদি সর্বত্র বিরাজমান হন, মন্দিরে এবং তাঁর শ্রীমূর্তিতেও কি তিনি বিরাজিত নন?"* একজন তত্ত্ববিদ্ ভক্ত জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁর স্বধাম গোলক বৃন্দাবনে নিয়ত বিরাজমান, তবুও তাঁর বিভিন্ন শক্তিরাজির বিস্তার এবং তাঁর স্বাংশ প্রকাশের মাধ্যমে তিনি জড় ও চিন্ময় সৃষ্টির সমস্ত অংশে বিদ্যমান রয়েছেন। মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ আরাধনা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্তী হওয়া এবং শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি নববিধা ভক্ত্যাঙ্গের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আমাদের প্রেম

প্রকাশ করার সহজ পন্থা। এইরকম আরাধনার মাধ্যমে আমরা পারমার্থিক জীবনে অগ্রগতি সাধনের জন্য তাঁর করুণা লাভ করতে পারি। সুতরাং আমাদের উচিত নিয়মিত ভগবানের শ্রীমন্দির পরিদর্শন করা, সেখানে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করা, তাঁর সঙ্গে প্রীতি বিনিময় করা এবং কৃষ্ণ-গুণ-মহিমা সম্বন্ধে আরও বেশি করে জ্ঞান লাভের জন্য ভক্তগণের সঙ্গলাভ করা।

শ্রীকৃষ্ণ সকল জীব-সত্তাকে পালন করছেন, এবং তাঁর শক্তি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, তবুও তিনি অন্যত্র অবস্থান করছেন। এই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি। তিনি সর্বত্র রয়েছেন, আবার একই সাথে তিনি সবকিছু হতে দূরে অবস্থান করছেন। আমরা তার শক্তির কার্যকলাপ দর্শন করতে পারি, কিন্তু তাঁকে আমরা আমাদের জড় চোখ দিয়ে সরাসরি দর্শন করতে পারি না। কিন্তু ভক্তিযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা যখন আমাদের চিন্ময় গুণাবলী বিকশিত করি, জড় কলুষ বিশোধিত করে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে পবিত্র করে তুলি, তখন তাঁর এই শক্তির মধ্যেও আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ সর্বত্র রয়েছে, আর একজন বিদ্যুৎ-বিশারদ বা ইলেক্ট্রিসিয়ান ঐ বিদ্যুৎ ব্যবহারে সক্ষম। তেমনি, পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি সর্বত্র রয়েছে, আর আমরা যখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হই, তখন আমরা সর্বত্রই ভগবানকে মুখোমুখি দর্শন করতে পারি (যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে)। ভক্তিযুক্ত সেবা ও ভগবৎ-প্রেম বিকশিত করার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলির 'চিন্ময়ীকরণ' সম্ভব।

ভগবান পরমাত্মা-রূপে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ব্যাপ্ত, আবার একই সাথে সমস্ত জীবের হৃদয়ে, জল, বায়ু প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ — এমনকি প্রতিটি পরমাণুর মধ্যেও তিনি অবস্থান করছেন (*অন্ডান্তরস্থং পরমাণুচয়া-অন্তরস্থং* — ব্রহ্মসংহিতা - ৫/৩৫)। সেই জন্য আমরা যদি মাটি, পাথর, কাঠ, ধাতু, রত্ন প্রভৃতি শাস্ত্র-নির্ধারিত প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ভগবন্মূর্তি-তৈরী করি, তাহলে তাকে একটি পুতুল মনে করা উচিত নয়। সেই মূর্তিও ভগবান। আমাদের যদি যথেষ্ট ভক্তি থাকে, তাহলে ঐ মূর্তি আমাদের সংগে কথাও বলবেন। শাস্ত্র অনুসারে আট ধরণের উপাদানে তৈরী মূর্তির পূজা করা যেতে পারে, কেননা ভগবান সর্বত্র বিরাজিত রয়েছেন। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, ***"কেন আমরা ভগবানের মূর্তি পূজা করব — সরাসরি কেন ভগবানের পূজা করব না — কেন তিনি আমাদের কাছে উপস্থিত হচ্ছেন না?"*** উত্তর হচ্ছে, তিনি সর্বত্র বিরাজিত (পরমাত্মারূপে), কিন্তু আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারছি না আমাদের জড় অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতার জন্য। জড় ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা সরাসরি তাঁর চিন্ময় রূপ দর্শন করতে পারি না। আমাদের জড় চোখে আমরা কেবল পাথর, মাটি, কাঠ, ধাতু — ইত্যাদি স্থূল বস্তু দর্শন করতে পারি যা আলোক প্রতিফলিত করতে পারে। সেজন্য, আমরা যাতে জড় চোখেও তাঁকে দর্শন করতে পারি, এজন্য তিনি আমাদের নয়ন সমক্ষে অর্চা-বিগ্রহ রূপে উপস্থিত হন। ভক্তি-প্রভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে এই **শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ** — কোনো পার্থক্য নেই। আমরা ভক্তিসহকারে তাঁর সেবা পূজায় নিয়োজিত হলে শ্রীকৃষ্ণ ঐ শ্রীবিগ্রহের মাধ্যমে আমাদের সংগে আদানে-প্রদান করেন।

একটি দৃষ্টান্ত ঃ

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ ঃ *শ্রীবৃন্দাবনের গোপাল বিগ্রহের আদেশে তাঁর শ্রীঅঙ্গে লেপনের জন্য উত্তম মলয় চন্দন আনতে গিয়ে উড়িষ্যায় উপস্থিত হন শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী। তিনি অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন, কারও কাছে কিছু চাইতেন না। রেমুনায় শ্রীকৃষ্ণের একটি শ্রীবিগ্রহ মন্দিরে পূজিত হন — শ্রীগোপীনাথ। তিনি শ্রীগোপীনাথকে নিবেদিত ক্ষীর-প্রসাদ*

মূল কথা হচ্ছে, ভগবান হচ্ছেন অদ্বয় তত্ত্ব, পরম তত্ত্ববস্তু (Absolute Truth)। তিনি জড়-দ্বৈততা-বর্জিত চিন্ময় সত্তা। সেজন্য, তাঁর নামের সংগে স্বয়ং ভগবানের কোনো পার্থক্য নেই। তেমনি তাঁর রূপের সংগেও তাঁর কোনো পার্থক্য নেই। ভগবানের নাম-রূপ ও স্বয়ং ভগবান অভিন্ন। তাঁর শ্রীমূর্তি তাঁর রূপকে অভিব্যক্ত করছে। আর সেহেতু ভগবানের রূপ ও ভগবান অভিন্ন, সেজন্য ভগবানের শ্রীবিগ্রহও স্বয়ং ভগবান। চেতনা যতই জড়-কলুষ-মুক্ত হয়, ততই এই সত্য উপলব্ধি করা যায়।

আস্বাদনে অভিলাষী হন — যাতে তিনি শ্রীগোপাল বিগ্রহকে তা নিবেদন করতে পারেন। তিনি ছিলেন অযাচক; সকলের অলক্ষিতে তিনি নিকটবর্তী হাটের একটি কুটীরে রাত্রি যাপন করতে থাকেন। শ্রীগোপীনাথ তাঁর জন্য এক পাত্র ক্ষীর তাঁর বসনের নীচে 'চুরি' করে রেখে দেন, স্বপ্নাদেশ করে রাত্রিতেই পূজারীকে দিয়ে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর নিকট পাঠিয়ে ছিলেন। সেই থেকে তিনি 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' নামে খ্যাত।

প্রসাদ-গ্রহণের পিছনে যুক্তি

একজন কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তের মুখ্য কর্তব্যকর্মের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রসাদ সেবন। এই সেবাটি এমন একটি সেবা যা প্রত্যেককে করতে হয়, এর কোন ব্যতিক্রম নেই। প্রসাদম্ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত খাদ্য। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ এই ব্রত গ্রহণ করেন যে তাঁরা এমন কোনো কিছুই ভোজন করবেন না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যা প্রথমে অর্পিত হয় নি। বাইরে থেকে কেউ হয়ত এমন মনে করতে পারে যে প্রসাদকে অন্য যেকোনো খাদ্যের মতোই মনে হচ্ছে। কিন্তু পার্থক্য বোঝা যায় শুদ্ধতার প্রকাশের মাধ্যমে; যিনি নিয়মিত কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন করছেন, অচিরেই তার চেতনা নির্মল হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শুদ্ধতা প্রকাশিত হতে থাকে।

শ্রীবিগ্রহকে প্রেম ও ভক্তি সহকারে ভোগ নিবেদন

প্রত্যেক জীবাত্মার শ্রীকৃষ্ণের সংগে প্রেমময় সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত। আমরা সেই প্রেম বিস্মৃত হয়েছি, আর এখন এই জড় জগতের কদর্যতায় কলুষিত হচ্ছি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের অন্তরস্থ সুপ্ত ভালবাসার অভিব্যক্তির মাধ্যমে সেই সম্বন্ধের পুনঃস্থাপন করতে হবে। প্রেম-এর অর্থ হচ্ছে কিছু প্রদান বা নিবেদন করা, কিছু উপহার দেওয়া, কিছু উৎসর্গ করা বা ত্যাগ স্বীকার করা। এইগুলি ছাড়া ভালবাসার কোনো অর্থ হয় না। ভালবাসার অর্থ হচ্ছে সক্রিয় সেবা। এমন কেউই বলতে পারে না, 'আমি আপনাকে ভালবাসি। কিন্তু আমি আপনার জন্য কিছুই করতে পারছি না।" তাহলে সেটি ভালবাসা নয়। এমনকি জড় জাগতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে প্রেমের প্রকাশ ঘটে উপহার দান এবং গ্রহণ, খাওয়ানো ও খাওয়া, গোপন কথা বলা ও শোনা, কাজ করে দেওয়া — ইত্যাদির মাধ্যমে। অনেকরকম ভাবে প্রেমকে প্রকাশ করা হয়।

ঠিক তেমনি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও একজন ব্যক্তি। তাঁর সংগে আমাদের প্রীতি-বিনিময় করতে হবে — দ্রব্যাদি নিবেদনের মাধ্যমে। শ্রীকৃষ্ণ একটি অত্যন্ত সরল পদ্ধতির কথা বলেছেন ঃ

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্তি উপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

— (ভ. গী. - ৯/২৬)

"যদি কেউ আমাকে ভক্তি ও প্রেম সহকারে পত্র পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করে, সেই প্রীতিপূর্ণ উপহার আমি গ্রহণ করি।"

ভক্তি সহকারে অর্পণ করলে শ্রীকৃষ্ণ তা গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশিষ্ট সেই আহার্যে মিশ্রিত হয় শ্রীকৃষ্ণের করুণা, অনুগ্রহ; কৃষ্ণে-অর্পিত সেই আহার্য তখন প্রসাদ। প্রসাদ ভোজনের ফলে বিনষ্ট হয় জন্ম জন্ম সঞ্চিত পাপ-কর্ম-ফল-রাশি। ভক্ত জড়কলুষ-মুক্ত হয়ে চিরসুখপূর্ণ দিব্যানন্দময় ভগবদ্ধামে গমন করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য লাভ করে তিনি দিব্যানন্দে নিমগ্ন হন। একজন বুদ্ধিমান মেধাবী ব্যক্তি কেবল উপলব্ধি করতে পারেন এই অত্যাশ্চর্য ফল লাভের গুরুত্ব। এমনকি ধন-জন-যশ-বিদ্যা যোগ্যতাহীন একজন হত দরিদ্র ব্যক্তিও এই অত্যাশ্চর্য ফল লাভ করতে পারেন। একমাত্র যে-যোগ্যতা এক্ষেত্রে প্রয়োজন, তা হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া। গিরিকন্দরে

বহু বছর যোগ-ধ্যান নয়, বেদান্ত-বাগীশও হতে হয় না (তাঁরাও এমন গতি লাভ করতে পারেন না), এই পন্থা এতই সরল যে কেবল শ্রীকৃষ্ণকে তুলসী পাতা, ফল, জল ও পুষ্প অকৃত্রিম প্রীতি সহকারে নিবেদন করলেই তিনি তা গ্রহণ করেন, তৃপ্ত হন, পরিতুষ্ট হন। সেজন্য, কৃষ্ণভক্তি গ্রহণে কারো নিষেধ নেই, কেননা এটি সকলের জন্য সুসাধ্য ও বিশ্বজনীন।

শ্রীকৃষ্ণের কোনো কিছু প্রয়োজন নেই ঃ তিনি সমস্ত কিছুর পরম উৎস

শ্রীকৃষ্ণ কেবল প্রীতি আকাঙ্ক্ষা করেন, অন্য কিছু নয়। তিনি অভক্তের দেওয়া কোনো কিছুই গ্রহণ করেন না। একটি বালক যদি তাঁর পিতার পকেট থেকে পাঁচ টাকা নিয়ে বাজারে যায়, এবং একটি উপহার কিনে তাঁর পিতার জন্ম দিনে তাঁকে প্রীতি সহকারে ঐ সামান্য উপহারটি দেয়, তাহলে পিতা খুশি হয়ে সেটি গ্রহণ করেন, যদিও সেই টাকা পিতারই, এবং ঐ বালকের সবকিছু পিতাই প্রদান করেন। আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কোনো পিতা যখন তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে কিছু লজেন্স দেন, তখন তার একটি শিশু সন্তান একটি লজেন্স এনে যদি তার পিতার মুখে তুলে ধরে, তাহলে পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হন। তেমনি সমস্ত খাদ্য-বস্তু শ্রীকৃষ্ণ থেকেই আসছে; কিন্তু তাঁর ভক্ত যখন তাঁকে সেই খাদ্য-বস্তু প্রীতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন, তখন তিনি প্রীতিপূর্ণ চিত্তে সেই ভক্তিপূর্ণ উপহার গ্রহণ করেন। সুতরাং, প্রয়োজনটি শ্রীকৃষ্ণের নয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ; তবুও তিনি স্নেহ-প্রীতি-বশতঃ তাঁর ভক্ত-দত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করার প্রয়োজনটি আমাদের। এটি ঠিক গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজার মতো। শ্রীকৃষ্ণ সবকিছুই আমাদের প্রদান করেন, তবুও তিনি আমাদের দেওয়া উপহার গ্রহণ করে থাকেন, প্রীতি সহকারে আমরা যখন তা অর্পণ করি।

ভক্তিই হচ্ছে সার তত্ত্ব

ভগবদ্গীতার উপরোক্ত ৯/২৬ শ্লোকে 'ভক্তি' শব্দটি দুই বার ব্যবহৃত হয়েছে — এটাই সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করার জন্য যে ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্তী হওয়ার একমাত্র মাধ্যম। অন্য কোনো যোগ্যতাই এক্ষেত্রে কার্যকরী নয়; ব্রাহ্মণ হওয়া, উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত হওয়া, বিত্তশালী হওয়া, কিংবা একজন মস্ত বড় দার্শনিক হওয়া — কিছুর দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে প্রদত্ত উপহার-দ্রব্য গ্রহণে আকৃষ্ট করা যায় না। ভক্তিই মূল তত্ত্ব — ভক্তি ব্যাতীত অন্য কোন কিছুই শ্রীকৃষ্ণকে কারো নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণে প্রলুব্ধ করতে পারে না।

কি ধরণের যজ্ঞ তাঁর পছন্দ, শ্রীকৃষ্ণ তা প্রকাশ করেছেন

তিনিই একমাত্র ভোক্তা, সকল যজ্ঞ-তপস্যার তিনিই পরম ভোক্তা (*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম ... ভ.গী. ৫/২৯*) — এই সত্যটি উপস্থাপনের পর শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করেছেন, কোন ধরণের যজ্ঞ তাঁর আকাঙ্ক্ষিত। কেউ যদি শুদ্ধতা লাভ ও জীবনের পরম লক্ষ্য — ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্য সেবা লাভের জন্য ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত হতে চান, তাহলে তাঁকে জানতে হবে ভগবান তাঁর কাছ থেকে কি চান। যিনি ভগবানকে ভালবাসেন, তিনি ভগবানকে সেটিই অর্পণ করেন, ভগবান তাঁর কাছে থেকে যা আকাঙ্ক্ষা করেন, এবং ভগবান যা চাননা, ভক্ত তা বর্জন করেন। এইভাবে মাছ, মাংস, ডিম ভগবানকে অর্পণ করা যায় না। তিনি যদি এইসব চাইতেন, তাহলে তিনি তা নির্দেশ করতেন। পরিবর্তে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল তাঁকে নিবেদন করা হোক, এবং তিনি বলেছেন, "আমি এইগুলি গ্রহণ করব।" সেই জন্য, আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে তিনি মাছ, মাংস, ডিম গ্রহণ করবেন না। শাক-সব্জী, শস্য দানা, ফল-মূল, দুধ এবং জল হচ্ছে মানুষের জন্য উপযুক্ত আহার্য, এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এইরকম আহার্য নির্ধারণ করেছেন।

যারা খাদ্য নিবেদনরূপ যজ্ঞ করে না, তাঁরা কেবল পাপ ভক্ষণ করে

বুদ্ধিমান মানুষ উপলব্ধি করেন, *"কিছুই আমার নয়। ফসল হওয়ার জন্য বায়ু, সূর্যালোক ও জল অপরিহার্য, আর এইগুলি সবই প্রকৃতি সরবরাহ করে থাকে। প্রকৃতির উৎস পরমপুরুষ ভগবান, এবং তা ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনকি আমার দেহটিও ভগবানের দান। আমার আত্মাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি। সেইজন্য, আমি অবশ্যই সবকিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করব।"* এই ধরণের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ভক্তিযোগের সূচনা হয়। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

"ভগবদ্ভক্তরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন কারণ তাঁরা ভগবানকে নিবেদন করে অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্ন পাক করে, তারা কেবল পাপ ভোজন করে।"

— (ভ. গী.-৩/১৩)

আহার্য প্রস্তুত হলে, ভগবানকে সেই আহার্য নিবেদন করতে হয়। এই ভোগার্পণ একটি অবশ্য পালনীয় যজ্ঞ। যাঁরা এই যজ্ঞ করে না, ভোগ ভগবানকে না-নিবেদন করে নিজেরাই খেয়ে নেয়, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে তারা আসলে পাপ ভক্ষণ করে। অন্য কথায়, তাদের প্রতিটি গ্রাস তাদেরকে জড়া-প্রকৃতির জটিলতার মধ্যে আরো বেশি বেশি করে বিজড়িত করছে। **পক্ষান্তরে কেউ যদি সব্জী, শস্যদানা, দুধ-ফল দিয়ে সাধ্যমত সুস্বাদু আহার্য প্রস্তুত করে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্তি বা চিত্রের সামনে রেখে তাঁকে প্রণাম করে, সেই যৎসামান্য আহার্য গ্রহণে তাঁর কাছে বিনম্রচিত্তে প্রার্থনা করেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তা গ্রহণ করেন;** তখন শ্রীকৃষ্ণের সেই ভুক্তাবশিষ্ট, সেই যজ্ঞ-শেষ ভোজন করলে ভক্তের দ্রুত পারমার্থিক উন্নতি লাভ হয়, তাঁর সকল সঞ্চিত পাপ কর্মফল ধ্বংস হয়, দেহ-মন শুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তাঁর মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কোষগুলি পরিপুষ্টি লাভ করে, যার ফলে সূক্ষ্ম চিন্তা করা সম্ভব হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত দুধ একটি অলৌকিক খাবার, যার কোনো বিকল্প নেই, যা সমস্ত পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এবং দুধ থেকে কয়েকশ' রকমের সুস্বাদু খাদ্য তৈরী করা যায়। দুগ্ধজাত খাবার শুদ্ধ-সাত্ত্বিক। শ্রীকৃষ্ণকে এমন খাবার অর্পণ করলে তিনি প্রীত হন। যদিও শ্রীকৃষ্ণের কোনো খাদ্যের প্রয়োজন নেই, তবুও কেউ তাঁকে প্রীত করতে চাইলে তিনি তাঁর প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করেন। আহার্য-দ্রব্য সংগ্রহ, প্রস্তুত করা ও নিবেদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা। এজন্য উদ্ধত দুর্যোধন-প্রদত্ত রাজভোগ পরিত্যাগ করে বৃষ্ণিকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ বিদুরদের গৃহে কলার খোসা সাগ্রহে ভোজন করেন — এ-কাহিনী সর্বজন-বিদিত।

শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে আমাদের দেওয়া আহার্য গ্রহণ করেন?

জড় জগতে আমরা আমাদের দেহ থেকে পৃথক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর দেহ অভিন্ন — উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। জড়জগতের বদ্ধ, পতিত জীবদের দেহ ও আত্মা সর্বদাই পৃথক। **চিন্ময় স্তরে দেহ ও আত্মার মধ্যে এই রকম কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, কিন্তু তাঁর প্রতিটি অঙ্গই এক-একটি পূর্ণ-সত্তা। শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় রয়েছে, সেই ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রাকৃত, চিন্ময়, এবং একটি ইন্দ্রিয় অন্যান্য প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের গুণবৃত্তি সম্পন্ন। অন্য কথায়, তাঁর একটি ইন্দ্রিয় অপর যে-কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে সমর্থ। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় পরম তত্ত্ব।** ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি জড়া প্রকৃতির গর্ভে জীব-সত্তা-সমূহকে প্রোথিত করেন। তিনি এটি করেন জড়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ বা চোখের ঈশারার মাধ্যমে। সুতরাং খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর ভক্তের প্রীতিময় প্রার্থনা শ্রবণ করেন—তাঁকে খাদ্যবস্তু নিবেদনের, শেষে তখন তাঁর সেই শ্রবণ সম্পূর্ণভাবে

তাঁর খাদ্য-বস্তু ভোজন ও আস্বাদনের সমার্থক। কোনো পার্থক্য নেই। তাঁকে নিবেদিত বস্তু তিনি কেবল দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে আহার ও আস্বাদন করেন। সেই খাদ্যবস্তু তাঁর অচিন্ত্য শক্তি ও কৃপা-বশতঃ তেমনই থাকে, কেননা তিনি জানেন যে তাঁর ভক্ত পরিশ্রম-পূর্বক সেই খাদ্য সংগ্রহ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর ভক্ত-প্রদত্ত দ্রব্য কিভাবে ভোজন ও আস্বাদন করেন, তা অভক্ত, মায়াবাদী, নাস্তিকেরা কখনই বুঝতে পারে না; কেবল শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় নিজেকে সেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেইভাবে যে ভক্ত তাঁকে গ্রহণ করেন, তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন সে পরম তত্ত্ববস্তু কিভাবে তাঁর ভক্ত প্রদত্ত শাকান্নও সাগ্রহে ব্যাকুল-চিত্তে ভোজন ও আস্বাদন করেন।

ভোগ ঃ শ্রীকৃষ্ণের কাছে আমাদের ভালবাসা পৌঁছে দেওয়ার একটি মাধ্যম।
প্রসাদম্ ঃ আপনার কাছে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পৌঁছানোর এক মাধ্যম

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানের জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত করা হয়, নিবেদনের পূর্বাবস্থায় সেই খাদ্য বস্তুকে বলা হয় ভোগ। এটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রকাশের একটি মাধ্যম। আমরা সুন্দর অন্ন, সব্জী, রুটি, মিষ্টান্ন, মিষ্টি প্রভৃতি অত্যন্ত সুস্বাদু আহার্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করতে পারি, আমরা গ্রীষ্মে তাঁকে শীতল জল বা সরবৎ নিবেদন করতে পারি, শীতে নিবেদন করতে পারি উষ্ণ জল, পানীয়। আমরা সর্বোচ্চ পরিচ্ছন্নতা সহকারে সযত্নে খাদ্য বস্তু প্রস্তুত করে গভীর প্রীতির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করি, শ্রীকৃষ্ণ তা গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের নিবেদন গ্রহণ করে প্রীত হয়ে তিনি আমাদেরকে তাঁর ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে তাঁর প্রসাদ, অর্থাৎ কৃপা প্রদান দ্বারা আমাদের অনুগৃহীত করেন। এটি উপলব্ধি করা কঠিন কিছু নয়। এটি হচ্ছে ঠিক দুজন প্রেমিক-প্রেমিকার প্রীতির আদান-প্রদানের মতো। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভোগ নিবেদন একটি পারমার্থিক কর্ম, এবং শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশিষ্ট — যাকে প্রসাদ বলে আমরা গ্রহণ করে থাকি — আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে পবিত্র করতে সমর্থ — যত কলুষিতই আমরা হই না কেন।

শ্রবণম্ ও কীর্তনম্

বারবার জন্ম-মৃত্যু-রূপ ক্লেশ নিবারণের যথার্থ প্রতিষেধক

শ্রবণম্

ভগবানের **দিব্য নাম শ্রবণ হচ্ছে ভক্তিযোগ অনুশীলনের প্রথম** সোপান। দিব্য কৃষ্ণকথা শ্রবণে আসক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক ধরণের কৃষ্ণ কথা হচ্ছে সরাসরি ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা কথিত বাণী যেমন **ভগবদ্গীতা**। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে যার সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ হোক, তাঁর কাছে আমাদের কৃষ্ণ-উপদেশ প্রচার করা উচিত (*'যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ'*)। আরেক ধরণের কৃষ্ণকথা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথিত আলোচনা, যেমন **শ্রীমদ্ভাগবতে** মহারাজ পরীক্ষিৎকে শুকদেব গোস্বামী বলেছেন। সেখানে তিনি নানা অবতারে ভগবানের অপূর্ব লীলা-কথা বর্ণনা করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ, বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় বিরাজিত কৃষ্ণের বর্ণনা করেছেন। এই সমস্তই কৃষ্ণ-কথা। শুদ্ধ ভক্তের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁরা কেবল অপ্রাকৃত বিষয়-সমূহ নিয়েই আলোচনা করেন। ভক্ত মৌন, কিন্তু তার এই মৌনতার অর্থ হচ্ছে তিনি সকল ধরণের জড়-জাগতিক বাক্যালাপ বর্জন করেন, কিন্তু তিনি সর্বদাই কৃষ্ণ-কথা বলার জন্য সানন্দে প্রস্তুত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভগবদ্গীতায় বলেছেন (ভ.গী. ১০/৯) ঃ

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

"যাঁরা আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছেন, তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা আলোচনা করে এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন।"

শ্রীকৃষ্ণ হতে অবিচ্ছিন্ন গুরু পরম্পরা-ক্রমে আগত একজন শুদ্ধ ভক্তের নিকট থেকে **ভগবদগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত** প্রভৃতি অপ্রাকৃত সাহিত্য নিয়মিতভাবে শ্রবণ করা উচিত। এইসাথে সতর্কতার সঙ্গে অভক্ত ও পেশাদার পাঠকদের কাছ থেকে শ্রবণ বর্জন করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে কেউ যতই শ্রবণ করতে থাকে, ততই ভগবদ্ভক্তিতে তাঁর নিষ্ঠা বর্ধিত হতে থাকে। সর্বদাই ভক্তগণের সান্নিধ্যে ভগবানের কথা শ্রবণ করা উচিত, এর ফলে ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবানুশীলনে দ্রুত উন্নতি করা যায়।

শুষ্ক তর্কযুক্তি বা জ্ঞান-চর্চার মাধ্যমে পরম সত্যকে উপলব্ধি করার প্রয়াস বর্জন করা উচিত। যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছেন, সেই সব মহান ভগবদ্ভক্তগণের দাস হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। কেউ যদি একজন শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করার মতো যথেষ্ট সৌভাগ্যবান হন, তাহলে তিনি নিজেই ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তের স্তরে উন্নীত হতে পারেন। **কোন প্রামাণিক ব্যাক্তির নিকট থেকে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ করার ফলে শ্রবণকারী এই জড় অস্তিত্বের স্তর অতিক্রম করে আপন আলয় অপ্রাকৃত জগতে, ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারেন, ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারেন।**

মন থেকে সমস্ত সংশয় ও কলুষ—যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য — বিশোধিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী অপ্রাকৃত পন্থা। কেউ যত বেশি কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করেন, ততই তিনি জ্ঞানের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকেন এবং কৃষ্ণ থেকে মন বিক্ষেপ করে এমন সমস্ত কিছুর প্রতি তিনি নিরাসক্তি অনুভব করতে থাকেন। ভগবৎ-সম্বন্ধবিহীন কার্যকলাপ থেকে মনকে বিমুক্ত করার দ্বারা অতি সহজেই বৈরাগ্য অভ্যাস করা যায়। **বৈরাগ্যের অর্থ হচ্ছে জড় বিষয়ে নিরাসক্তি এবং চিন্ময় বিষয়ে মনকে নিয়োজিত করা — কৃষ্ণাসক্তি।** এটি হচ্ছে ঠিক একজন ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি গ্রাস খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে যেমন পরিতুষ্টি লাভ করে থাকে, সেই পরিতৃপ্তির মতো। ক্ষুধার্ত মানুষ যতই খেতে থাকে, ততই তার তুষ্টি অর্থাৎ তৃপ্তি অনুভব ও পুষ্টি অর্থাৎ শক্তি লাভ হতে থাকে। ঠিক তেমনি, ভক্তিযুক্ত সেবা সম্পাদন করার ফলে যতই মন জড় জাগতিক বস্তুসামগ্রী থেকে বিমুক্ত হয়ে ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়, ততই সে অপ্রাকৃত সন্তোষ অনুভব করতে থাকে, নিজেকে স্নিগ্ধ, আনন্দোজ্জ্বল বলে অনুভব হতে থাকে। এ-হচ্ছে কিছুটা ঠিক উপযুক্ত পথ্য ও বিশেষজ্ঞের চিকিৎসার দ্বারা কোন রোগ থেকে আরোগ্য লাভের মতো।

রোগ — দেহাত্মবুদ্ধি, নিজেকে জড় দেহের সঙ্গে এক মনে করা;
চিকিৎসা — শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কার্যাবলী শ্রবণ;
যথার্থ পথ্য — শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত খাদ্যবস্তু — প্রসাদ ভোজন।

এই চিকিৎসা হচ্ছে ভক্তিযোগ অনুশীলনের অঙ্গ। শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেন (ভা. ১০.১.৪) ঃ

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোক গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

"পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তিত হয় গুরু-পরম্পরার ধারা অনুসারে। এই জড় জগতের ক্ষণস্থায়ী মিথ্যা গুণকীর্তনে যাঁরা আদৌ আগ্রহী নয়, তাঁরাই ভগবানের মহিমা কীর্তনে আনন্দ লাভ করেন। ভবরোগের অধীনে

যারা জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হচ্ছে, সেই সব দেহবদ্ধ জীবদের পক্ষে ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তন হল যথার্থ ঔষধ। তাই পশুঘাতক বা আত্মঘাতী ছাড়া ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্তনে আর কে-ই বা বিরত হবে?"

মহারাজ পরীক্ষিৎ কেবল ভগবান সম্বন্ধে শ্রবণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পূর্ণতা লাভ করেন।

কীর্তনম্

কীর্তনম্ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের পন্থা। বিশেষতঃ **কলিযুগের এই অধঃপতিত পরিবেশে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনই একমাত্র ফলপ্রসূ পন্থা বলে শাস্ত্রে ঘোষিত হয়েছে।** মহামন্ত্রের '*মহা*' শব্দের অর্থ সবচেয়ে বড়, প্রভাবশালী ইত্যাদি, এবং *মন্ত্র* শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশেষ কোন শব্দ তরঙ্গ, যা মনকে ত্রাণ বা মুক্ত করে (*মন্* + *ত্র*)। কলিযুগে সারা পৃথিবীর মানুষের কীর্তনীয় পরম শক্তিশালী মহামন্ত্র হচ্ছে ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

দিব্যনাম কীর্তনের সপক্ষে শাস্ত্রপ্রমাণ ঃ

কখনো কখনো অনেককে বলতে শোনা যায়, ***"আমি কোন মন্ত্র জপ করতে চাই না। আমি কেবল ধ্যান করতে চাই।"*** দুর্ভাগ্যক্রমে আজকাল অনেক যোগ-প্রশিক্ষণ সংস্থার প্রতি ছাত্রছাত্রীরা আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে, সেখানে তাদেরকে কোন চক্রের কেন্দ্রবিন্দু, অথবা কোন কালো বিন্দু, কিংবা কোন আলোক বা দীপশিখাতে মনঃসংযোগ করতে বলা হয়। কিন্তু এমন করতে গেলে প্রায়ই দেখা যায় যে ধ্যানাভ্যাসকারী সমাধিতে নিমগ্ন হবার পরিবর্তে নিদ্রামগ্ন হয়ে নাসিকা গর্জন করছে। ভগবানকে লাভ করতে হলে যা খুশি তাই করা চলে না, মনের খেয়াল অনুসারে চললে কোন ফল হয় না। পরম্পরা ধারায় আগত গুরুদেবের মাধ্যমে শাস্ত্রোপদেশ অবগত হয়ে পারমার্থিক অনুশীলন করলেই কেবল বাঞ্ছিত ফল লাভ সম্ভব।

চারটি যুগ রয়েছে ঃ **সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ ও কলি যুগ।** প্রত্যেক যুগে আত্মোপলব্ধি লাভের একটি নির্দিষ্ট পন্থা থাকে, যাকে বলা হয় 'যুগধর্ম'। **ভগবানের দিব্যনাম জপ হচ্ছে কলিযুগের যুগধর্ম।** শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে (১২.৩.৫২) ঃ

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥

"সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের মাধ্যমে যজন করে এবং দ্বাপর যুগে অর্চন-আদি করে যে ফল লাভ হত, কলিকালে কেবলমাত্র 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনে সেই সকল ফল লাভ হয়।"

বিষ্ণুপুরাণেও এর সত্যতা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে (৬.২.১৭) ঃ

ধ্যায়ন্ কৃতে যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াম্ দ্বাপরেঃ অর্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্॥

"এই কলিযুগে ধ্যান, যজ্ঞ বা মন্দিরে অর্চনার কোন প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম — হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে — কীর্তন করার ফলে পূর্ণ আত্মোপলব্ধি অর্জন করা যায়।"

কলিসন্তরণ উপনিষদে বলা হয়েছে (২/৭) ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ইতি ষোড়শকম্ নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে॥

"**ষোলনাম-বিশিষ্ট হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র — হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে — কলিযুগের সমস্ত পাপ ও অশুভ কলুষ বিদূরিত করে। দিব্য ভগবৎ-নামকীর্তন ব্যতীত কলিযুগের কলুষমুক্ত হবার আর কোন উপায় নেই — সর্ব বেদে এই সিদ্ধান্তই ঘোষিত হয়েছে।**"

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছেন যে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনই এই যুগের একমাত্র সদ্ বৈশিষ্ট্য ঃ

কলের্দোষনিধে রাজন্ হস্তি একো মহান গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

নাম সংকীর্তন — কলিযুগের যুগধর্ম

কলিযুগের অধঃপতিত মানুষের আচার-আচরণ প্রায় সবটাই আধ্যাত্মিক জীবন লাভের প্রতিকূল। পূর্ববর্তী যুগ-সমূহে মানুষের স্বভাব-ব্যবহার অনেক বেশি পারমার্থিক অগ্রগতির অনুকূল ছিল। সত্যযুগে প্রায় সমস্ত মানুষ ছিল সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, এবং সমাজ ছিল অনেক বেশি শান্ত, সুস্থিত, ধর্মভাবাপন্ন। ওই যুগের যুগধর্ম ছিল ধ্যান। ত্রেতাযুগে বাল্মিকী মুনি তাঁর সুমহান সাহিত্যকর্ম **রামায়ণম্** রচনার পূর্বে ৬০ হাজার বছর ধ্যান করেছিলেন, কর্দম মুনি ধ্যান করেছিলেন ১০ হাজার বছর। প্রতি যুগে মানুষের আয়ু পর্যায়ক্রমিভাবে হ্রাস পেতে থাকে। সত্য যুগে মানুষের জীবনকাল ১ লক্ষ বছর দীর্ঘ হয়, ত্রেতা যুগে দশ গুণ কমে ১০ হাজার বছর; তার দশ গুণ কমে দ্বাপর যুগে মানুষের আয়ু হয় ১ হাজার বছর। কলিযুগে মানুষের গড় আয়ু ১০০ বছর।

ত্রেতা থেকে দ্বাপরে যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের আয়ু হ্রাস পেতে থাকে। এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস করতে বলেন, অর্জুন তাঁর অসামর্থ্য প্রকাশ করে বলেন যে তাঁর পক্ষে ঐরকম যোগাভ্যাস দুঃসাধ্য, অসম্ভব।

এমনকি পূর্ববর্তী ঐ সব যুগে যখন অপেক্ষাকৃত আয়াস-সাধ্য বিভিন্ন যোগ পন্থা অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হত, তখন তার লক্ষ্য ছিল পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি লাভ! এই যুগে ভক্তিলাভের সবচেয়ে অনায়াসসাধ্য পন্থা হচ্ছে সংকীর্তন, অর্থাৎ সমবেতভাবে, সকলে মিলিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন। নাম সংকীর্তনকে কলিযুগের যুগধর্ম বলে শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন *বৃহন্নারদীয় পুরাণে* বলা হয়েছে ঃ

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

"এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা ছাড়া আর অন্য কোন গতি নেই, আর অন্য কোন গতি নেই, আর অন্য কোন গতি নেই।"

দিব্যনাম কীর্তন ঃ আধুনিক যুগের মানুষদের জন্য অত্যন্ত বাস্তবানুগ, সুসাধ্য পন্থা।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে ঃ

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্যঃ কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দঃ সুমন্দমতয়োঃ মন্দভাগ্যা হি উপদ্রুতাঃ॥

"হে মহাজ্ঞানী। এই কলিযুগের মানুষেরা প্রায় — সকলেই অল্পায়ু। তারা কলহপ্রিয়, অলস, মন্দমতি, ভাগ্যহীন এবং সর্বোপরি তারা নিরন্তর রোগাদির দ্বারা উপদ্রুত।"

কীর্তনের পন্থা অত্যন্ত সরল ও মহিমময়। যেকোন স্থানে যেকোন সময় ভগবানের দিব্যনাম জপ বা কীর্তন করা যায়। **গভীর বিনয় সহকারে, নিজেকে তৃণের চেয়েও সুনীচ জ্ঞান করে, বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু হয়ে, মিথ্যা গর্ব, সম্মানেচ্ছা পরিহার করে নিজে অমানী হয়ে অন্য সকলকে সম্মান দানের জন্য প্রস্তুত হয়ে ভগবৎ-নাম কীর্তন বা জপ করলে যে কেউই অত্যন্ত প্রশান্ত ও সুখী হতে পারেন।** এই যোগ্যতাগুলি থাকলে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা আরও সহজ হয়ে ওঠে। অপ্রাকৃত নাম জপ-কীর্তনের এই পন্থা সকলের জনাই সুসাধ্য, যে কেউ এটি সহজেই করতে পারেন।

এমনকি কেউ যদি শারীরিকভাবে অক্ষম হন, অন্যাদের থেকে জাতিগতভাবে নীচ বলে পরিগণিত হন, তার যদি কোন জাগতিক যোগ্যতা না থাকে, অথবা সুকৃতি বা পুণ্য বলও তার না থাকে, তবুও ভগবানের নাম কীর্তন তার জন্য অশেষ কল্যাণপ্রদ। উচ্চকুলে অভিজাত বংশে জন্ম, উচ্চশিক্ষা বা পাণ্ডিত্য, সুশ্রী দেহসৌষ্ঠব, ধনৈশ্বর্য প্রভৃতি পুণ্যকর্মের ফল-সমূহ সবই পারমার্থিক জীবন লাভের জন্য অপ্রয়োজনীয়, কেননা কেবল দিব্যনাম জপের মাধ্যমে সহজেই পারমার্থিক জীবনে অগ্রগতি লাভ করা যায়।

অনেকে প্রশ্ন করেন — কেমন করে একজন কর্মরত ব্যক্তি কাজ করতে করতে একই সাথে নাম জপ করতে পারেন? এটি সম্ভব — প্রেমের মাধ্যমে। শ্রীল প্রভুপাদ এক ব্যক্তির দৃষ্টান্তের দ্বারা এটি বুঝিয়েছেন। ঐ ব্যক্তি অফিসে কাজ করতে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কিশোর বয়স্ক পুত্রটি বাড়ীতে অত্যন্ত অসুস্থ। স্বাভাবিক স্নেহবশতঃ পিতা সর্বক্ষণ চিন্তা করছেন, "আমার পুত্র এখন কেমন আছে?" বৈষ্ণব আচার্যগণ অপর এক দৃষ্টান্তে একজন স্ত্রীলোকের উদাহরণ দিয়েছেন, যে অন্য একজন পরপুরুষের প্রতি আসক্তা স্ত্রীলোকটি এমনকি তাঁর প্রাত্যহিক গৃহকর্মে রত থাকার সময়েও তাঁর প্রেমিকটির কথা ভাবতে থাকে। বস্তুত, সে একটু বেশি যত্ন সহকারেই গৃহের কাজকর্ম করতে থাকে, যাতে তাঁর স্বামী তাকে সন্দেহ না করে। ঠিক তেমনি আমাদের উচিত সর্বদাই পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা, এমনকি নিখুঁতভাবে নৈপুণ্যের সাথে আমাদের জাগতিক কর্তব্যকর্মগুলি সম্পাদন করার সময়েও।

জাগতিক কর্মে গভীর ভাবে নিমগ্ন থেকেও কৃষ্ণভাবনাময় ছিলেন, এমন একজন কৃষ্ণভক্তের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছেন অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণের সখা। আর যিনি তাঁকে ধ্যান বা যোগ সাধনার অজুহাতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন, তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥

"**অতএব, হে অর্জুন, সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব-বিহিত যুদ্ধ কর, তা হলে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পিত হবে এবং নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে।**" (ভ. গী. ৮/৭)

শ্রবণ ও কীর্তনের জন্য তাঁর একেবারেই সময় নেই, কেউই এ-কথা সততার সঙ্গে বলতে পারেন না। এমনকি ব্যস্ততম করিতকর্মা মানুষেরও খবরের কাগজ কিংবা পত্র-পত্রিকা পড়ার জন্য কিছু সময় থাকে, এবং প্রায় প্রত্যেকেই

টিভি দেখার জন্য, কিংবা খোশগল্প করার জন্য বেশ কিছু সময় ব্যয় করে থাকে। এই সময়ের অনেকাংশ ভক্তিযোগ *অভ্যাসে সহজেই নিয়োগ করা যায়। যদি প্রবল চেষ্টাতেও কোন ভক্ত তাঁর পেশাগত ও সামাজিক কর্তব্যকর্মের ভারে* ভক্তিযোগ অনুশীলনের অবসর না পান, তাহলে তার উচিত অন্যভাবে জীবনযাপনের কথা বিবেচনা করা, জীবন যাত্রার ধরণ পরিবর্তন করা। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথাপূর্ণ **শ্রীমদ্ভাগবত** আবৃত্তি করার মাধ্যমে **শ্রীল শুকদেব** কীর্তনের পরম সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

মাংসাহারের কুপরিণাম

মাংস আহার করা উচিত না অনুচিত, সম্ভবতঃ অনেকেই এটা নিয়ে ভেবে থাকেন। এ বিষয়ে যে একটি সুসংবদ্ধ চিকিৎসা-সংক্রান্ত গবেষণা করা হয়, তাতে দেখা যায় যে ঃ

১. মাংস মানুষের জন্য কোন অপরিহার্য আহার্য নয়।
২. মাংস মানুষের জন্য একটি অস্বাভাবিক এবং অনুপযোগী আহার্য বস্তু।
৩. প্রকৃতপক্ষে মাংস মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

মাংসাহারের সংগে জড়িয়ে থাকে জীব-জন্তুদের নিধন-কর্ম, হত্যাকাণ্ড — যা অধিকাংশ মাংসাহারীরা ভুলে যাওয়ার ভাণ করে বা এড়িয়ে যায়। কোন পশুকে হত্যা করার কর্মটি একটি যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়া এবং কোন একটি কসাইখানা পরিদর্শন ভয়ানক এক দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতায় পরিণত হতে পারে। জীবজন্তুরা সংবেদনশীল প্রাণী, এবং মানুষের মতই তাদেরও নানা অনুভূতি, ভয়ভীতি রয়েছে। অনেক মানুষ রয়েছেন, যাঁরা নিজেরা কোন পশুকে হত্যা করার মতো ভয়ানক হিংস্র কর্ম করার কথা ভাবতেও পারেন না; তারা এই ভেবে তৃপ্তি খোঁজেন যে কেবল মাংস খেলে তাদের পাপে জড়াতে হবে না। কিন্তু এমন ভাবনার কোন যুক্তিগত ভিত্তি নেই। কোন মানুষকে হত্যা করা হলে আইনের আদালতে যারা হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাদেরকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়, বিশেষতঃ সেই সবচেয়ে বেশি দোষী বিবেচিত হয়, যে কোন হত্যাকারীকে টাকা দিয়ে তার ঐ কাজ করিয়েছে। ঠিক তেমনি যারাই কোন পশুর হত্যাকান্ডে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাদের প্রত্যেকেই কর্মের অমোঘ নিয়মের অধীন হয়ে থাকে। ভারতের সুপ্রাচীন নীতিশাস্ত্র **মনুসংহিতা** অনুসারে **পশু হত্যায় সংশ্লিষ্ট এই ছয় ধরণের ব্যক্তির দণ্ডনীয় পাপ হয় ঃ (১) যে হত্যার অনুমতি দেয়, (২) যে হত্যা করে, (৩) যে হত্যাকর্মে সাহায্য করে, (৪) সে ঐ মাংস ক্রয় করে, (৫) যে ঐ মাংস রান্না করে এবং পরিশেষে (৬) যে ঐ মাংস ভোজন করে।**

মনের উপর মাংসাহারের প্রভাব

মানুষের মনের উপর মাংসাহারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। খাদ্যের গুণ অনুসারে খাদ্যবস্তুকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে ঃ **সাত্ত্বিক খাদ্য, রাজসিক খাদ্য** এবং **তামসিক খাদ্য**। পশুর মাংস হচ্ছে রজো ও তমোগুণাত্মক খাদ্য, যার অর্থ হচ্ছে এটি রজোভাব বৃদ্ধি করে এবং কাম ও হিংসা-বৃত্তিকে প্ররোচিত করে। **যে-খাদ্য হিংসার মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে, তা স্বাভাবিকভাবেই আহারকারীর মধ্যে হিংসামূলক চেতনা সঞ্চারিত করে আহারকারীর সুস্থ মানসিক অবস্থাকে বিপদাপন্ন করে তুলবে। দয়া, করুণা, সহানুভূতি প্রীতি — প্রভৃতি উচ্চতর গুণগুলি সেই কারণে ধ্বংস হতে থাকবে।** সামগ্রিকভাবে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত ও ব্যাপক পশু হত্যার প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় বিশ্বব্যাপী হিংসা, সন্ত্রাস, হত্যা, ধর্ষণ, গুণ্ডামী ও যুদ্ধের মাধ্যমে, ব্যাপক গণহত্যার দ্বারা মানব সমাজ বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে।

নিরামিষাশীরাও হত্যা করে থাকে

এখানে আপনি অবশ্যম্ভাবী ভাবে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করবেন ঃ *"তাহলে শাকসব্জী, শস্যদানা হত্যার কি হবে? উদ্ভিদেরও তো প্রাণ আছে; তাহলে নিরামিষভোজীরাও কি একই ভাবে হত্যার দোষে দোষী নয়?"* এর উত্তরে প্রথমেই বলতে হয় যে ফল, বাদাম, দুধ — ইত্যাদি নিরামিষ খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য উদ্ভিদ হত্যার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এমনকি যেসব ক্ষেত্রে কোন উদ্ভিদের মৃত্যু হয়, সেক্ষেত্রেও ঐ উদ্ভিদের যন্ত্রণা একটি পশুর যন্ত্রণা থেকে অনেক কম হয়, কেননা উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্র অনেক কম বিকশিত। একটি জমি থেকে একটি গাজর তুলে নেওয়া এবং একটি গরু বা ছাগলকে হত্যা করা — স্পষ্টতঃই এই দুটির মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এমনকি উদ্ভিদ হত্যার জন্যও নিঃসন্দেহে হত্যার সমানুপাতিক হারে হত্যাকারীকে অনিবার্যভাবে পাপ কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

প্রকৃতি থেকে আমরা এটা বুঝতে পারি যে এক জীব অপর জীবের খাদ্য। সেইজন্য বেঁচে থাকার জন্য অন্য জীবের জীবনহানি অপরিহার্য বিষয়। মানুষ সহ প্রত্যেক প্রজাতির জীবের জন্য স্বাভাবিক নির্ধারিত শ্রেণীর খাদ্য রয়েছে। **মানুষের জন্য নির্ধারিত খাদ্য হচ্ছে নিরামিষ খাদ্য।** এটি বিস্ময়কর নয়, কেননা মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে বিকশিত ও বুদ্ধিমান প্রজাতি, সেজন্য তার বেচে থাকার জন্য যে খাদ্য প্রয়োজন, তা সবচেয়ে যতটা কম সম্ভব হিংসা প্রয়োগ করে সেই খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা তার উচ্চ মর্যাদার সংগে সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

মাংসাহার সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক অভিমত

১. শারীরবৃত্তীয় তুলনা ঃ পৃথিবীতে বহু প্রাণী রয়েছে যারা নিরামিষ ভোজী, অন্য বহু প্রজাতির প্রাণীরা আমিষ ভোজী। তাদের শারীর বৃত্তীয় কার্যকলাপের সঙ্গে তুলনা করলে সহজেই বোঝা যেতে পারে আমিষ না নিরামিষ কোনটি মানুষের স্বাভাবিক আহার্য। নীচের তালিকায় স্পষ্টই প্রতীয়মান যে মানুষের দেহ স্বাভাবিক ভাবে নিরামিষাশী প্রাণীদের মতই নিরামিষ আহার গ্রহণের উপযোগী।

	মাংসাশী	শাকাহারী	মানুষ
১	নখর আছে	নখর নেই	নখর নেই
২	গায়ের ত্বকে ছিদ্র বা ঘর্ম গ্রন্থি নেই; ঘর্ম নিঃসরণ করে জিভ দিয়ে	ত্বকের লক্ষ লক্ষ ছিদ্র দিয়ে ঘর্ম নিঃসরণ করে	ত্বকের লক্ষ লক্ষ ছিদ্র দিয়ে ঘর্ম নিঃসরণ করে
৩	দাঁতের সামনের সারিতে লম্বা, তীক্ষ্ণ শ্বাদন্ত রয়েছে।	লম্বা তীক্ষ্ণ কোন শ্বাদন্ত নেই	লম্বা, তীক্ষ্ণ কোন শ্বাদন্ত নেই
৪	মুখবিবরে অতি ক্ষুদ্র লালা গ্রন্থি রয়েছে (শস্যদানা বা ফল হজমে সহায়তা করার জন্য এগুলি কার্যকর নয়)।	সুপুষ্ট লালাগ্রন্থি রয়েছে (শস্য-ফলাদি হজম করতে যা প্রয়োজনীয়)	সুপুষ্ট লালাগ্রন্থি রয়েছে, (শস্য ফলাদি হজম করতে যা প্রয়োজনীয়)
৫	পশুদের হাড়, পেশী হজম করার জন্য পাকস্থলীতে শক্তিশালী হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে।	পাকস্থলীতে মাংসাশী প্রাণীদের থেকে ২০ গুণ কম শক্তিশালী হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে।	পাকস্থলীতে মাংসাশী প্রাণীদের চেয়ে ২০ গুণ কম শক্তিশালী হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড
৬	পৌষ্টিক নালী দেহের তুলনায় তিন গুণ লম্বা, যাতে দ্রুত পচনশীল মাংস দেহের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে।	পৌষ্টিকনালী দেহের তুলনায় ছয় গুণ লম্বা; ফল সব্জী দ্রুত পাচে না, সে জন্য পৌষ্টিক নালীর মধ্য দিয়ে ধীরে যায়;	পৌষ্টিক নালী দেহের তুলনায় ছয় গুণ লম্বা
৭	জিভ দিয়ে চেটে জল খায়	চুমুক দিয়ে জল খায়	চুমুক দিয়ে জল খায়

২. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত : মাংস সংরক্ষণের জন্য প্রিজারভেটিভ হিসাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকর পদার্থ এবং টক্সিক রাসায়নিক পদার্থ মাংস থেকে তৈরী খাদ্যের মধ্যে থাকে, যা থেকে হৃদ্‌রোগ-সহ অন্যান্য বহু ধরণের রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৩. পুষ্টি-সংক্রান্ত : কেবল মাংসেই উন্নত প্রোটিন আছে এবং শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যের জন্য বিপুল পরিমাণে প্রোটিনের প্রয়োজন — এই দুটি ধারণাই ভিত্তিহীন, মিথ্যা গল্প মাত্র। দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, শস্যদানা, ডাল এবং বাদাম জাতীয় ফল — সবই প্রোটিনের সুসংহত উৎস। যদিও অপর্যাপ্ত প্রোটিন শারীরিক শক্তি হ্রাস করে থাকে, একইভাবে অতিরিক্ত প্রোটিনও শরীর গ্রহণ করতে পারে না। এই অব্যবহৃত প্রোটীন খাদ্যবস্তু নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থে পরিণত হয়, এবং এই বর্জ্য ফিল্টার করার জন্য বৃক্ক বা কিডনী ভারাক্রান্ত হয়। বিভিন্ন ভাবে গবেষণায় দেখা গেছে যে যথার্থভাবে নির্বাচিত ও প্রস্তুত নিরামিষ আহার মাংসের থেকে অধিক পুষ্টিমূল্য ও শক্তি প্রদান করে থাকে। মাংস ভোজনের পরিণতিতে শরীর তন্ত্রে অতিরিক্ত প্রোটীন-সঞ্চয় হয়ে থাকে, যা সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিকূল (আর কোন মানুষই কেবল মাংস ও জল আহার করে দীর্ঘ কাল বাঁচাতে পারে না, যেকোন মাংসাশী প্রাণীর পক্ষে যা স্বাভাবিক)।

উন্নততর আহার্য

ইসকন আন্দোলন কেবল নিরামিষ আহারের সপক্ষে প্রচার করে না। নিরামিষ আহারের চেয়েও উন্নততর আহার্য-গ্রহণের নীতি রয়েছে। মাংসযুক্ত আহার্যের চেয়ে নিরামিষ আহার্য গ্রহণ অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলেও, নিরামিষ আহার গ্রহণও আমাদেরকে কর্মফল ভোগের নিয়ম থেকে, জীবহত্যাজনিত পাপকর্মের ফল ভোগে জড়িয়ে পড়া থেকে পুরোপুরি অব্যাহতি দিতে পারে না। তাছাড়া, কেবল একজন নিরামিষাশী হওয়ার মধ্যে কৃতিত্বের কিছু নেই। বানর ও খরগোসেরাও নিরামিষাশী। **ভগবদ্গীতায় উন্নততর আহার্য-নীতি নির্দেশিত হয়েছে। আমাদের অবশ্যই নিরামিষ আহার্য গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু তার আগে সেই আহার্য বস্তুকে পবিত্র করে নেওয়ার জন্য প্রথমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করতে হবে। এইভাবে নিবেদন করার ফলে নিবেদনকারীকে আর জীব হত্যা, উদ্ভিদ হত্যা-জনিত পাপকর্মের ফল স্পর্শ করে না। না হলে, কর্মের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে আমাদেরকে হত্যাজনিত কর্মের ফলভোগে বাধ্য থাকতে হবে।**

গৃহে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন

জড়জাগতিক জীবনের মতোই পারমার্থিক জীবনেরও কিছু ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্ম, প্রাত্যহিক কৃত্য রয়েছে। পার্থক্য হচ্ছে এই যে, আমরা জড় কার্যকলাপ করি আমাদের নিজেদের ও যাদের আমরা 'আমাদের' বলে মনে করি, সেই সব স্বজনদের জন্য, পক্ষান্তরে আমরা পারমার্থিক ক্রিয়া-কর্ম সম্পাদন করি শাস্ত্র ও গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য। মুল বিষয় হচ্ছে শাস্ত্র ও গুরুদেবের অধীনতা স্বীকার করা, তাঁদের নির্দেশ গ্রহণ করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় ঘোষণা করেন যে কেউ যদি সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে ব্যবহারিক জীবনে ভগবৎ-সেবায় যুক্ত না হয়, তাহলে সে সুখ বা পরম গন্তব্য ভগবদ্ধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাওয়া-রূপ জীবনের পরম গতি লাভ করতে পারে না। **স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হতে অবিচ্ছিন্ন প্রামাণিক পরম্পরা-ক্রমে আগত একজন সদ্গুরুর উপদেশ অনুসরণ ব্যাতীত আমরা পারমার্থিক অগ্রগতি সাধন করতে পারি না।** এখানে ভক্তিযোগ অনুশীলনের যে পন্থাগুলি বিবৃত করা হচ্ছে, সেগুলি নিত্যকাল ধরে অনুশীলিত ভক্ত্যঙ্গ, ভক্তিযোগের বিধি-নিয়ম, যা আমাদের সময়ের বিশ্বপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারক ও সদ্গুরু, **আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের (ইসকন) প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ** প্রদান করেছেন।

পারমার্থিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসা। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন (১৮/৫৫), ***"ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি"; "কেবল ভক্তিদ্বারাই আমাকে জানা যায়"***। জ্ঞান আমাদেরকে সঠিক কর্ম সম্পাদনে পরিচালিত করে। যথাযথ পারমার্থিক জ্ঞান আমাদেরকে ব্যাবহারিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের বাসনাগুলি পূর্ণ করার দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টিবিধানের কর্মে পরিচালিত করে। ব্যবহারিক জীবনে প্রযুক্ত না হলে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞানের সামান্যই মূল্য আছে।

পারমার্থিক জ্ঞান জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের নির্দেশনা দান করে। সেজন্য আমাদের উচিত আমাদের জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত, সুসংবদ্ধ করা, যাতে যতদূর সম্ভব আমরা শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা-উপদেশকে অনুসরণ করতে পারি, জীবনে রূপায়িত করতে পারি। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যতটা সাধ্য ততটা করার; কেবল যেটুকু করা সুবিধাজনক, তার চেয়ে বেশি করতে হবে। তখন কৃষ্ণভাবনামৃতের অপ্রকৃত, চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব হবে — এমনকি মন্দির থেকে অনেক দূরে থাকলেও।

১. হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ

ভক্তিযোগের মুখ্য অঙ্গ হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। *মহা* অর্থ সর্ববৃহৎ, *মন্ত্র* শব্দের অর্থ যা মনকে জড়বন্ধন বা অজ্ঞানতা থেকে ত্রাণ করে (*মন্* + *ত্র*)।

সুবর্ণবর্ণ অবতার ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সারা বিশ্বের মানুষকে এই মহামন্ত্র জপ ও কীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

আপনি যেকোন সময়ে যেকোন স্থানে এই মহামন্ত্র জপ করতে পারেন, কিন্তু দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় নিয়মিতভাবে জপের জন্য নির্ধারিত রাখাই সবচেয়ে ভাল। ভোর বেলাই হচ্ছে জপের আদর্শ সময়। ভগবানের দিব্য নাম দু'ভাবে উচ্চারণ করা যায় ঃ মন্ত্র গাওয়া, যাকে বলা হয় **কীর্তন** (সাধারণত একদল ভক্ত সমবেতভাবে এটি করেন), এবং নিজে শোনার মত করে মৃদুস্বরে উচ্চারণ, যাকে বলা হয় **জপ**। ভগবানের দিব্য নামের ধ্বনি শ্রবণে মনঃসংযোগ করুন। জপ করার সময় শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনাসূচক মনোভাব নিয়ে প্রত্যেক নাম স্পষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করুন। যদি মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে মন ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করতে থাকে, তাহলে তাকে ফিরিয়ে এনে আবার ভগবানের নামের অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ শ্রবণে নিবদ্ধ করুন। নাম জপ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা, যার অর্থ হচ্ছে, **"হে ভগবানের শক্তি (হরে), হে সর্বাকর্ষক ভগবান (কৃষ্ণ), হে পরম ভোক্তা (রাম), কৃপা করে আমাকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত করুন।"** আপনি যত বেশি মনোযোগ ও আন্তরিকতা সহকারে ভগবানের অপ্রাকৃত নাম জপ করবেন, আপনার পারমার্থিক উন্নতি তত দ্রুত হবে।

কিভাবে জপ করতে হয়

জপ মালায় জপ করাই সবচেয়ে ভাল। এতে কেবল আপনার দৈনন্দিন জপের সংখ্যা রাখতে যে সুবিধা হয়, তাই নয় জপের মানও এর ফলে উন্নত হয়। প্রত্যেক জপ মালায় ১০৮টি গুটিকা রয়েছে, তার একটি রয়েছে প্রধান গুটিকা, যাকে বলা হয় সুমেরু। তর্জনী বাদ দিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যামাঙ্গুলির সাহায্যে প্রথমে সুমেরু গুটিকা ধরুন; তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদবর্গের কৃপা প্রার্থনা করে এই প্রার্থনা মন্ত্রটি জপ করুন ঃ

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

এরপর সুমেরুর পরবর্তী বড় গুটিকা ধরে একবার হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন — সুস্পষ্ট ভাবে। তারপর পরের গুটিকা বৃদ্ধ ও মধ্যমা আঙ্গুলির মাঝে ধরুন, এক একবার মহামন্ত্র জপ করুন। এইভাবে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যান। তারপর সুমেরু না টপকিয়ে মালা ঘুরিয়ে ছোট গুটির দিক থেকে শুরু করুন। একইভাবে সুমেরু ধরে 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ...' মন্ত্রটি জপ করে প্রতি গুটি ধরে পূর্ণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে চলুন। এইভাবে দুই মালা জপ হয়।

দীক্ষিত ভক্তদেরকে প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ১৬ মালা জপ করার জন্য গুরুদেবের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হয়। কিন্তু এমনকি যদি আপনি দিনে ১ মালাও জপ করেন, তাহলে নিয়ম হচ্ছে জপ শুরু করার পর ঐ মালাটি সম্পূর্ণ করে তবে মালা ছাড়বার চেষ্টা করতে হবে। মাঝামাঝি ছাড়া অনুচিত। আর প্রতিদিন অবশ্যই নির্ধারিত জপ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। ভালভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আপনি যখন মনে করবেন আপনি জপের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবেন, তখন সামর্থ্য অনুসারে বৃদ্ধি করুন। কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যা জপ অবশ্যই সম্পূর্ণ করতে হবে। আপনি নির্ধারিত জপসংখ্যার চেয়ে বেশি করতে পারেন, সেটা ভাল, কিন্তু কিছুতেই কম করা চলবে না। দৈনন্দিন জপের জন্য একটি সর্বনিম্ন জপ সংখ্যা নির্ধারিত রাখতে হবে — ২, ৪, ৮, ১৬ মালা — যতটা হোক।

জপ করা ছাড়াও, আপনি ভগবানের দিব্য নামসমূহ কীর্তনও করতে পারেন। আপনি একাকীও কীর্তন করতে পারেন, তবে সাধারণত অন্যদের সঙ্গে সমবেতভাবে কীর্তন করতে হয়। সপরিবারে বা বন্ধুবান্ধবদের সংগে একসাথে প্রাণবন্ত কীর্তন প্রত্যেককে আনন্দোচ্ছল করে তোলে, এক দিব্য আনন্দময় পরিবেশ তৈরী হয়। ইসকন ভক্তগণ চিরাচরিত সুর ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে কীর্তন করে থাকেন — বিশেষতঃ মন্দিরে; তবে আপনি আপনার পছন্দমত যেকোন সুর, যেকোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে কীর্তন করতে পারেন। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের কোন বাঁধাধরা নিয়মবিধি নেই।

২. পূজাবেদী স্থাপন

আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে ভগবানের বেদীর সামনে জপ বা কীর্তন আরও বেশি ফলপ্রসূ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শুদ্ধভক্তগণ এতই কৃপাময় যে তাঁরা এমনকি আলেখ্য বা ছবির মধ্য দিয়েও তাঁদেরকে পূজা করতে দেন। এটা ঠিক ডাকে চিঠি পাঠানোর মতো। যেকোন বাক্সে চিঠি ফেলে আপনি আপনার চিঠিকে যথাস্থানে পৌঁছানোর আশা করতে পারেন না; আপনাকে অবশ্যই সরকার অনুমোদিত নির্ধারিত পোষ্ট-বক্সে চিঠি ফেলতে হবে। ঠিক তেমনি আমরা কোন ছবি খুশিমত কল্পনা করে সেই কাল্পনিক ছবি পূজা করতে পারি না — সেটা নিস্ফল; কিন্তু আমরা যদি শাস্ত্রানুমোদিতভাবে ভগবানের বা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের ছবি বেদীতে রেখে শ্রদ্ধাসহকারে তাঁর পূজা করি, তাহলে সেই ছবি বা আলেখ্যের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পূজা গ্রহণ করেন।

গৃহে ভগবানের পূজাবেদী স্থাপনের অর্থ হচ্ছে আপনার গৃহে ভগবান ও তাঁর শুদ্ধভক্তগণকে সবচেয়ে সম্মানীয়, বরণীয় অতিথিরূপে গ্রহণ করা। পূজার আসনে কোথায় স্থাপন করা উচিত? তার আগে ভাবুন, অত্যন্ত সম্মানীয় কোন অতিথি এলে আপনি কোথায় তাঁকে বসতে দেবেন? একটি আদর্শ জায়গা হবে পরিচ্ছন্ন, ভালভাবে আলোকিত, যেখানে গেরস্থালির জিনিসপত্র থাকবে না এবং সাংসারিক কলরোল থেকে মুক্ত থাকবে। বাড়ীর অতিথির জন্য চেয়ার দরকার হয়; কিন্তু ঘরের কোন টেবিলে, দেওয়ালের তাকে, বুক-শেল্ফের উপরের তাকে — যেকোন সুবিধামত স্থানে শ্রীকৃষ্ণের ছবি রাখতে পারেন। আপনি যেমন গৃহে অতিথিকে বসিয়ে রেখে তাঁকে অগ্রাহ্য করে চলতে পারেন না — আপনার নিজের জন্যও একটি বসার জায়গা তাঁর কাছে রাখেন — যাতে আপনি স্বচ্ছন্দে তাঁর মুখোমুখি হয়ে তাঁর সান্নিধ্য উপভোগ করতে পারেন, ঠিক তেমনি আপনার পূজার স্থানটিও খুব সংকীর্ণ বা দুষ্প্রবেশ্য হবে না; তাঁর সামনে আপনি দাঁড়ানো, বসা, প্রণাম করার জায়গা রাখুন।

পূজাবেদী স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। শ্রীল প্রভুপাদের ছবি
২। শ্রীপঞ্চতত্ত্বের ছবি (সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেব)
৩। শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের ছবি

এছাড়া যা দরকার, তা হচ্ছে বেদীর আবরক কাপড়, প্রতি ছবির জন্য একটি করে জলপাত্র, প্রদীপ, ভোগ নিবেদনের বিশেষ থালা, একটি ছোট ঘন্টা, ধূপদানি, সতেজ ফুল। ফুল রাখার জন্য ফুলদানি রাখতে পারেন। আরও বিস্তারিতভাবে পূজা করার জন্য ইসকন ভক্তদের পরামর্শ নিন (বিস্তারিত জানার জন্য ***কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের পন্থা*** গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)।

পূজাবেদীতে প্রথম যাঁকে আমরা পূজা করব, তিনি হচ্ছেন **শ্রীগুরুদেব**। গুরুদেব ভগবান নন। ভগবান হতে পারেন কেবল ভগবানই — অন্য কেউই ভগবান হতে পারে না। কিন্তু যেহেতু গুরুদেব ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় সেবক, দাস, এবং তাঁর বাণী প্রচারের জন্য ভগবান তাঁকে শক্তি প্রদান করেছেন, সেজন্য ভগবানকে যেমন সম্মান করতে হয়, তিনিও সেইরকম সম্মান লাভের যোগ্য, গুরুদেবকেও সেইরকম সম্মান জ্ঞাপন করা কর্তব্য। তিনি ভগবানের সঙ্গে শিষ্যের সংযোগ সাধন করেন, শিষ্যকে ভক্তিযোগে প্রশিক্ষিত করে তোলেন। তিনি এই জড়জগতে প্রেরিত ভগবানের দূত, বার্তাবহ। যখন কোন দেশের রাষ্ট্রপতি তাঁর একজন প্রতিনিধিকে, বা রাষ্ট্রদূতকে অন্য দেশে পাঠান, তখন সেই রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রপতিকে যেমন সম্মান দেওয়া হয়, সেই একইরকম সম্মান লাভ করে থাকেন। আর সেই রাষ্ট্রদূতের কথাও রাষ্ট্রপতির কথার মতোই সমান গ্রহণীয়, প্রামাণিকতাপূর্ণ। ঠিক সেইরকমভাবে আমরা যেমন ভগবানকে সম্মান জ্ঞাপন করি, একইভাবে গুরুদেবকে সম্মান জ্ঞাপন করতে হবে, এবং শ্রীগুরুদেবের বাণীকেও ভগবানের বাণীর মতো সমান সমীহ করতে হবে।

গুরুদেব দু'প্রকার — **শিক্ষা গুরু** এবং **দীক্ষা গুরু**। ইসকনের সংস্পর্শে এসে যাঁরা ভক্তিযোগের পন্থা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অপরিসীম ঋণ ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। বিদেশে কৃষ্ণভক্তি বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৯৬৫-তে যাত্রা করার পূর্বে ভারতের বাইরের প্রায় কেউই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবার পন্থা সম্বন্ধে কিছু জানত না। সেজন্য যাঁরাই শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করে, প্রবচন (যন্ত্রে বাণীবদ্ধ) শ্রবণ করে, ভগবৎদর্শন পত্রিকার মাধ্যমে অথবা তাঁর অনুগামীদের সংস্পর্শে এসে কৃষ্ণভক্তি গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা তাঁদের প্রত্যেকের কর্তব্য। **আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য হিসাবে তিনি আমাদের সকলের শিক্ষা গুরু।**

ভক্তিযোগে আপনি যখন উন্নতি করতে থাকবেন, তখন যথা সময়ে আপনি একজন গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করতে চাইবেন। ১৯৭৭ সালে এই জগৎ থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ একটি পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, যার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তিতে উন্নত ও যোগ্য ভক্তগণ তাঁর শিক্ষা-নির্দেশ অনুসারে নতুন দীক্ষাপ্রার্থী ভক্তগণকে দীক্ষা দান করার দ্বারা তাঁর কর্মব্রতকে অব্যাহত ধারায় এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ইসকনের অনেক গুরুদেব রয়েছেন। পারমার্থিক পথ-নির্দেশ লাভের জন্য কিভাবে কোন ইসকন গুরুদেবের সান্নিধ্য পাবেন, তা জানতে আপনার নিকটবর্তী ইসকন কেন্দ্রের ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আপনার পূজাবেদীর পরবর্তী আলেখ্য বা ছবিটি হবে **পঞ্চতত্ত্বের**। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন এই কলিযুগের যুগাবতার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং; বিশেষতঃ দিব্যনাম কীর্তন ও ভক্তিযোগের অন্যান্য কার্যাবলী সাধনের মাধ্যমে কীভাবে তাঁর শরণাগত হতে হয়, তাঁর ভক্তগণকে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সবচেয়ে করুণাময়; তিনি অত্যন্ত দুর্লভ ভগবদ্ভক্তি, ভগবৎ প্রেম প্রত্যেকের কাছে সুলভ, সুসাধ্য করেছেন; হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে যে-কেউ তা লাভ করতে পারে।

আপনার পূজাবেদীর সর্বোচ্চ স্থানটিতে অবশ্যই অধিষ্ঠিত থাকবেন পরম পুরুষোত্তম **ভগবান শ্রীকৃষ্ণ** এবং তাঁর নিত্য লীলাসঙ্গিনী **শ্রীমতী রাধারাণী**। শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি। তিনি ভক্তিযুক্ত সেবার মূর্ত বিগ্রহ-স্বরূপা; কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে হয় তা শিখতে ভক্তগণ সর্বদাই তাঁর চরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন।

আপনি ত্রিভুজের আকারে ছবিগুলিকে পূজাবেদীতে সাজাতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদের ছবি থাকবে বাঁদিকে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অনুগামীদের চিত্র থাকবে ডানদিকে। শ্রীশ্রী রাধামাধবের আলেখ্য সম্ভব হলে অন্যান্য আলেখ্যের চেয়ে একটু বড় রাখতে হবে, এবং পূজাবেদীতে সবচেয়ে উঁচু আসনে কেন্দ্রস্থলে তাঁদের আলেখ্য স্থাপন করতে হবে। অথবা আপনি উপরের দেওয়ালেও রাধাকৃষ্ণের ছবি ঝুলিয়ে রাখতে পারেন।

প্রত্যেক দিন সকালে সযত্নে পূজাবেদী পরিষ্কার করুন। বিগ্রহ উপাসনায় পরিচ্ছন্নতা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ। মনে রাখুন, আপনার বাড়ীতে কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্মানীয় অতিথি এলে আপনি কখনই তাঁর থাকবার ঘরটি পরিষ্কার করতে ভুলে যান না; ঠিক তেমনি আপনি যখন পূজার আসন স্থাপন করেন, তখন আপনি শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তবৃন্দকে আপনার সবচেয়ে মহনীয় অতিথিরূপে সেখানে থাকবার জন্য আপনি আমন্ত্রণ জানান। আপনি যদি সেখানে জলপাত্র রাখেন, তাহলে প্রতিদিন জল ফেলে পাত্রটি মেজে তাতে নূতন জল ভরুন, তারপর আলেখ্য-র কাছাকাছি সুবিধাজনক জায়গায় সেটি রাখুন। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার আপনি তাজা ধূপ নিবেদন করবেন, আর সম্ভব হলে, আপনি যখন বেদীর সামনে জপ করবেন, তখন মোমবাতি জালিয়ে ছবির কাছে রাখুন।

আমরা এ-পর্যন্ত যা-কিছু বলেছি, অনুগ্রহ করে তা অনুসরণ করার চেষ্টা করুন। এগুলি সত্যিকার অর্থেই খুবই সরল, সহজসাধ্য ব্যাপার। আপনি যদি ভগবানকে ভালবাসার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারবেন তিনি আপনাকে কতটা ভালবাসেন। সেটিই ভক্তিযোগের সারমর্ম।

৩. প্রসাদ ঃ কেমন করে আহার হয়ে উঠবে চিন্ময়

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অসীম, অপ্রাকৃত চিন্ময় শক্তিরাজির দ্বারা জড়কে চিন্ময়ে পরিবর্তিত করতে পারেন। আমরা যদি জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে একটি লোহার দন্ড রাখি, তাহলে কিছুক্ষণ পর দন্ডটি উত্তপ্ত হয়ে সম্পূর্ণ লাল হয়ে ওঠে, এবং তখন সেটি আগুনেরই মতো ক্রিয়া করতে থাকে। ঠিক তেমনিভাবে প্রেম ও ভক্তি সহকারে যখন শ্রীকৃষ্ণকে খাদ্য নিবেদিত হয়, তখন তা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় হয়ে ওঠে। এইরকম খাদ্যবস্তু প্রকৃতপক্ষে খাদ্যরূপে প্রতিমূর্ত শ্রীকৃষ্ণের কৃপা, যাকে বলা হয় **'প্রসাদ'**।

প্রসাদ ভোজন ভক্তিযোগের একটি মৌলিক অঙ্গ। অন্যান্য যোগ-পন্থায় কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে হয়, কিন্তু ভক্তিযোগী তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে নানা রকমের বৈচিত্রপূর্ণ চিন্ময় কার্যাবলীতে নিয়োজিত করতে পারেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত সুস্বাদু আহার্য আস্বাদন। এইভাবে জড় ইন্দ্রিয়গুলি ক্রমশঃ চিন্ময় হয়ে ওঠে এবং ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে আরও বেশি বেশি করে অপ্রাকৃত আনন্দ ভক্তকে প্রদান করতে থাকে। এই ধরণের অপ্রাকৃত দিব্যানন্দ যেকোন ধরণের জড় আনন্দের অনুভব থেকে বহু বহুগুণে উচ্চতর, আস্বাদ্য।

কিভাবে ভোগ প্রস্তুত ও নিবেদন করবেন

শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করার জন্য খাদ্য নির্বাচন করতে আপনি যখন কোন সুপার মার্কেটে ফুডপ্লাজা বা খাদ্য বিপনি-সারির পাশ দিয়ে হাঁটবেন, তখন তার আগে আপনাকে জেনে নিতে হবে কোন খাদ্য নিবেদন যোগ্য, কোন খাদ্যগুলি নয়। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, **"যে বিশুদ্ধ-চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ**

করেন, আমি তার সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" এই শ্লোক থেকে আমরা জানতে পারি যে আমরা শস্যদানা, শাকসব্জী, ফল, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য, ডাল ও বাদামজাতীয় আহার্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করতে পারি। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি নিবেদনযোগ্য নয়। কিছু কিছু নিরামিষ খাদ্যও নিষিদ্ধ, যেমন পেঁয়াজ, রসুন, মুসুর ডাল — এগুলি তামসিক আহার্য। চা কিংবা কফিও শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা যায় না, কেননা এর মধ্যে ক্যাফিন থাকায় এগুলি মাদক দ্রব্য। আপনি যদি এই ধরণের পানীয়ে আসক্ত হন, তাহলে ক্যাফিন-যুক্ত কফির বিকল্প কিছু, বা হার্বাল-টি অর্থাৎ আয়ুর্বেদিক চা পান করতে পারেন।

অভক্তদের রান্না করা খাদ্য-খাবারও পরিহার করুন। প্রকৃতির সূক্ষ্ম নিয়ম অনুসারে, রন্ধনকারী কেবল শারীরিকভাবে খাদ্যবস্তুর উপর ক্রিয়া করে না, রন্ধনকারীর চেতনা, তাঁর মানসিকতাও ঐ খাদ্যে সঞ্চারিত হয়। এইভাবে ঐ খাদ্য একটি পরিবাহীতে পরিণত হয়ে সূক্ষ্মভাবে আপনার চেতনাকে প্রভাবিত করে। এই ব্যাপারটি ঠিক একজন চিত্রকরের ছবি আঁকার মতো; একটি আঁকা ছবি কেবল ক্যানভাসের উপর কিছু রঙের আঁচড়ের সমষ্টি নয়; সেটি শিল্পীর মানসিক ভাবের দ্যোতক, যা দর্শনকারীকে প্রভাবিত করে। সুতরাং আপনি যদি একজন অভক্তের — যেমন কারখানার কোন কর্মীর রান্না করা খাবার গ্রহণ করেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আপনাকে কিছুটা জড়ীয় ভাব এবং কর্মফলও আত্তীকরণ করতে হবে। সুতরাং নিজে বা ভক্তদের রান্না করা খাবার ভগবানকে নিবেদন করুন এবং যতদূর সম্ভব এজন্য টাটকা, তাজা, প্রাকৃতিক খাদ্য-উপাদান ব্যবহার করুন।

ভগবানের জন্য রান্না করার সময় পরিচ্ছন্নতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি। অবিশুদ্ধ, অপরিচ্ছন্ন কোন কিছু ভগবানকে নিবেদন করা উচিত নয়; সেজন্য আপনার রান্না ঘরটিকে সব সময় খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। রান্নাঘরে প্রবেশের পূর্বে ভাল করে সম্পূর্ণভাবে হাত ধুয়ে নিন। রান্নার সময় কোন খাদ্য 'চেখে' দেখবেন না; কেননা আপনি নিজের জন্য রান্না করছেন না — শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করছেন। খাদ্য প্রস্তুত করার পর কেবল শ্রীকৃষ্ণের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা ভোগ নিবেদনের থালা-বাটিগুলি ধুয়ে সেগুলিতে ঐ খাদ্য-গুলির কিছু কিছু অংশ রাখুন। ঐ পদগুলি থেকে কেবলমাত্র ভগবানই আহার গ্রহণ করবেন, অন্য কেউ নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদনের সহজতম পদ্ধতি হচ্ছে কেবল শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করা, "প্রিয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, কৃপাপূর্বক এই আহার্যবস্তু গ্রহণ করো", এবং সেই সাথে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে নিম্নোক্ত প্রার্থনা মন্ত্রগুলির প্রতিটি তিনবার করে আবৃত্তি করা ঃ

১। শ্রীল প্রভুপাদ প্রণাম মন্ত্র ঃ

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে
নমস্তে সারস্বতেদেবে গৌরবাণী প্রচারিণে
নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশতারিণে॥

২। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রণাম মন্ত্র ঃ

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

"আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণাম জানাই, যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য অবতার অপেক্ষা উদার। তিনি অত্যন্ত দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেছেন, তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।"

৩। **শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র ঃ**

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

সর্বদা স্মরণ রাখুন যে খাদ্য প্রস্তুত করা ও ভগবানকে তা নিবেদন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর প্রতি আপনার ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। শ্রীকৃষ্ণ আপনার ভক্তি গ্রহণ করে থাকেন। ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ — কোন কিছুর জন্য তাঁর কারও উপরে নির্ভর করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কেবল অসীম করুণাবশতঃ তিনি আমাদেরকে তাঁকে খাদ্য নিবেদনের সুযোগ দেন, যাতে আমরা তাঁর প্রতি প্রেম বিকশিত করতে পারি।

ভগবানকে ভোগ নিবেদনের পর তাঁকে তা আস্বাদন করতে দেওয়ার জন্য অন্ততঃ পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর ঐ নিবেদিত খাদ্যবস্তু বা প্রসাদ যেসব পাত্রে মূল খাবার রাখা আছে, সেখানে মিশিয়ে দিন। এখন আপনি বা আপনার যেকোন অতিথি এই প্রসাদ — ভগবানের কৃপা গ্রহণ করতে পারেন। ফুল, ধূপ, জল, খাদ্যবস্তু — যা কিছুই আপনি ভগবানকে নিবেদন করবেন, তা চিন্ময় হয়ে উঠবে। ভগবান তাঁর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে আহার করেন, আর এই-ভাবে ঐ নিবেদিত বস্তুর সঙ্গে তাঁর দিব্য সংস্পর্শের ফলে প্রসাদ হয়ে ওঠে চিন্ময়, ভগবান হতে অভিন্ন। সুতরাং আপনি যা ভগবানকে নিবেদন করেছেন সেই খাদ্য বা প্রসাদকে কেবল আপনি যে গভীরভাবে সম্মান করে গ্রহণ করবেন তাই নয়, অন্যদেরকেও সেই প্রসাদ আপনি বিতরণ করবেন। অন্যদেরকে প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে বিগ্রহ উপাসনার অপরিহার্য অঙ্গ।

৪. দৈনন্দিন জীবনে চারটি বিধিনিয়ম পালন

যাঁরা কৃষ্ণভক্তি অর্জনে উন্মুখ, নিষ্ঠাবান, তাঁদের অবশ্যই নিম্নোক্ত চারটি নিষিদ্ধ পাপকর্ম বর্জন করতে হবে ঃ

১। **আমিষ আহার ঃ** মাছ, মাংস, ডিম — এই আমিষ দ্রব্যগুলি রজ ও তম গুণযুক্ত, সেজন্য এগুলি ভগবানকে নিবেদন করা যায় না। যে ব্যক্তি এই ধরণের খাদ্যবস্তু আহার করে, সে প্রকারান্তরে অসহায় জীবজন্তুদের হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে থাকে, ফলে শুরুতেই তাঁর পারমার্থিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

২। **জুয়া খেলা ঃ** বিভিন্ন ধরণের জুয়া খেলা রয়েছে — তাস, দাবা, লটারী, ইত্যাদি, যা লোভ, ঈর্ষা ও ক্রোধের অনলে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মতো ক্রিয়া করে ও এভাবে চেতনাকে কলুষিত করে তোলে।

৩। **মাদক গ্রহণ বা নেশা করা ঃ** তামাক, মদ বা যেকোন ধরণের মাদক দ্রব্য, নেশার ঔষধ, ক্যাফিন রয়েছে এমন যেকোন ধরণের খাদ্য বা পানীয় যেমন চা, কফি প্রভৃতি মনকে দূষিত করে, ইন্দ্রিয়গুলিকে অত্যন্ত উদ্দীপিত করে তোলে, ফলে ভক্তিযোগের নিয়মনীতিগুলি উপলব্ধি করা ও পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৪। **অবৈধ যৌন ক্রিয়া ঃ** বিবাহ-বহির্ভূত যৌনকর্ম, বা বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যেও কেবল সন্তান লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত যৌন কর্ম এর অন্তর্ভূক্ত। কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্য যৌন ক্রিয়ার ফলে দেহাত্মবুদ্ধি গভীরতর হতে থাকে। — অস্থায়ী দেহের সঙ্গে নিজেকে এক করে ভাবাটা আরও দৃঢ়তর হতে থাকে এবং ফলে কৃষ্ণভক্তির বিকাশের পথ হতে বিচ্যুত হতে হয়। শাস্ত্রসমূহে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে যৌনক্রিয়া হচ্ছে আমাদেরকে এই জড়জগতে আবদ্ধ করে রাখার সবচেয়ে প্রবল শক্তি। সেজন্য যিনি ভগবদ্ভক্তি বিকশিত করার জন্য যত্নপরায়ণ, তাঁর উচিত যতদূর সম্ভব যৌনকর্ম হ্রাস করা, বা সম্ভব হলে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা।

● চারটি বিধিনিয়ম ●	
আমিষাহার বর্জন	জুয়খেলা বর্জন
নেশা বর্জন	অবৈধ যৌন কার্যকলাপ বর্জন

প্রত্যক্ষভাবে ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত হওয়া

প্রত্যেককেই কিছু না কিছু কর্ম করতে হয়; দেহ ধারণের জন্য কর্ম করতে সকলেই বাধ্য। কিন্তু কর্মের নিয়ম অনুসারে, আপনি যদি কেবল নিজের জন্য কাজ করেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার কৃতকর্মের ফল, কর্মফল ভোগ করতে হবে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ (৩/৯) বলেন, **"বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদনের জন্য কর্ম করা উচিত; তা না হলে কর্ম জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে।"**

আপনাকে আপনার বর্তমান পেশা পরিত্যাগ বা পরিবর্তন করতে হবে না। আপনি যদি একজন লেখক হন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের জন্য লিখুন; আপনি যদি একজন শিল্পী হন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে শিল্প সৃষ্টি করুন। যদি আপনি কোন অফিসকর্মী হন, তাহলে আপনি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কাগজপত্র টাইপ করতে পারেন, আপনার দক্ষতা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে প্রয়োগ করতে পারেন, এমনকি আপনার অফিসের কাজকেও ভগবৎ-প্রীতি বিধানমূলক কর্ম — কৃষ্ণকর্মে পরিণত করতে পারেন। এছাড়াও আপনি অবসর সময়ে আপনার নিকটবর্তী মন্দিরে কোন ধরণের কৃষ্ণসেবা করতে পারেন, আপনার উপার্জনের একটি অংশ মন্দির তত্ত্বাবধানে বা কৃষ্ণভক্তি প্রচারের জন্য দান করতে পারেন। মন্দিরের বাইরে বাস করছেন এমন বহু ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ কৃষ্ণভাবনামূলক গ্রন্থ-পত্রিকাদি কিনে তাঁদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করেন, অথবা মন্দিরের বিভিন্ন ধরণের সেবায় নিয়োজিত হন। এছাড়া ভক্ত মণ্ডলীদের নানা সঙ্ঘ, গোষ্ঠী রয়েছে (যেমন ইসকন **ভক্তিবৃক্ষ, নামহট্ট, গীতা কোর্স শিক্ষার্থী ভক্তগোষ্ঠী, জাগ্রত চেতনা ছাত্র সমাজ, যুবগোষ্ঠী**), যার মাধ্যমে ভক্তগণ একে অপরের গৃহে মিলিত হয়ে কৃষ্ণকথা, আরতি, কীর্তন, গ্রন্থপাঠ, প্রসাদ ভোজন ইত্যাদি করতে পারেন।

ভক্তিযোগ অনুশীলনের আরও কিছু বিধিনিয়ম

ভক্তিযোগের আরও অনেক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে যা আপনাকে কৃষ্ণভাবনাময় হতে সাহায্য করতে পারে। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি অভ্যাসের উল্লেখ করা হচ্ছে।

■ **ইসকনের কৃষ্ণভক্তিময় গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন** : ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনায় তাঁর জীবনের অনেকটা সময় নিয়োজিত করেছিলেন — যেমন **শ্রীমদ্ভাগবতম্**। একজন তত্ত্বদ্রষ্টা সদ্গুরুর নিকট থেকে শ্রবণ অথবা তাঁর রচনাবলী পাঠ একটি অত্যন্ত অপরিহার্য পারমার্থিক অভ্যাস। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত গ্রন্থাবলী পাঠ করার জন্য দিনের কিছুটা সময় নির্দিষ্ট করে রাখুন।

■ **ভক্তসঙ্গ** : সাধারণ মানুষকে ভগবানের ভক্তগণের সঙ্গ লাভের একটি সুযোগ দানের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের সূচনা করেন। কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা বর্ধিত করা এবং ভক্তিযুক্ত সেবায় উৎসাহিত হওয়ার এটিই হচ্ছে সর্বোত্তম উপায়। পক্ষান্তরে, অভক্তদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখলে তা পারমার্থিক উন্নতিতে অন্তরায় সৃষ্টি প্রতিহত করে। সুতরাং আপনার নিকটবর্তী ইসকনের কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন কেন্দ্রে বা মন্দিরে যত বেশি সম্ভব যাওয়ার চেষ্টা করুন।

গীতা প্রতিযোগিতা ঃ ছয়

এর জন্য

কিছু প্রাসঙ্গিক শ্লোক

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ গ্রন্থ থেকে

নীচের শ্লোক সমূহ, অনুবাদ ও তাৎপর্য সহ ঃ

- ৩/১৩, ৮৪/৭, ৯/২৬, ১০/৯, ১৮/৫৫

হরে কৃষ্ণ

কীর্তন করুন ও সুখী হোন

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

পরিশিষ্ট - ১

মঙ্গলাচরণ

শ্লোকগুলি ভালভাবে মুখস্থ করে প্রতিদিন প্রার্থনা করুন

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

অজ্ঞতার গভীরতম অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল, এবং আমার গুরুদেব জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিয়ে আমার চক্ষু উন্মীলিত করলেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ, যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ কবে করতে পারব?

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

আমি আমার শ্রীগুরুদেব ও সমস্ত বৈষ্ণববৃন্দের পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীরূপ গোস্বামী, তাঁর অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীল জীব গোস্বামীর চরণ-কমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর, শ্রীবাস এবং তাঁদের অনুগামী ভক্তবৃন্দের পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীমতী ললিতা-বিশাখা সহ শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রণতি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে॥
নমস্তে সারস্বতে দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ-শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ-তারিণে॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত ও একান্ত প্রিয়ভক্ত কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরনারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রনতি নিবেদন করি।

হে প্রভুপাদ, হে সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য, কৃপাপূর্বক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের দ্বারা নির্বিশেষবাদ শূন্যবাদপূর্ন পাশ্চাত্যদেশ উদ্ধারকারী আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রনতি নিবেদন করি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

সমস্ত বৈষ্ণবভক্তবৃন্দ, যাঁরা বাঞ্ছাকল্পতরুর মতো সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন, যাঁরা কৃপার সাগর এবং পতিতপাবন, তাঁদের চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

ভক্তরূপ-শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ভক্তস্বরূপ-নিত্যানন্দ প্রভু, ভক্তাবতার-অদ্বৈত আচার্য প্রভু, ভক্ত-শ্রীবাস ঠাকুর, ভক্ত শক্তি-শ্রীগদাধর পণ্ডিত এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে প্রণতি নিবেদন করি।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য অবতার অপেক্ষা উদার, তিনি অত্যন্ত দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেছেন, তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥

হে আমার প্রিয় কৃষ্ণ! তুমি করুণার সিন্ধু, তুমি দীনের বন্ধু, তুমি সমস্ত জগতের পতি, তুমি গোপীদের ঈশ্বর এবং শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমাস্পদ। আমি তোমার পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

শ্রীমতী রাধারাণী, যাঁর অঙ্গকান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো, যিনি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, যিনি মহারাজ বৃষভানুর দুহিতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, তাঁর চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

বৃন্দায়ৈ তুলসী-দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তি-প্রদে দেবী! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

হে বৃন্দাদেবী, শ্রীমতি তুলসী মহারাণী, তুমি ভগবান কেশবের (শ্রীকৃষ্ণ) অত্যন্ত প্রিয়, বিষ্ণুভক্তি প্রদানকারিনী। তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর এবং শ্রীবাস আদি গৌরভক্তবৃন্দের চরণকমলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥



পরিশিষ্ট - ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে করুণাময় অবতার

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু



শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কে

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, যিনি আজ থেকে পাঁচশ বছর পূর্বে এই পৃথিবী গ্রহে কলিযুগের যুগাবতার রূপে আবির্ভূত হন। তাঁর অবতরণের অন্যতম বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের দিব্যনাম-সমন্বিত মহামন্ত্র *"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"* সমবেত ভাবে সংকীর্তনের মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তি, ভগবৎ-প্রেম লাভের পন্থা সারা পৃথিবীতে প্রচার করা। অন্য কথায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, যিনি কিভাবে কৃষ্ণকে ভালবাসতে হয় তা জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আবির্ভূত হন। তিনি প্রকৃতপক্ষে ঠিক একজন শিক্ষকের মতো, যিনি তাঁর ছাত্রকে লিখতে অপারগ দেখে স্বয়ং পেন্সিলটি ধরে লিখে দেখান, "এইভাবে লেখ — ক, খ, গ।" কোন শিক্ষক যখন এইভাবে লেখেন, তখন ভাবা উচিত নয় যে ঐ শিক্ষক নিজে ক, খ লেখা অভ্যাস করছেন — সেটি মূর্খতা। তেমনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন, তবুও আমাদের জানতে হবে তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। ভক্তাবতার রূপে তিনি আমাদের ভগবৎ প্রেমভক্তি শিক্ষা দিচ্ছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতার শাস্ত্রপ্রমাণ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও স্বয়ং কখনো ঘোষণা করেন নি যে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, বৈদিক শাস্ত্রসমূহে সেই গূঢ় রহস্য তাঁর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কলিযুগে কেমন রূপে ও কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হবেন, পাঁচ হাজার বছর পূর্বেই শ্রীমদ্ভাগবতে তা সুন্দরভাবে ঘোষিত হয়েছে ঃ

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।

"এই কলিযুগে, সুমেধা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অবিরাম কৃষ্ণ-কীর্তনকারী ভগবানের অবতারকে আরাধনা করার জন্য সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যদিও তাঁর গায়ের বর্ণ অ-কৃষ্ণ, তবুও তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি তাঁর সঙ্গী, সেবক, অস্ত্র এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদে পরিবৃত।" — শ্রীমদ্ভাগবত: ১১/৫/৩১

কিন্তু আমরা যদি মেনে নিই যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, তখনও প্রশ্ন উঠতে পারে, *"কেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই রূপে আবির্ভূত হন?"* উত্তর হচ্ছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের পতিত অধম মানুষদের কাছে অত্যন্ত উদারভাবে নির্বিচারে ভগবৎপ্রেম বিতরণ করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে, ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন পাঁচ হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তিনি তাঁর মনোহর রম্যাতিরম্য বৃন্দাবনলীলা প্রকাশ ও ভগবদ্গীতার শিক্ষাপ্রদান দ্বারা এই ধরণীকে ধন্য করেন। কিন্তু কালের গতির সাথে সাথে মানুষের পক্ষে তাঁর দিব্য লীলা ও দিব্য বাণী হৃদয়ঙ্গম করা ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠতে থাকে। বর্তমান যুগ, কলিযুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারমার্থিক চিন্তা-চেতনার অবক্ষয়, সেজন্য কালক্রমে মানুষ ভগবদ্গীতায় প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে থাকে।

এছাড়াও এই যুগের দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষ পারমার্থিক জীবনে আত্মশোধনের জন্য কঠোর তপশ্চর্যা অনুশীলনে অক্ষম। এই যুগের এইসব অধঃপতিত জীবসমূহকে উদ্ধার করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় আবির্ভূত হন, কিন্তু এ-সময় তাঁর নিজ শুদ্ধ ভক্তের ছদ্মাবরণে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রদত্ত দিব্যনাম কীর্তনের পন্থা কেবল সহজসাধ্যই নয়, পারমার্থিক পূর্ণতা লাভের, জীবনের চরম সার্থকতা লাভের জন্য যত অধ্যোত্মিক পন্থা আছে, প্রেমপূর্ণ কীর্তনের এই পন্থা তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম। ভক্তিযোগের সর্বোচ্চ পন্থা কেবল ভগবানই প্রদান করতে পারেন — অন্য কেউ নয়, আর এই জন্য ভগবান স্বয়ং ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন। তিনিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে করুণাময় রূপ, করুণাঘনবিগ্রহ। সেইজন্য কেউ যদি তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন, তাঁকে একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব, বা একজন সমাজ সংস্কারক বা দার্শনিক মনে করেন, তবুও তিনি যদি শ্রীচৈতন্যদেব-প্রদত্ত দিব্যনাম কীর্তনের পন্থা গ্রহণ করেন, তিনি তাঁর জীবনে সর্বোত্তম কল্যাণ লাভ করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে প্রায় কিছুই না জেনেও সারা পৃথিবীর মানুষ অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্তিত সংকীর্তন আন্দোলনে যোগদান করেছেন, নৃত্য, কীর্তন ও প্রসাদ গ্রহণ করছেন। হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের উত্তরোত্তর প্রসারের সাথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী 'পৃথিবীর সমস্ত নগর ও গ্রামে দিব্যনাম কীর্তিত হবে' — খুব দ্রুত সফল হচ্ছে; আজ সারা পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের কাছে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম সুপরিজ্ঞাত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর
সংক্ষিপ্ত জীবনী ও শিক্ষা

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক ২০শে আগষ্ট, ১৮৯৬ সালে রচিত, "Sri Chaitanya Mahaprabhu : His Life and Precepts" শীর্ষক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব

১৪০৭ শকাব্দের ২৩শে ফাল্গুন ঠিক সূর্যাস্তের অবসানে সন্ধ্যার গোধুলি বেলায় নদীয়া নগরের শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। ইংরাজী বর্ষ অনুযায়ী এটি ছিল ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী। সেই দিনটিতেই ছিল চন্দ্রগ্রহণ, এবং চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী নদীয়াবাসীগণ উচ্চৈঃস্বরে 'হরিবোল', 'হরিবোল' ধ্বনি দ্বারা ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে অবগাহন করছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, এবং তাঁর মাতা শচীদেবী ছিলেন একজন আদর্শ রমণী। তাঁরা উভয়েই ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত, এবং তাঁদের আদি নিবাস ছিল সিলেট জেলায়। শৈশব থেকেই মহাপ্রভু ছিলেন অনুপম সুন্দর, এবং তাই পুরনারীরা নানা উপহার নিয়ে তাঁকে দেখতে আসত। সেই সময় তাঁর মাতামহ, বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কালক্রমে এই শিশু এক বিরাট মহাপুরুষে পরিণত হবে। তাই তিনি শিশুর নামকরণ করেন বিশ্বম্ভর, এবং তাঁর গায়ের রঙ সুবর্ণের মত হওয়ায় প্রতিবেশী মহিলারা প্রীতিভরে তাঁকে 'গৌরহরি' বলে ডাকতেন, আর নিম গাছের সন্নিকটে জন্মগ্রহণ করায় শচীদেবী তাঁকে 'নিমাই' বলে ডাকতেন। অপরূপ এই শিশুটিকে ভালবেসে সকলেই প্রতিদিন তাঁকে দেখতে আসত। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিমাই এক খেয়ালী ও চপল মতি বালকে পরিণত হন। পাঁচ বছর বয়সে পাঠশালায় প্রবেশ করে তিনি স্বল্পকালের মধ্যেই বাংলা শিক্ষা সম্পন্ন করেন।

তাঁর শৈশবলীলা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালীন অধিকাংশ জীবনীকারগণ তাঁর শৈশবের সরল ও সহজ, কিন্তু অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। কথিত আছে যে, শৈশবে মাতৃক্রোড়ে তিনি অবিরামভাবে ক্রন্দন করতেন, এবং প্রতিবেশী মহিলারা 'হরিবোল', 'হরিবোল' বলে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করলে তিনি ক্রন্দন থেকে বিরত হতেন। এইভাবে অবিরাম স্বগৃহে 'হরিবোল', কীর্তন দ্বারা ভবিষ্যতে তাঁর 'হরিনাম' প্রচারের নায়কত্ব প্রকাশিত হয়। এক সময় তাঁর মাতৃদেবী নিমাইকে মিষ্টদ্রব্য প্রদান করলে, নিমাই ঐ মিষ্টদ্রব্যের পরিবর্তে মৃত্তিকা ভক্ষণ করতে থাকেন। মাতা এইরকম কার্যের কারণ জিজ্ঞাসা করলে নিমাই বলেন যে, সকল মিষ্টদ্রব্যই মৃত্তিকার রূপান্তর, তাই তিনি মৃত্তিকাও ভক্ষণ করতে পারেন। পণ্ডিত-পত্নী হওয়ায়, তাঁর মাতা ব্যাখ্যা করে বলেন যে, সকল বস্তুই বিশেষ অবস্থায়, বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। কুঁজোর আকারে মাটি, জলের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হয়, সেই মাটিই আবার যখন ইঁটের আকারে রয়েছে তখন জলের পাত্ররূপে তা অব্যবহার্য। তাই মিষ্টদ্রব্য অবস্থায় মাটি আহার্য হলেও, অন্য অবস্থায় মাটি আহার্য নয়। এইকথা শুনে বালক নিমাই তাঁর ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করলেন, এবং মাটি খাওয়ার জন্য নিজ নির্বুদ্ধিতা স্বীকার করলেন ও ভবিষ্যতে এইরকম ভ্রম পরিহারে স্বীকৃত হলেন।

মহাপ্রভুর আর একটি আশ্চর্যজনক লীলা এই যে, একদা তীর্থ ভ্রমণরত এক ব্রাহ্মণ তাঁদের বাড়ীতে অতিথি হয়ে ভোগান্ন রন্ধন করে, কৃষ্ণকে ধ্যান করে নিবেদন করলে, বালক নিমাই সেখানে গিয়ে সকল ভোগান্ন খেতে থাকেন। ব্রাহ্মণ বালকের এইরকম কাজ দেখে হতবাক্ হন, এবং শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের অনরোধে পুনরায় রন্ধন করেন। ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ ধ্যান করে ভোগান্ন নিবেদন করার সময় বালক আবার তা খেতে থাকেন। ফলে ব্রাহ্মণকে তৃতীয়বার রন্ধন করতে অনুরোধ করা হয়। এইবার গৃহের সকলে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েন, এবং বালক নিজ কৃষ্ণরূপ ব্রাহ্মণের কাছে প্রকাশ করেন ও তাঁকে আশীর্বাদ করেন। তখন নিজ ইষ্টদেবের আবির্ভাবে ব্রাহ্মণ ভগবদ্‌ভাবে আপ্লুত হন। এ ছাড়াও আরো জানা যায় যে, একবার দু'টি চোর তাঁকে অলঙ্কার অপহরণের উদ্দেশ্য গৃহদ্বার থেকে নিয়ে যায়, এবং পথে তাঁকে মিষ্টদ্রব্য প্রদান করে। বালক তাঁর মায়াশক্তি দ্বারা চোর দু'টিকে এমনভাবে আবিষ্ট ও বিভ্রান্ত করে যে, তাঁদেরকে তাঁর গৃহাভিমুখে নিয়ে আসে। ধরা পড়ার ভয়ে চোর দু'টি তখন বালককে সেখানে পরিত্যাগ করে পলায়ন করে। অন্য একটি অদ্ভুত কাহিনী হচ্ছে এই যে, একবার একাদশীর দিনে হিরণ্য ও জগদীশের কাছ থেকে কৃষ্ণপূজার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত সকল নৈবেদ্য বালক দাবী করে গ্রহণ করেন। আর একবার বালক নিমাই চার বছর বয়সের সময় 'পরিত্যক্ত রন্ধনপাত্র অশুচি' — মাতার এই কথা শুনেও সেখানে উপবিষ্ট হন এবং তিনি মাতাকে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, বিষ্ণুর ভোগ রন্ধনের পর পরিত্যক্ত মৃৎপাত্রের অশুচিতা ও শুচিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এইসব কাহিনীই পাঁচ পছর পর্যন্ত তার বাল্যলীলার ঘটনা।

নিমাই পণ্ডিত ঃ অসামান্য প্রতিভাধর

তিনি আট বছর বয়সে মায়াপুরের সন্নিকটে গঙ্গানগরে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি হন। মাত্র দুই বৎসর সময়ের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণাদিতে পারদর্শী হন, এবং স্বগৃহেই আত্ম-অনুশীলনরূপ পাঠাভ্যাস করেন। তিনি গৃহে পণ্ডিত পিতার সকল গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থই দেখতে পান। মনে হয় তখন তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির অধীনে পাঠরত বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে স্বয়ং স্মৃতি ও ন্যায় অধ্যয়ন করেন।

দশ বছর বয়ঃক্রমের পর তিনি ন্যায়, স্মৃতি ও ব্যাকরণাদিতে পণ্ডিত বলে পরিচিত হন। এরপরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। তখন অল্পবয়স্ক মহাপ্রভু তাঁর পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ভগবানের সন্তোষ বিধানের জন্য তিনি তাঁদের সেবা করবেন। ঠিক তারপরেই তাঁর পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। মাতা

শোকে অত্যন্ত কাতরা হলে, মহাপ্রভু তাঁর স্বাভাবিক সৌম্যমূর্তিতে বিধবা মাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

যৌবনের প্রারম্ভেই মহাপ্রভু এই নদীয়ারই শ্রীবল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। এই সময় তিনি সংস্কৃত ও ন্যায় দর্শনের পীঠস্থান রূপে বিখ্যাত নদীয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে পরিগণিত হন। সেই সময় নৈয়ায়িকরাও সকলে শাস্ত্রালোচনায় তাঁর সম্মুখীন হতে ভয় পেতেন, আর স্মার্ত পণ্ডিতদের কথা তো বলাই বাহুল্য। গৃহস্থ হওয়ার পর ধনোপার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশে যান। সেখানে নিজ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে তিনি বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করেন। এই সময়ই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'বৈষ্ণবতত্ত্ব' প্রচার শুরু করেন, এবং 'বৈষ্ণবতত্ত্ব' শিক্ষা দান করে তিনি শ্রীতপন মিশ্রকে বারাণসীতে বসবাস করতে আদেশ দেন। বাংলাদেশে অবস্থান কালেই তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবী বিরহ-সর্পাঘাতে ইহলোক ত্যাগ করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তিনি মাতাকে শোকাতুরা দেখে মানব-জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে বর্ণনা করে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। মাতার অনুরোধেই তিনি পুনঃ রাজ পণ্ডিত শ্রীসনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর বন্ধুবর্গও তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর এতই খ্যাতি ছিল যে, তিনি তখন নদীয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে গণ্য হয়েছিলেন। সে সময় কাশ্মীরের কেশব মিশ্র নিজেকে দিগ্বিজয়ী বলে পরিচয় দিতেন, এবং পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনার উদ্দেশ্যে তিনি তখন নদীয়ায় আসেন। এই সময় তথাকথিত বিজয়ী পণ্ডিতের ভয়ে ভীত হয়ে নদীয়ার সকল টোলের অধ্যাপকরা নিমন্ত্রণ রক্ষার অজুহাতে শহর ত্যাগ করে চলে যায়। ফলে মায়াপুরের বারকোনা ঘাটে কেশব কাশ্মীরী মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্বল্পকাল শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং পরাস্ত হন ও অনুতপ্ত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন। নিমাই পণ্ডিত এই ঘটনার পর তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্রায় ষোল-সতের বছর বয়সে কিছু ছাত্রসহ তিনি গয়া যাত্রা করেন, এবং সেখানে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর এক শিষ্য ও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর নদীয়ার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ধর্ম-প্রচারকে পরিণত হন। তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভু ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ তাঁর জন্মের পূর্বেই এই বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করলেও তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই পরিবর্তন ও প্রবলভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারে বিস্ময়াবিষ্ট হন। তখন আর তাঁর মধ্যে সেই পূর্বের তর্কপ্রিয় নৈয়ায়িক, বিতর্ককারী স্মার্ত ও সমালোচক বক্তা নিমাইকে দেখা যেত না। সেই সময় তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম শুনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তেন, এবং ভগবদ্ভাবের আবেশে প্রেমোন্মত্তের মত আচরণ করতেন। প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি গুপ্ত বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর শত শত অনুগামীর সম্মুখে, বিশেষ করে যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বিদ্বান ও পণ্ডিত, তাদেরকে তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে তাঁর দিব্য ও অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন। ঠিক সেই সময়ই তাঁর একনিষ্ঠ সরল অনুগামীদের নিয়ে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহাঙ্গনে তিনি একটি 'নৈশ কীর্তন শিক্ষায়তন' স্থাপন করেন। সেখানে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করতেন, কৃষ্ণকীর্তন ও নৃত্য করতেন এবং নানা ভগবদ্ভাব ব্যক্ত করতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তখন বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করতেন, এবং তিনি ঐ সময় সমগ্র ভারত পর্যটন সম্পূর্ণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যোগদান করেন। বস্তুত বাংলার বিভিন্ন অংশ থেকে একনিষ্ঠ, নিষ্কপট, ঐকান্তিক পণ্ডিত ও বৈষ্ণব প্রচারকমণ্ডলী তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যোগদান করেন। তার ফলে নদীয়া তখন বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের এক পীঠস্থানে পরিণত হয়। সর্বোত্তম ভাবধারায় মানব-সমাজকে কৃষ্ণভাবনাময় করাই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত ও আদর্শ।

প্রথমেই তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরকে এইভাবে আদেশ করেন —

শোন, শোন, নিত্যানন্দ, শোন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥

এইভাবে হরিনাম প্রচারে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর প্রচারে বাহির হন, এবং তাদের জগাই ও মাধাই নামে দুইজন জঘন্য চরিত্রের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তারা মহাপ্রভুর আদেশ শুনে প্রচারকদের অপমান করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভুর দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে, ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়। এই ঘটনায় সকল নদীয়াবাসী বিস্মিত হয়। তখন তারা সকলেই বলতে লাগল "নিমাই পণ্ডিত শুধু এক বিরাট বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভাই নয়, তিনি নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান ভগবানের বাণীর প্রচারক এক বৈকুণ্ঠদূত।" এই সময় থেকে তাঁর তেইশ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত মহাপ্রভু শুধু নদীয়াই নয়, তাঁর এলাকার চতুর্দিকস্থ সকল গুরুত্বপূর্ণ শহর ও গ্রামে এই বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের গৃহে অনেক অলৌকিক ও দিব্যলীলা প্রদর্শন করেন, এবং ভক্তিরহস্য শিক্ষা দান করে ভক্তদের নিয়ে সংকীর্তন করেন। নদীয়ার গ্রামে, গঞ্জে, শহরে সর্বত্রই তাঁর অনুগামীরা পবিত্র 'হরিনাম' সংকীর্তন করতে শুরু করেন। ফলে এক বিরাট আলোড়নের সূত্রপাত হয়, এবং বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাতে বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হন। কিন্তু স্মার্ত ব্রাহ্মণগণ নিমাই পণ্ডিতের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর এই ভাবধারা প্রচারের বিরুদ্ধে অহিন্দু চাঁদ কাজীর কাছে প্রতিবাদ জানান। তখন চাঁদকাজী শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে যান এবং একটি মৃদঙ্গ ভেঙ্গে দিয়ে ঘোষণা করেন যে, নিমাই পণ্ডিত তাঁর উদ্ভট ধর্মানুষ্ঠানের বিরক্তিকর আওয়াজ ও গোলমাল বন্ধ না করলে তিনি নিমাই ও তাঁর অনুগামীদের উপর মুসলমান-ধর্ম আরোপে বাধ্য হবেন। এই ঘটনা মহাপ্রভুকে জানান হলে মহাপ্রভু নদীয়াবাসী সকলকে জ্বলন্ত মশাল সহ সন্ধ্যায় শহরে একত্রে সমবেত হতে আদেশ করেন। এই আদেশ পেয়ে সকলে মহাপ্রভুর নির্দেশ মত কাজ করে, এবং তিনি তখন ১৪টি দলে ভক্তদের বিভক্ত করে তাঁর সংকীর্তন দলকে নিয়ে কাজীর গৃহে উপস্থিত হন ও কাজীর সঙ্গে দীর্ঘ শাস্ত্রালোচনার শেষে কাজীর দেহ স্পর্শ করে তার মধ্যে বিষ্ণুভক্তি সঞ্চার করেন। তার ফলে কাজী ক্রন্দন পূর্বক স্বীকার করেন যে, ভগবদ্ভক্তির অনুভূতির মাধ্যমে তার সকল সংশয় দূরীভূত হয়েছে এবং তার হৃদয়ে ভগবদ্ভাবের উদয়ে তিনি সর্বোচ্চ আনন্দ অনুভব করছেন। অতঃপর কাজী সংকীর্তন দলে যোগদান করেন। এই ঘটনার ফলে ভগবানের দিব্যশক্তি দর্শন করে বিশ্ববাসী বিস্ময়াবিষ্ট হয়, এবং তৎকালীন প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধী শত শত লোক বিশ্বম্ভরের কৃপাছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

<u>সন্ন্যাস গ্রহণ ঃ</u>

এই ঘটনার পর ঈর্ষাকাতর সংকীর্ণমনা কুলিয়ার কিছু ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে একটি দল সংগঠিত করে। স্বাভাবিকভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয় সুকোমল হলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়ব্রত, এবং তিনি ঘোষণা করেন যে, দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতা — এই দু'টি প্রগতির পথে এক বিষম অন্তরায় সৃষ্টি করে। তিনি আরও বলেন যে, যতদিন নদীয়াবাসীরূপে তিনি কোন বিশেষ পরিবারভুক্ত থাকবেন, ততদিন তাঁর জীবনব্রত সম্পূর্ণভাবে সফল হবে না। তাই তিনি তাঁর বিশেষ পরিবার, জাতি, ও সম্প্রদায়গত সম্পর্ক ছিন্ন করে, বিশ্বমানব হতে মনস্থ করেন। এই মনোবাসনা পরিপূর্ণ করবার জন্য তিনি ২৪ বছর বয়সে কাটোয়ায় শ্রীমৎ কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বিরহে তাঁর মাতা শচীদেবী ও স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অত্যন্ত কাতরা হয়ে করুণভাবে ক্রন্দন করেন। কিন্তু সৌম্যমূর্তি, নায়ক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয় কোমল হলেও তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তাই তিনি আপামর পতিত নিখিল বিশ্ব-জীবের উদ্ধারের জন্য অসীম কৃষ্ণলোকের উদ্দেশ্যে স্বীয় ক্ষুদ্র সংসার-জগৎ ত্যাগ করেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে আমন্ত্রিত হন। মাতা শচীদেবী সহ নদীয়ায় তাঁর গুণমুগ্ধ ও সখাদেরও অদ্বৈত আচার্য প্রভু আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। তখন সন্ন্যাসী বেশধারী পুত্রকে দেখে আনন্দে ও বেদনায় মাতৃহৃদয় আলোড়িত হল। ভিক্ষু বেশ-ধারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সেদিন কৌপীন ও বহির্বাস ছাড়া আর পরিধেয় বস্ত্র ছিল না। মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্ত-পুত্র স্নেহার্দ্র মাতৃদেবীর পদতলে পতিত হয়ে বললেন, "মা, এই দেহ তোমার। আমি নিশ্চয় তোমার আদেশ পালন করব। তাই পরমার্থ সাধনের জন্য তুমি আমাকে বৃন্দাবন যাওয়ার

অনুমতি দান কর।" তখন শচীমাতা অদ্বৈত আচার্য প্রভু ও অন্যান্যদের সঙ্গে সে ব্যাপারে পরামর্শ করলেন, এবং যাতে মাঝে মাঝে সন্তানের সংবাদ পান, এইজন্য পুত্রকে শ্রীজগন্নাথপুরীবাসী হতে নির্দেশ দেন। এই প্রস্তাবে মহাপ্রভু রাজী হন, এবং কয়েক দিন পর তিনি শ্রীজগন্নাথপুরীর উদ্দেশ্যে শান্তিপুর ত্যাগ করেন। তাঁর জীবনীকারগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের (সন্ন্যাসের পর তিনি এই নাম প্রাপ্ত হন) শান্তিপুর থেকে পুরী যাওয়ার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবারের বর্তমান থানা মথুরাপরস্থিত ছত্রভোগ পর্যন্ত ভাগীরথীর তীর দিয়ে চলতে থাকেন, এবং সেখান থেকে মেদিনীপুর জেলার প্রয়াগ ঘাট পর্যন্ত তিনি নৌকায় যান। সেখান থেকে বাল'শোর ও কটকের মধ্য দিয়ে পদব্রজে তিনি পুরীতে যান এবং পথে তিনি ভুবনেশ্বর মন্দির দর্শন করেন। পুরীতে উপস্থিত হয়ে তিনি মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করেন, এবং শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এক বিরাট পণ্ডিত। ঐ সময় তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক, এবং তিনি তখন শঙ্কর সম্প্রদায়ের বেদান্ত-দর্শনে বিচক্ষণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক রূপে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি নদীয়ার বিদ্যানগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর টোলে অসংখ্য ছাত্রকে তিনি ন্যায়-দর্শন শিক্ষা দান করেন। নিমাইয়ের জন্মের কিছু পূর্বেই তিনি নদীয়া ত্যাগ করে পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর শ্যালক শ্রীল গোপীনাথ মিশ্র শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে এই নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের রূপে বিমুগ্ধ হয়ে এই নবীন সন্ন্যাসীর পক্ষে তাঁর দীর্ঘ জীবন পথে সন্ন্যাস-ধর্ম রক্ষা করার সম্ভাব্যতায় সংশয় বোধ করেন। নদীয়া থেকে পরিচিত হওয়ায় মহাপ্রভুর প্রতি শ্রীল গোপীনাথ মিশ্রের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাই তিনি ঘোষণা করেন যে, এই সন্ন্যাসী একজন সাধারণ মানব নন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল গোপীনাথ মিশ্র ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মধ্যে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা ও তর্কালোচনা হয়। সার্বভৌম তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা শুনতে অনুরোধ করেন, এবং মহাপ্রভুও নিপুণভাবে তাঁর এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন। ফলে মহাপ্রভু নির্বাকচিত্তে সাতদিনব্যাপী বৈদান্তিক সার্বভৌমের গম্ভীর বেদান্ত-সূত্র-ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। অবশেষে সার্বভৌম মহাপ্রভুকে বলেন, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! আমার মনে হয় আপনি বেদান্ত-সূত্র বুঝতে পারেন না, কারণ আমার বেদান্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনে আপনি কিছুই বলেন না।" তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দেন যে, তিনি বেশ ভালভাবে বেদান্ত-সূত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু তিনি শঙ্করের বেদান্ত-ভাষ্য বুঝতে অক্ষম। তখন বিস্ময়াবিষ্ট সার্বভৌম বলেছিলেন, "আপনি বেদান্ত-সূত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, অথচ সূত্রের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম, সে কি রকম? আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি ঐ সূত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে থাকলে, আমাকে আপনি তা ব্যাখ্যা করে শুনান দেখি?" সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে এই কথা বললে তখন মহাপ্রভু শঙ্করের নির্বিশেষ-বাদপর ভাষ্য স্পর্শ না করেই বেদান্ত-সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। প্রখর জ্ঞানসম্পন্ন সার্বভৌম বেদান্ত-ব্যাখ্যায় মহাপ্রভুর যুক্তির সত্যতা, সৌন্দর্য, সুষমা, ঐক্যতান ও বৈশিষ্ট্য দর্শন করে বলতে বাধ্য হন যে তিনি জীবনে এই প্রথম একজনকে 'ব্রহ্ম-সূত্র' এমন সুন্দর, সহজ ও সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করতে শুনলেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত ব্যাখ্যা যা তিনি মহাপ্রভুর নিকট শ্রবণ করলেন, সেরূপ স্বাভাবিক অর্থ শঙ্করের ব্যাখ্যায় কখনও বিকাশ লাভ করেনি। অতএব তিনি তখনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ পূর্বক তাঁর সমর্থক ও অনুগামী হয়ে পড়েন। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই সার্বভৌম তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবে পরিণত হন। এই সংবাদ প্রকাশিত হলে, সমগ্র উড়িষ্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়গান আরম্ভ হয়, এবং শত শত ভক্ত ভগবদ্-দর্শনে এসে তাঁর শ্রীচরণে আত্ম-নিবেদন করেন, ও কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন।

তাঁর জীবনীকাররা তাঁর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের কথা বর্ণনা করেছেন। সে অনুসারে প্রথমে তিনি কূর্মক্ষেত্রে যান এবং সেখানে বাসুদেব নামক এক কুষ্ঠরোগীকে নীরোগ করে এক আশ্চর্যজনক লীলা প্রদর্শন করেন। এই সময় তিনি গোদাবরীর তীরে, বিদ্যানগরের রাজ্যপাল রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং তার সঙ্গে প্রেমভক্তি প্রসঙ্গে তাত্ত্বিক আলোচনা করেন। তখন দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের বলিরাজ নিধন লীলায় তীরবিদ্ধ সপ্ততাল বৃক্ষকে স্পর্শদ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্ভুতভাবে মুক্ত করেন (তারা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়)। এই যাত্রাপথে তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম ও 'হরিনাম সংকীর্তন'

প্রচার করেন। বর্ষার সময় চারমাস কাল তিনি রঙ্গক্ষেত্রে শ্রীল বেঙ্কটভট্টের গৃহে অবস্থান করেন, এবং সেখানে শ্রীল বেঙ্কটভট্টের একটি দশ বছর বয়সী পুত্র সন্তান সহ তার সমগ্র পরিবারকে রামানুজ বৈষ্ণব থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবে পরিণত করেন। শ্রীল বেঙ্কটভট্টের সেই দশ বছর বয়সের গোপাল নামক পুত্রটি পরবর্তীকালে বৃন্দাবন গমন করেন এবং ষড় গোস্বামীদের অন্যতম ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান সেবক এবং পার্ষদরূপে পরিণত হন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তদীয় পিতৃব্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর কাছে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করে বৈষ্ণব-তত্ত্ব-দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতের 'কন্যাকুমারী' পর্যন্ত অসংখ্য তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন ও ভীমা নদীর তীরে পান্ধারপুর পরিদর্শন করেন, এবং দুই বৎসরে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই পান্ধারপুরে তিনি তুকারাম নামক এক ব্যক্তিকে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করেন। তখন তুকারাম কৃষ্ণভক্তির প্রচার করতেন। তুকারাম রচিত 'আভাঙ্গ'-এ এটি স্বীকৃত হয়েছে। এ বিষয়ে বোম্বায়ের সিভিল সারভিস্-এর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় তা সংগৃহীত হয়েছে। এই পরিভ্রমণের সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ, জৈন ও মায়াবাদীদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করে তাদের বৈষ্ণবে পরিণত করেন।

অতঃপর তিনি জগন্নাথপুরীতে প্রত্যাবর্তন করলে কিছু পণ্ডিত ব্রাহ্মণসহ রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর কৃপাচ্ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন মহাপ্রভুর বয়স মাত্র ২৭ বছর। ২৮ বছর বয়সে তিনি বাংলার মালদহ জেলার গৌড় পর্যন্ত গমন করেন। সেখানে তিনি দুই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ভক্ত, শ্রীরূপ ও সনাতনকে সংগ্রহ করেন। তাঁরা কানাড়ীয় ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁরা হুসেন শার অধীনে চাকুরী করতেন। তাঁদেরকে হুসেন শা 'দবীর খাঁ' ও 'সাকর মল্লিক' উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজ্য শাসনে তাদের আনুগত্য ও সংস্কৃত, আরবী এবং ফারসীতে পাণ্ডিত্যের জন্য উভয়েই গৌড়াধিপতির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই কারণে তাঁরা সমাজচ্যুত হয়েছিলেন বলে পুনঃ সাধারণ হিন্দু-জীবন যাপনে ফিরে যাওয়ার কোন পথ না দেখে, পারমার্থিক সাহায্যের জন্য তাঁরা মহাপ্রভুকে পুরীতে পত্র লেখেন। উত্তরে মহাপ্রভু জানান যে, তিনি তাদের নিকট যাবেন, এবং তাঁদের পারমার্থিক বিপন্নাবস্থা থেকে উদ্ধার করবেন। অতএব যখন মহাপ্রভু গৌড়ে উপস্থিত হন, তখন দুভাই তাঁদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রার্থনা সহ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে উপনীত হন। তখনই মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের জন্য উভয়কে নির্দেশ দেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শান্তিপুর হয়ে আবার পুরী যান, এবং যাবার পথে শান্তিপুরে তাঁর স্নেহময়ী জননী শচীমাতার সঙ্গে আবার তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর পুরীতে স্বল্পকাল অবস্থানের পর তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই সময় তিনি বলভদ্র ভট্টাচার্য নামে একজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে যান, এবং বৃন্দাবন দর্শন করেন ও প্রয়াগে (এলাহাবাদ) গমন করেন। তখন পথে কোরাণের শ্লোক থেকে শিক্ষা দিয়ে তিনি বহু পাঠানকে বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাদের বংশধররা এখনও 'পাঠান-বৈষ্ণব' নামে পরিচিত। তখন শ্রীরূপ গোস্বামী এলাহাবাদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করেন, এবং দশ দিনব্যাপী মহাপ্রভু তাঁকে বৈষ্ণবতত্ত্ব-দর্শন শিক্ষা দেন, এবং এই উদ্দেশ্যে শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি বৃন্দাবন যেতে নির্দেশ দিয়ে তত্ত্বগতভাবে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রথমতঃ ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনা, এবং দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব-জগতের অন্তিম কল্যাণার্থে দ্বাপর যুগের অবসানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দিব্য লীলাস্থলগুলির পুনরুদ্ধার করতে বলেন। অতএব শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে এলাহাবাদ ত্যাগ করেন, এবং মহাপ্রভু বারাণসী যাত্রা করেন। সেখানে তিনি চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্রের গৃহে প্রতিদিন ভিক্ষা গ্রহণ করতেন। এখানেই শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন, এবং পরমার্থ বিষয়ে দুই মাস শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনীকার, বিশেষভাবে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপ ও সনাতনের শিক্ষা সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর সমকালীন লেখক নন। কিন্তু মহাপ্রভুর মুখ্য শিষ্য গোস্বামীদের কাছ থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রীরূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী ষট-সন্দর্ভ নামে এক অমূল্য গ্রন্থ আমাদের দান করে গেছেন। এই গ্রন্থে তিনি

মহাপ্রভুর তত্ত্ব-দর্শন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে গেছেন। আমরা ঐ সমস্ত মহান ভগবৎ-পার্ষদদের গ্রন্থ থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সংগ্রহ করে তা সংক্ষেপে প্রকাশ করছি।

বারাণসীতে অবস্থানের সময় সেখানকার এক মারাঠী ব্রাহ্মণের গৃহে আমন্ত্রিত সকল জ্ঞানী-সন্ন্যাসীদের সমাবেশে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ও শাস্ত্র আলোচনা হয়। এই সাক্ষাৎকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক লীলা দর্শনে সন্ন্যাসীরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং তখন মহাপ্রভুর সঙ্গে তাদের শাস্ত্র বিচার হয়। ঐ সন্ন্যাসীদের নেতৃত্ব করছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী প্রাকাশানন্দ সরস্বতী। স্বল্পকাল বিতর্কের পর তারা মহাপ্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করেন, এবং বলেন যে, শঙ্কর-ভাষ্য দ্বারা তারা বিভ্রান্ত হয়েছেন। দীর্ঘ সময় মহাপ্রভুর সঙ্গে বিরোধিতা করা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের পক্ষেও অসম্ভব ছিল, কেননা মহাপ্রভুর মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে তাদের হৃদয় স্পর্শ করত, তাদের অন্তর দ্রবীভূত হত, পারমার্থিক উন্নতির জন্য তাঁরা ক্রন্দন করত। তাই সন্ন্যাসীরা মহাপ্রভুর চরণে পতিত হয়ে যখন তাঁর অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দেন, এবং তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চার করেন। ফলে, তারা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিত্যাগ করেন। সন্ন্যাসীরা আশ্চর্যজনকভাবে বিষ্ণুভক্তে পরিণত হওয়ায় সমগ্র বারাণসীবাসী বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করেন, এবং তাঁদের নব্য নেতা মহাপ্রভুকে নিয়ে তারা এক মহা হরিনাম সংকীর্তনের অনুষ্ঠান করেন। অতঃপর শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করে, পার্ষদ বলভদ্র সহ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মহাপ্রভু আবার পুরী যান। এই সময়ে পথে মহাপ্রভু বেশকিছু অদ্ভুত লীলা প্রদর্শন করেন। তাহল, মহাপ্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম কীর্তন শুনে বনের বাঘ হাতীরাও নৃত্য করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এইসকল লীলার কথা শ্রীল বলভদ্র প্রভুর বর্ণনা থেকে জানা যায়।

তখন থেকে অর্থাৎ একত্রিশ বছর বয়স থেকে আটচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ টোটা গোপীনাথের মন্দিরে অন্তর্ধান লীলা পর্যন্ত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীতে কাশী মিশ্রের গৃহেই সর্বদা বাস করতেন। এই ১৮ বছর তাঁর কৃষ্ণবিরহে অতিবাহিত হয়েছিল। তখন তিনি অসংখ্য ভগবদ্ভক্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। এই সকল ভক্তগণ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, যাঁরা সাধারণের তুলনায় সকলেই ছিলেন নির্মল চিত্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ, ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিন্ময় প্রেমে ভাবাবিষ্ট। মহাপ্রভুর নদীয়ায় অবস্থানকালে পুরুষোত্তম আচার্য নামে খ্যাত শ্রীস্বরূপ দামোদর বারাণসীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন, এবং তাঁর সচিবরূপে তাঁর সেবা লাভ করেন। সুতরাং বিশুদ্ধ ও তত্ত্বানুগ বলে শ্রীস্বরূপ দামোদরের দ্বারা স্বীকৃত না হলে কোন দার্শনিক বা কবির কোন রচনা বা প্রবন্ধই মহাপ্রভুর কাছে উত্থাপিত হত না। রায়-রামানন্দ ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় সঙ্গী। ভগবদুপাসনার কোন বিশেষ প্রসঙ্গে মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হলে তিনি ও স্বরূপ দামোদর উভয়েই তাঁকে শাস্ত্র থেকে স্তব ও বন্দনাদি পাঠ করে শোনাতেন। পরমানন্দ পুরী ছিলেন তাঁর ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা। বিভিন্ন জীবনীকারগণ তাঁর শত শত অদ্ভুত লীলা বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতে তা এখানে পুনরায় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তখন মহাপ্রভু নিদ্রা যেতেন অতি অল্প। দিবারাত্র তিনি ভাবাবেশে অপ্রাকৃত রাজ্যের সুদূর দেশে চলে যেতেন, এবং তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তমণ্ডলী তাঁকে পরিবেষ্টন করে এইসব অত্যদ্ভুত দিব্য লীলাবলী দর্শন করতেন। সে সময় তিনি কৃষ্ণোপাসনা করতেন, বৃন্দাবনে ভগবৎ-প্রেম প্রচারকদের পত্রের মাধ্যমে উপদেশ দিতেন, এবং সাক্ষাৎ-প্রার্থী নতুন পরমার্থীদের কৃষ্ণোপদেশ করতেন। তিনি নৃত্য, গীতের মাধ্যমে ভাবাবিষ্ট হয়ে সমাধিস্থ হতেন। যাঁরা তাঁকে দর্শন করতেন তাঁদেরই দৃঢ় বিশ্বাস হত যে, মানব-জাতির আত্যন্তিক কল্যাণ সাধনের সর্বাঙ্গসুন্দর ভগবান স্বয়ং এই ধরাধামে অবতরণ করেছেন। তিনি তাঁর মাতাকে ভালবাসতেন, এবং যারা নদীয়ায় যেত তাদের সঙ্গে প্রায়ই তিনি তার মাতার জন্য মহাপ্রসাদ প্রেরণ করতেন। তাঁর স্বভাব অত্যন্ত মধুর ছিল। তিনি ছিলেন দৈন্যতার মূর্ত প্রতীক। যেই তাঁর সংস্পর্শে আসত তাঁর মাধুর্যমণ্ডিত সেই শ্রীরূপ দর্শনে আনন্দ লাভ করত। তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে বাংলায় ভগবৎ-প্রেম প্রচারে নিয়োগ করেন এবং উত্তরে ভগবৎ-প্রেম প্রচারের জন্য তিনি তাঁর বৃন্দাবনের ছয় জন শিষ্যকে (গোস্বামীকে) প্রেরণ করেন। যাঁরা পূত ভগবৎ-ভাবনাময় জীবন থেকে সরে গিয়ে বিপথগামী হয়, সেই সকল শিষ্যকেই তিনি শাস্তি দান করেন। ছোট হরিদাসের

ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তিনি এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। যারা তাঁর নিকট যথার্থভাবে আর্তি প্রকাশ করত, তাদের উপযুক্ত উপদেশ প্রদানে তিনি কখনও কুণ্ঠা বোধ করতেন না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শিক্ষা দানের সময় এটি পরিলক্ষিত হয়। (বড়) হরিদাসের প্রতি তাঁর ব্যবহার, সমস্ত ভগবদ্ভক্তের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ প্রকাশ এবং পারমার্থিক ভ্রাতৃত্বে জাতি ও বৈষম্যের প্রতি তাঁর বিরোধী মনোভাব প্রকাশিত হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা

কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করতে তাঁর শিষ্যদের মহাপ্রভু উপদেশ প্রদান করেন। তাঁর অনুগামীরা আজ পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেওয়া এই তত্ত্ব-দর্শন যেমন বিশদ তেমনই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত শ্রীচৈতন্য-জীবন-দর্শন বৃহত্তম, অভ্রান্ত ও গুরু-পরম্পরানুগ হওয়ায় সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ। যৌবনে পাণ্ডিত্যের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিখ্যাত হলেও, তিনি **'শিক্ষাষ্টক'** নামে আটটি মাত্র শ্লোক রচনা করে গেছেন। এই অপূর্ব আটটি শ্লোকের মধ্যে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তিম শিক্ষা ও তাঁর জীবন-দর্শন প্রকাশিত হয়েছে। এই অমূল্য শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল।

১

চিত্তরূপ দর্পণের পরিমার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্রের বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন স্বরূপ এবং সর্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

২

হে ভগবান! তোমার পবিত্র নামই কেবল সকল মঙ্গল বিধান করতে পারেন; এইজন্য 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' আদি তোমার লক্ষকোটি নাম আছে। এই নামে তুমি তোমার সর্বশক্তি অর্পণ করেছ। এই নাম কীর্তনের জন্য তুমি কোন বিশেষ বিধি-নিষেধ পর্যন্ত রাখনি। হে প্রভু! জীবের জন্য এরূপ কৃপা করে তুমি তোমার নামকে সুলভ করেছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দৈব এরূপ করেছে যে, তোমার সুলভ নামে আমার অনুরাগ জন্মাতে দেয় না।

৩

যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপর লোককে সম্মান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্তনের অধিকারী।

৪

হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমি কেবল এই প্রার্থনা করি যে, জন্মে জন্মে তোমাতেই যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

৫

হে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য-কিঙ্কর হয়েও স্বকর্ম বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হয়েছি, তুমি কৃপাপূর্বক আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ চিন্তা কর।

৬

হে নাথ! তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হবে? বাক্য নিঃসরণ কালে বদনে গদ্গদ-স্বর নির্গত হবে, এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকিত হবে?

৭

হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'-সকল 'যুগ'বৎ বোধ হচ্ছে। চক্ষু থেকে অশ্রুবর্ষিত হচ্ছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হচ্ছে।

৮

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুন অথবা অদর্শন দ্বারা মর্মাহতই করুন, তিনি আমার সঙ্গে যেরূপ আচরণই করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, তিনি আমারই প্রাণনাথ।



হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

পরিশিষ্ট - ৩

চিন্ময় জগতের দূত

পৃথিবী যখন দ্বন্দ্ব, সংঘাত, যুদ্ধ, সন্ত্রাসে বিক্ষুব্ধ, তিমির রাত্রির অবসানে প্রভাতকিরণছটার প্রকাশের মতো অপ্রাকৃত জগতের বাণী বহন করে নিয়ে এলেন চিন্ময় জগতের দূত, শ্রীল প্রভুপাদ। ভগবদ্বিমুখ অন্ধ জড়বাদী মানবসমাজে সৃষ্টি করলেন এক পারমার্থিক নবজাগরণের এক ইতিহাস।

গুরুদেবের আদেশ লাভ

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কোলকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯২২ সালে কোলকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘের) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে সারা বিশ্বে ইংরাজী ভাষায় বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগার বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি এককভাবে একটি ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকা '*Back To Godhead*' প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমনকি তিনি নিজের হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে নানা ভাষায় তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

জীবনব্রত সাধনের প্রস্তুতি

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ' তাঁকে "ভক্তিবেদান্ত" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বাণপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

তাঁর গুরুদেবের আদেশ পালন

শ্রীশ্রী রাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি অপ্রাকৃত মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ-কর্মের সূচনা করেন। এখন সেটি ১৮টি বিপুলায়তন খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে সারা পৃথিবীতে বিতরিত হচ্ছে ও কৃষ্ণ-চেতনার উন্মেষ সাধন করছে।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকায় নিউইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক



কৃষ্ণভাবনামৃতচ সংঘ বা ইসকন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম। বিশ্বের সমস্ত দেশের বুদ্ধিশীল মেধাবী তরুণ তরুণীরা এই আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করতে থাকেন।

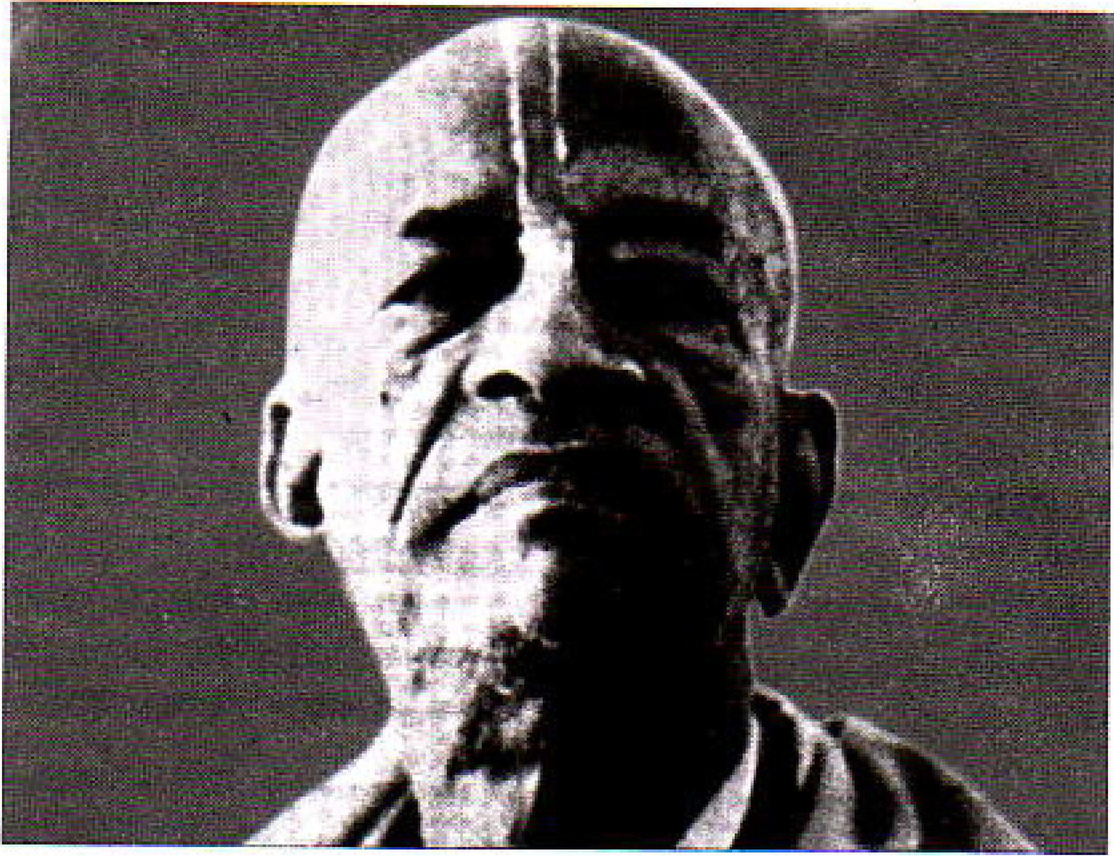
১৯৬৮ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হল তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী আধুনিক, কিন্তু গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজের তাঁর রচনাবলী অত্যন্ত সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্যসহ ইংরাজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন। বিশ্বের নানা ভাষায় তা অনূদিত হয়েছে।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় পনের শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার বিশ্ব-মুখ্য কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানে ৫০ হাজার ভক্ত সমন্বিত এক বৈদিক নগরীর তিনি সূচনা করেন। এখানে বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন। তাঁর সবচেয়ে বিস্ময়কর পরিকল্পনা রূপায়িত হতে চলেছে শ্রীমায়াপুরে। ৩৬ তলা সমান উঁচু বৈদিক গ্রহমণ্ডল মন্দির হবে পৃথিবীর এক আশ্চর্য স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন, এবং পৃথিবীর মানুষকে মহাপ্রভুর বাণী গ্রহণে আকৃষ্ট করবে।

১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচার-সূচীর পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত ৮০টি গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে। তিনি এই জড়বাদী ইন্দ্রিয়তৃপ্তি কেন্দ্রিক সভ্যতায় এক নূতন জীবন-প্রণালী, এক পরিশুদ্ধ সুন্দর পবিত্র জীবনধারা সারা পৃথিবীতে প্রবর্তন করে গিয়েছেন, যা আধুনিক বিশ্বে এক নূতন পারমার্থিক রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূত্রপাত করেছে। এটি মহীরূহের আকার গ্রহণ করে পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত হবে, পৃথিবীর মানুষ হবে প্রকৃতই সুখী — শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।



শ্রীল প্রভুপাদের অবিস্মরণীয় অবদানের কিছু দৃষ্টান্ত

★ সারা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের প্রধান প্রধান শহর-সহ বিভিন্ন স্থানে প্রায় পাঁচশোর বেশি কেন্দ্র, মন্দির, কৃষি খামার।

★ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন গ্রহণ করছেন; কদভ্যাস ত্যাগ করে ভক্তিযোগ অনুশীলন করছেন (আনন্দবাজার 'পত্রিকায় প্রকাশিত একটি তথ্য অনুসারে শুধু আমেরিকাতেই এই সংখ্যা কয়েক লক্ষ)।

★ নিউইয়র্কের 'ভক্তিবেদান্ত আর্কাইভ্‌স'-এ সংগৃহীত হয়েছে শ্রীর প্রভুপাদের নানা সময়ে নানা দেশে প্রদত্ত ২৫০০ ঘন্টার ইংরাজী অডিও ভাষণ, ৪৬ ঘন্টা ভিডিও, ৩০ হাজারেরও বেশি নানা শিল্পীর অঙ্কিত কৃষ্ণভাবনাময় চিত্রকর্ম ছবি।

★ শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য ভাষ্য-সমন্বিত ইংরাজী ভগবদ্গীতা অ্যাজ ইট ইজ এখন ১০৩ টি ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলে পৌঁছাচ্ছে। ১৯৯৬ সালের পূর্বেই পাঁচ কোটিরও বেশি সংখ্যায় বিতরিত হয়ে ইতিমধ্যেই 'ভগবদ্গীতা আজ ইট ইজ' পৃথিবীর বেস্ট সেলার হিসাবে গিনেস বুকে স্থান করে নিয়েছে। পৃথিবীর বহু নামী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বইটি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

★ শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় সে 'ভক্তি বেদান্ত বুক ট্রাষ্ট' বা বি. বি. টি থেকে, সেটি এখন পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাকশনা সংস্থা।

সারা পৃথিবীতে ইস্কন মন্দির, কেন্দ্র, কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের সাম্প্রতিকতম খবরাখবর, তথ্যাদি, জানতে ইন্টারনেটে ইসকনের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট www.krisna.com দেখুন। এর থেকে ইসকনের আরও অনেক আকর্ষণীয় ওয়েবসাইটের ঠিকানা পাওয়া যাবে।

পরিশিষ্ট - ৪

চৈতন্য উপনিষদ

অথর্ববেদ থেকে গৃহীত

শ্লোক-১

অথ পিপ্পলাদঃ সমিৎপাণির্ভাগবতম্
ব্রহ্মাণম্ উপাসন্নো, ভগবান মে
শুভম কিং অত্র চক্ষস্বেঃ।

একবার ঋষি পিপ্পলাদ ব্রহ্মার নিকটে গিয়ে করজোড়ে বললেন, "ভগবান, অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন — এই জগতে কি আমার পক্ষে শুভ, কল্যাণপ্রদ?"

শ্লোক-২

সহোবাচ ঃ ভূয় এব তপস্যা
ব্রহ্মচর্যন শশ্বৎ রমস্ব মনো বশেঃ।

ব্রহ্মা ভগবৎ-নিষ্ঠ পিপ্পলাদকে উপদেশ দিয়ে বললেন যে তিনি ব্রহ্মচর্যরূপ তপো আচরণ করবেন এবং ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনকে বশীভূত করার জন্য কিছু স্বেচ্ছাকৃত কঠোরতা স্বীকার করবেন। মনঃসংযমের মধ্যে রয়েছে মনকে জড় জাগতিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-প্রয়াস হতে প্রত্যাবৃত্ত করে পরমার্থ চিন্তায় নিয়োজিত করা। এভাবেই মন অবাঞ্ছিত জড়-কলুষ হতে বিশোধিত হয়।

শ্লোক-৩ ও ৪

"স তথা ভূৎনা ভূয় এনম্
উপসন্নাহ ঃ ভগবন্, কলম্
পাপাচ্ছন্নঃ প্রজাঃ কথম্
ম্যেচ্ছেরন্নেতি। কো বা দেবতা কো বা মন্ত্রো ব্রুহেতি?"

উপদেশমত সব কিছু সম্পন্ন করার পর ঋষি পিপ্পলাদ পুনরায় উপদেষ্টা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন, "হে গুরুদেব, কলিযুগে মানুষ কিভাবে পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে? তাঁরা ভগবানের কোন্ বিশেষ অবতারের আরাধনা করবে? এজন্য তাঁরা কোন মন্ত্র ব্যবহার করবে?"

শ্লোক-৫

সহোবাচ ঃ রহস্যং তে বদিষ্যামি।
জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলকাখ্যে ধামে গোবিন্দ দ্বিভূজো
গৌরঃ সর্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা
মহাযোগী ত্রিগুণেতি তঃ সত্ত্বরূপো
ভক্তিং লোকে কস্যতিন্। তদেতি শ্লোক ভবন্তি।

ব্রহ্মা বললেন, "আমি তোমাকে সেই রহস্য বলব। গোলক নামে খ্যাত নবদ্বীপ ধামে জাহ্নবীতীরে ভগবান শ্রীগোবিন্দ ত্রিগুণাতীত সর্বাত্মা মহাযোগী মহাপুরুষ মহাত্মা দ্বিভূজ গৌর রূপে অবতীর্ণ হবেন। নিত্য শাশ্বতস্বরূপে সেই ভগবান পৃথিবীতে ভক্তিরহস্য প্রকাশ করবেন। এ-বিষয়ে আরো বহুসংখ্যক শ্লোক রয়েছে।"

শ্লোক-৬

একো দেবঃ সর্ব রূপে মহাত্মা
গৌর রক্তং শ্যামলশ্বেত রূপঃ
চৈতন্যাত্মা স বৈঃ চৈতন্যশক্তি —
ভক্তকরো ভক্তিদ ভক্তিবেদ্যঃ।"

"সেই এক অদ্বয় পরমেশ্বর ভগবান গৌররূপে অবতীর্ণ হন — পূর্বে যিনি রক্ত, পীত ও শ্বেত কান্তি পরিগ্রহ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভগবান তাঁর এই আদি শ্রীচৈতন্য রূপে তিনি সকলের চেতন শক্তি; তিনি ভক্তির মূর্তবিগ্রহ, তিনি ভক্তিদাতা, তিনিই আবার ভক্তিবেদ্য এবং তিনি সর্বজ্ঞ।"

শ্লোক-৭

নমো বেদান্তবেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
সর্বচৈতন্যরূপায়ঃ চৈতন্যায় নমো নমঃ॥

"সমগ্র চৈতন্যশক্তির প্রতিমূর্ত বিগ্রহ, সকলের পরমাত্মা, চৈতন্য-স্বরূপে প্রকাশিত বেদান্তবেদ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি বার বার আমার প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্লোক-৮

বেদান্তবেদ্যং পুরুষং পুরাণং
চৈতন্যাত্মানং বিশ্বযোনিং মহান্তম্।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়॥

"সেই পুরাণ পুরুষ বেদান্তসমূহের জ্ঞেয়, সমগ্র মহাবিশ্ব প্রকাশের উৎস, বিশ্বযোনি মহাত্মা হচ্ছেন শ্রীচৈতন্যদেব। একমাত্র সেই পুরুষকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, এছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই।"

শ্লোক-৯ ও ১০

স্বনামং মূল মন্ত্রেণ সর্বং হ্লাদ্যতি বিদুঃ।
স্বে শক্তি পরমে তস্য হ্লাদিনী সংবিদেব চ ইতি॥

"পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিজ দিব্য নামসমূহ দিয়ে গঠিত মন্ত্রের (মহামন্ত্র) দ্বারা সর্বজীবকে চিন্ময় দিব্যানন্দ আস্বাদন করান। তিনি দুইটি চিন্ময় স্বরূপ শক্তি ধারণা করেন — আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী শক্তি এবং জ্ঞান প্রকাশক সংবিৎ শক্তি।"

শ্লোক-১১

স এব মূলমন্ত্রং জপতি হরিরেতি কৃষ্ণেতি রামেতি।।

"সেই আদি পুরুষ চৈতন্যাখ্য ভগবান মূল মন্ত্র জপ করতে থাকেন, যে মন্ত্রে হরি, কৃষ্ণ ও রাম — এই নাম সমূহ অন্তর্ভূত রয়েছে।"

শ্লোক-১২

হরতি হৃদয়গ্রন্থিং বাসনা রোপমেতি হরিঃ।
কৃষঃ স্মরণে তচ্ছ ন্যস্ তদুভয় মেলনমেতি কৃষ্ণঃ,
রময়তি সর্বমেতি রাম আনন্দরূপঃ।
অত্র শ্লোক ভবতি।

"তিনি হৃদয়ের জড়-আসক্তির গ্রন্থি-বন্ধন ছেদন করেন এবং জড় বাসনার ফলে উদ্ভূত জড় দেহ হরণ করেন, সেজন্য তিনি হরি। 'কৃষ্ণ' ধাতুরূপের অর্থ স্মরণ করা, এবং 'ণ' প্রত্যয়ের (যা চিন্ময় দিব্যানন্দের নির্দেশক) মিলনে 'কৃষ্ণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে, (কৃষ্ণ = যাঁর স্মরণে অসীম দুঃখ বিদূরিত হয়)। যিনি সর্বজীবকে দিব্যানন্দ আস্বাদন করান, তিনি রাম নামে অভিহিত হন, যার অর্থ চিদানন্দের মূর্তবিগ্রহ। এই প্রসংগে একটি শ্লোক রয়েছে (যা উদ্ধৃত করা যেতে পারে)।

শ্লোক-১৩ ও ১৪

মন্ত্রো গুহ্যঃ পরমো ভক্তিবেদ্যঃ।
নমেন্যাষ্টং অষ্টে চ শোভনম্,
তং নিত্যং যে জপন্তি ধীরস্তে বৈ
মায়াং অতিতরন্তি
নান্যঃ পরমং মন্ত্রং পরমা রহস্যম্
নিত্যং আবর্তয়তি॥

"এই পরম রহস্যময় মহামন্ত্র সকল মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং কেবল প্রেমভক্তির দ্বারা এটি অবগত হওয়া যায়। যে সমস্ত ধীর চিত্ত ব্যক্তি দুটি ছত্রে আট-আট শোভন সুন্দর ভগবন্নাম সমন্বিত এই মহামন্ত্র নিয়ত জপ করেন, তিনি অচিরেই মায়া নামে অভিহিত অচিৎ, অলীক জড়া শক্তির কবল হতে বিমুক্ত হন। সকল মন্ত্রের মধ্যে গোপনীয়তম এই মন্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী আর কোন মন্ত্র নেই। এই মন্ত্র নিত্য জপকারীকে অনুক্ষণ এটি আবৃত্তিতে নিয়োজিত রাখে।"

শ্লোক-১৫

চৈতন্য এব সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ
পরমেষ্ঠি রুদ্রঃ
শক্রো বৃহস্পতিঃ সর্বে দেবঃ সর্বাণি
স্থাবরাণি চরাণি চ যৎকিঞ্চিৎ সদসৎ
কারণং সর্বং। তদত্র শ্লোকঃ।

"শ্রীচৈতন্যই সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব, তাঁর থেকে ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি সহ সর্ব দেবতা বিনির্গত হয়। তিনি সচর-অচর ও ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের স্তর ও নিত্য অস্তিত্বের স্তরের জীব — সকল জীবসত্তার উদ্ভবের কারণ। এই সম্পর্কে অনেক শ্লোক রয়েছে, এখানে যার উল্লেখ করা যেতে পারে।"

শ্লোক-১৬ ও ১৭

যৎ কিঞ্চিৎ অসদ্ ভুঙ্ক্তে ক্ষরং তৎ কার্যং উচ্যতে।
সৎ কারণং পরং জীবস্তদক্ষরং ইতিয়ারিতেম্॥

"ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যে ক্ষণস্থায়ী বস্তুই জীব ভোগের প্রয়াস করুক না কেন, সেই বস্তু এবং তার থেকে লব্ধ আনন্দ নশ্বর, ধ্বংসশীল বলে কথিত হয়েছে। জীবই (তার জড় ভোগবাসনা) এই জড় জগতের উদ্ভবের কারণ, কিন্তু জীব নিজে স্বরূপতঃ অবিনাশী, সনাতন।"

শ্লোক-১৮

ক্ষরাক্ষরং উভয়ং পরমঃ সে এব পুরুষোত্তমঃ।
চৈতন্যাখ্যং পরং তত্ত্বং সর্বকারণকারণম্ ।।

"যিনি ক্ষর (ধ্বংসশীল জড়দেহধারী জীব) এবং অক্ষর (অপ্রাকৃত জগতের অপরিবর্তনীয় দেহসম্পন্ন জীব), এই উভয় প্রকার জীব থেকে পরম পুরুষ ভগবান শ্রেষ্ঠ, সেজন্য তিনি পুরুষোত্তম। সেই পরমপুরুষই চৈতন্য নামে অভিহিত হন, তিনিই পরম তত্ত্ববস্তু, তিনি সর্ব কারণের কারণ স্বরূপ।"

শ্লোক-১৯

য এনং রসয়তি ভজতি ধ্যায়তি স পাপ্মানং তরতি,
স পূতো ভবতি, স তত্ত্বং জানতি,
স তরতি শোকং, গতিস্তস্যাতে নান্যস্যেতি।

"যিনি প্রেমভক্তি সহকারে শ্রীচৈতন্যদেবের আরাধনা করেন, ভজনা করেন, ধ্যান করেন, তিনি সর্বপাপ হতে মুক্ত হন; তিনি নিষ্কলুষ পূতপবিত্র হয়ে ওঠেন। পরম তত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে তিনি শোক দুঃখ অতিক্রম করে আনন্দময় স্থিতিতে অধিষ্ঠিত হন। এছাড়া এটি লাভের অন্য কোন পথ নেই।"

ভুল সংশোধনী

পৃঃ নং	ভুল	সংশোধনী
	পর্ব ১	
১৪	তখুনি	তখনি
১৬	ব্রহ্মসংহিতা (৫/)	ব্রহ্মসংহিতা (৫/৩৫)
১৭	(৫/)	(৫/৩৫)
১৭	মাতগর্ভে	মাতৃগর্ভে
২২	সদগুরু	সদ্‌গুরু
২৫	বাহিত	প্রবাহিত
২৫	শিক্ষা না দেয় না	শিক্ষা দেয় না
২৬	এইটি	এটি
২৬	কোন রকম রকম	কোন রকম
২৬	শ্রীচেতন্য	শ্রীচৈতন্য
২৭	সুসমঞ্জস	সুসামঞ্জস্য
২৮	মহিমময়	মহিমাময়
২৮	তাৎপয	তাৎপর্য
২৮	স্বতঃই	স্বত্বঃই
২৯	যথাযথ-র	যথাযথ-এর
২৯	এবংপরম্পরা প্রাপ্তং·····	এবং পরম্পরা প্রাপ্ত·····
	পর্ব ২	
৩১	গাড়ীরটির	গাড়ীটির
৩২	হয়ে হয়ে	হয়ে
৩৩	স্বতঃস্ফূর্তভাবে	স্বতঃস্ফূর্তভাবে
৩৪	দ্বার	দ্বারা
৩৮	কেশাগ্রকে শতভাগে ভাগ	কেশাগ্রকে দশ হাজার ভাগে ভাগ
৪১	ফল, ফল ভক্ষণ	ফল ভক্ষণ করছে
৪১	পখি প্রজাতি হচ্ছে ১১ লক্ষ	পাখি প্রজাতি ১০ লক্ষ
৪১	পশু প্রজাতি ৩ লক্ষ	পশু প্রজাতি ৩০ লক্ষ
৪২	মানবের	মানুষের
	পর্ব ৩	
৪৯	সাবতত্ত্ব	সারতত্ত্ব
৫০	নয়	না
৫১	থাকে	তাকে
৫৮	শ্রীকৃষ্ট	শ্রীকৃষ্ণ
৬৫	ধৈরিত্রী	ধরিত্রী
৬৫	স্বার্থহীনতাবে	স্বার্থহীনভাবে
৬৭	সে	যে
৬৮	বাসুদেব	বসুদেব
৬৯	নিবন্তর	নিরন্তর
৬৯	গ্রহমগুল	গ্রহমণ্ডল
৭০	চিৎকণ	চিৎকণা
৭০	মহবিশ্ব	মহাবিশ্ব
৭০	মহতত্ত্ব	মহত্তত্ত্ব
৭২	মহাবিষ্ণঃও	মহাবিষ্ণুও
৭৪	ধর্মপ্রাপ্ত	ধামপ্রাপ্ত
	পর্ব ৪	
৭৭	হয়ে	হয়
৭৮	দাসনিকদের	দার্শনিকদের
৮৬	নাই	করে
৮৬	প্রকশিত	প্রকাশিত
৮৬	সদবহার	সদ্ব্যবহার
৯৪	অভিলিষিত	অভিলাষিত
৯৫	বৈদ্যুতিন	বৈদ্যুতিক
১০৬	অর্জুন	অর্জন
১০৬	শ্রীকৃষ্ণকেও	শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায়
১০৯	মনষ্যেতর	মনুষ্যেতর
	পর্ব ৫	
১১৩	ভোগেশ্বর্য	ভোগৈশ্বর্য
১১৩	ভৌগশ্বর্য	ভোগৈশ্বর্য
১১৪	অব্যহতি	অব্যাহতি
১১৪	লেকটি	লোকটি
১১৫	হচ্ছে	হয়ে
১১৭	পার্শী	ফারসি
১২১	সারসরি	সরাসরি
১২৩	নাই ৭	৭ বসিতা
১২৬	নটি	নয়টি
১২৬	ভুক্তবশেষ	ভুক্তাবশেষ
১২৮	উন্নীতে	উন্নীত
	পর্ব ৬	
১৪৫	শ্রীমৃতিতে	শ্রীমূর্তিতে
১৪৭	আদানে-প্রদান	আদান-প্রদান
১৪৯	ভক্ত-দত্ত	ভক্তপ্রদত্ত
১৫৬	সে ঐ মাংস ক্রয় করে	যে ঐ মাংস ক্রয় করে
১৫৮	বাঁচাতে পারে না	বাঁচতে পারে না
১৫৯	অপ্রকৃত	অপ্রাকৃত
১৬০	স্বছন্দে	স্বাচ্ছন্দ্যে